নাঙ্গা তলোয়ার

নাঙ্গা তলোয়ার

অজাতশত্রু

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

নাঙ্গা তলোয়ার

দেশ ও জাতির মহোত্তম নায়ক

সুভাষচন্দ্রের

উদ্দেশে

আমার প্রণাম

ফিরুজ শাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ইতিহাসের পাতায়। দুঃসাহসী এই রাজপুত্রের বিষণ্ণ ব্যর্থতা আমাকে গভীর বেদনা দেয়। সেই বেদনাই আমার নাঙ্গা তলোয়ার রচনার আদি ঋক।

তারপর পাখিরা যেমন প্রান্তর থেকে শস্য খুঁটে নেয়—তেমনি করে আমিও ইতিহাসের ঝুলি থেকে মাল-মশলা খুঁজে নিয়েছি।

আঠারো শ সাতান্ন থেকে যে আগুন-জ্বলা রক্ত-ঝরা দিনের সুরু তার ইতিহাস আমি লিখিনি। লিখতেও চাই নি। সে-সব সর্বনাশা দিনে যারা জাতিকে ভয়-হরণ মৃত্যু-তরণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন সামান্য পরিসরে তাদের কথাই বলতে চেয়েছি। তা করতে গিয়ে ইতিহাসের সত্য ও ধারাবাহিকতায় অসমীচীন হস্তক্ষেপ ঘটেনি। সুতরাং ইতিহাস বইতে ইতিহাসই আছে।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এক শতাব্দীর সঙ্গে পঁচিশটা বছরও প্রায় পার হয়ে গেল বুঝি। মনে হয়, আমাদের স্মৃতিতে এখন ধূসর পলি জমেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-পুরুষ যে সব নায়ক—তাদের দুরন্ত অভিযানের কথা, আত্মত্যাগের নিঃস্বার্থ আখ্যান ইতিহাসের পাতার বিবর্ণতা থেকে তুলে এনে সাজিয়ে দিলাম। মীরাট-মান্দিসোর-কানপুর-লক্ষ্ণৌ-দিল্লি-ফৈজাবাদে ছড়ানো যে-ভারতবর্ষ তার বুকের ওপর যারা আগুন জ্বেলেছিল মুখ্য চরিত্র সেই সেপাইরা তারাও আছেন নাঙ্গা তলোয়ারের পাতায়-পাতায়।

সে কালের ইতিহাস প্রবাহে কেবল শব্দ যোজনা করে কিছু লাবণ্য ও সৌরভের সঙ্গে রঙও ঢেলেছি।

ইতিহাসের দুরন্ত গতিতে জীবনের সুখ-দুঃখ চাপা পড়ে যাবার কথা। গেছেও তাই। তবু সুযোগ মতো সংঘাত-সংঘর্ষের বাইরে অনুভূতির আর্দ্র পলিতে ফুল ফোটাতে চেষ্টা করেছি।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা আমার লক্ষ্য। ভালো লাগলে কৃতার্থ হব। প্রসঙ্গত কৃতজ্ঞতা জানাই সুহৃদ শ্রীদিলীপ মিত্রকে।

অলমতি বিস্তারেণ

আমাদের প্রকাশিত লেখকের দুটি অসাধারণ বই :

নীল ডুংরি

সঙ্গী তিনজন

ফিরূজ শাহ

পালতোলা আরব ঢাউয়ের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ফিরূজ শাহ তার প্রিয় হিন্দুস্থানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতদিন বাদে কতদূর থেকে দেশে ফেরা! অলস এক ভালবাসা তার মুখের নিষ্পাপ সারল্যে জলছবির মতো অপরূপ হয়ে আছে।

কত আর বয়েস—চব্বিশ কি পঁচিশ! এই তো সবে স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন কৈশোরের সীমানা ছাড়িয়ে যৌবনের কুসুমিত উপত্যকায় পা দিয়েছেন। বিদেশে বাবুরের এই বংশধরটির জন্যে বোরখার আড়ালে কতো বিরহিনী পুরসুন্দরীর বুক দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠেছে, চোখের পাতায় অকারণ অশ্রু মালাবার উপকূলের মুক্তোর মতো টলটল করেছে। তাদের আঙুলের নীল হীরের দ্যুতির মতো বুকের বেদনাও বুঝি অলৌকিক নীল হয়ে আছে।

তারা কি কেউ জানে ফিরূজ শাহের দিল কোথায় দিবানা হয়ে আছে।

হিন্দুস্থানের ওপর নীল আকাশটা যেন গম্বুজের ছাদ—তার গায়ে বুঝি রোদ মিনে করা সোনার মতো ঝলমল করছে!

দিল্লির জন্যে ফিরূজ শাহের মন ভারি উন্মন! বোম্বাই থেকে দিল্লি এই দীর্ঘপথ তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে হবে। সামনে বর্ষা। এখনো মৌসুমী-বাতাস হিন্দুস্থানের দিকে ভিড় করে আসেনি বটে তবে বার দরিয়ায় তার হালফিল আনাগোনা দেখা গেছে। মেঘের পরে মেঘ জমেছে। কবে মৌসুমী বাতাস সেই মেঘের পাল উড়িয়ে নিয়ে আসবে। বিষ্টি নামবে। নদী-নালা ফেঁপে ফুলে উঠে পথ-চলা দায় করে তুলবে। তার আগেই এপথ পাড়ি দিতে হবে।

ঢাউয়ের পাটাতনে দাঁড়িয়ে বন্দরের দিকে তাকিয়ে আছেন ফিরূজ শাহ। প্রথম বাহাদুর শাহের বংশধর নিজাম বক্তের ছেলে। বছর দুই আগে দিল্লি থেকে মক্কায় হজ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর মক্কা থেকে ফেরবার পথে মিশর-পেশা-জাঞ্জিবার-কিলওয়া-কিসিওয়ানি আরো নানা জানা-অজানা জায়গা ঘুরে দেশে ফিরছেন।

১৮৫৭ সালের বোম্বাই।

ইংরেজ-পর্তুগীজ-ফরাসি বাণিজ্যপোত রণপোত ছাড়া আরব ঢাউ ভিড় করে আছে

বন্দরে। এছাড়া অসংখ্য দিশি পণ্যবাহী জাহাজ। চারদিকে মাস্তলের অরণ্য দিগন্তের গায়ে হিজিবিজি লিখে রেখেছে। সেইসব জাহাজের ভিড় এড়িয়ে আরব ঢাউ বন্দরে ভিড়লো।

সমুদ্রের বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে কূলে। নোনাজলের কান্না ছুঁয়ে একঝাঁক শঙ্খচিল মাস্তলের ছায়া ঘিরে উড়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

বোম্বাই বন্দরে নেমে ফিরুজ শাহ আশা করেছিলেন, কেউ-না-কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে।

হাবসী, আরবি, সুদানী আর ফিরিঙ্গির ভিড়ের মধ্যে বারবার ঘোরা-ফেরা করেও কারো পাত্তা পাওয়া গেল না। আশ্চর্য ব্যাপার তো! ঘোড়া আর দুটো মোকরানি বান্দা ঠিক করে রাখার কথা। অন্তত একমাস আগে খবর পাঠানো হয়েছে; দোস্ত মুহম্মদ তো এমন বেয়াক্কেলে নয়; তার মহল্লায় গিয়ে একবার খবর নেওয়া দরকার। অসুখ-বিসুখ হয়েছে কিনা কে জানে!

শহরের একটা নির্জন মহল্লায় দোস্ত মুহম্মদের ডেরায় গিয়ে হতাশ হলেন ফিরুজ শাহ। দরজা বন্ধ। দেখে বোঝা গেল, বহুদিন খোলা হয় নি। প্রতিবেশীরা বললেন, তার তো এসে যাবার কথা। হয়তো দু'চার দিনে এসে যাবে। তবে দিল্লিতে কি একটা গোলমাল শুনেছি সেইজন্যই হয়তো—

দিল্লিতে গোলমাল! অবাক হলেন ফিরুজ শাহ।

তাই তো শুনেছি। তা দোস্ত মুহম্মদ ফিরলে কিছু বলতে হবে?

মাথা নাড়েন ফিরুজ শাহ, না।

বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতে-ফিরতে ফিরুজ শাহ ঠিক করে ফেললেন, দেরি না-করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দিল্লির দিকে রওনা হতে হবে।

সেই ভেবে বাজার থেকে পছন্দসই একটা ঘোড়া কিনে রাত্রে এক সরাইখানায় গিয়ে উঠলেন।

সেখানে দিল্লির খানদানী এক জহরৎ ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা। শাহজাদাকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি, হুজুরৎ আপনি!

কেন, আমার এখানে আসতে নেই? মৃদু হাসলেন ফিরুজ শাহ।

না, তা নয়। তবে—ইয়ে, দিল্লির খবর কিছু শুনেছেন?

না তো। গত দু'বছর আমি হিন্দুস্থানে ছিলাম না।

তাই বলুন, এদিকে তো অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। কিছু-কিছু খবর যা বাতাসে ভেসে আসছে—সে সব ভারি খারাপ!

কি রকম?

কোম্পানীর সঙ্গে সিপাইদের নাকি জোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। শহরের দখলদারি শাহীফৌজের হাতে; তবে কোম্পানীফৌজ শহর ঘিরে রেখেছে।

বলো কি! ফিরুজ শাহ বুঝি বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে যেখানে-যেখানে ফৌজি-ছাউনি সে সব এলাকায় সেপাইরা হাতিয়ার-বন্দ হয়ে লড়াইয়ে নেমে গেছে। লক্ষ্ণৌ—মীরাট—কানপুর—অযোধ্যা—বরেলি-বিহার সারা হিন্দুস্থান আগুন হয়ে জ্বলছে।

তা হলে? জিজ্ঞাসু চোখে তাকান ফিরুজ শাহ।

আমিও তাই ভাবছি, দিল্লির দিকে আপনার এগোনো বোধহয় ঠিক হবে না। হুজুর, এখন আপনার হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। বহোৎ ধান্দাবাজ আদমি এদিকে এসে ভিড় করেছে।

নিজের ঘরে এসে বসলেন ফিরুজ শাহ। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। দিল্লিতে কী ঘটছে কে জানে! দুর্বহ চিন্তা তরবারির খোঁচার মতো যন্ত্রণা হয়ে রয়েছে। দিল্লি যখন জ্বলছে তখন এখানে বসে আকাশকুসুম ভাবনায় ডুবে হা-হুতাশ করার চেয়ে এগোনোই ভালো।

সরাইখানায় গা-ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা লুকাট গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে তারা-ছড়ানো অন্ধকার আকাশ অস্পষ্ট অনুভব হয়।

একটু পরেই দূরের কোন মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান শোনা গেল। ভোর হতে আর দেরি নেই!

উঠে পড়লেন ফিরুজ শাহ। সরাইখানার আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে চড়ে বসলেন।

সামনে অন্ধকার। পিছনে অন্ধকার। অনিশ্চিত এক অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তার যাত্রা শুরু হল।

খানিক দূর এগিয়ে মনে হল, এই যে শাহী সড়ক ইন্দোর ছুঁয়ে গোয়ালিয়র পার হয়ে আগ্রা পৌঁচেছে তারপর বুন্দেলশায়েরের ভিতর দিয়ে দিল্লি গিয়ে ঠেকেছে এ-পথ এড়িয়ে মাঠে নামতে হবে। তার নজর রইল উত্তরের দিক—যে দিকে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লি। পাহাড়ি এলাকার মাঝ দিয়ে পথ চলে গেছে।

মাথার ওপর গ্রীষ্মের সূর্য। আগুনের মতো বাতাস এসে ঝাপটা মারে। চোখে মুখে জ্বালা ধরে। দু'চোখ ঘামে অন্ধ হয়ে যায়। তবু লাগাম ধরে উত্তরের দিকে ঘোড়া ছোটান ফিরুজ শাহ। থামলে চলবে না। দিল্লি বহোৎ দূর।

মাসখানেক ধরে পথের ধকল সহ্য করে ফিরুজ শাহ্ জুন মাসে সীতামাউতে গিয়ে হাজির হলেন। সহায় সম্বলহীন রাজপুত্র। চোখে মুখে হতাশার ছাপ। সীতামাউর পথে-পথে ঘুরে বেড়ান। কখনো পথ-চলতি মানুষজনকে ডেকে কথা বলেন। কেউ শোনে। কেউ শোনে না। যারা শোনে তারাও ব্যস্ত হয়ে নিজের কাজে চলে যায়। মুষড়ে পড়েন শাহজাদা।

যে-সময় দিল্লি মুহুর্মুহু কামান-বন্দুকের শব্দে চমকে উঠছে, ইস্পাতের তরবারি শত্রুর শির লক্ষ্য করে বিদ্যুৎ বেগে বাতাস কেটে ওঠা নামা করছে—আর্ত-আহতের চিৎকারে, বারুদের তাজা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে—সেই সময় কি শাহজাদার পক্ষে সীতামাউতে চুপচাপ করে বসে থাকা সম্ভব!

এই তো সময়! অমর মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ এক ফকিরের সঙ্গে ফিরুজ শাহের দেখা হল। দুঃখের কথা বললেন তাকে, এমন আমার নসীব যে কেউ একটা কথা বললেও শুনতে চায় না।

ফকির উপদেশ দিলেন, বেটা ইয়ে কামিজ বদলা, ডেরা ছোড়ো তব্ আম্-জনতা তুম্হারি বাত মানেগী।

ফকিরের কথা মতো শাহী পিরান মাটিতে ফেলে দরবেশের আলখাল্লা গায় তুলে নিলেন ফিরুজ শাহ্ তারপর নগরের সীমানায় পরিত্যক্ত এক মসজিদে গিয়ে আস্তানা পাতলেন।

ভাঙাচোরা মসজিদে এমন খানদানী চেহারা ও ব্যক্তিত্বের ফকিরকে দেখে সীতা-মাউর মানুষেরা অবাক হয়ে ভিড় জমালো। আর তাদের সকলের বিস্ময়কে বিপন্ন করে ফিরুজ শাহ নিজের পরিচয় দিলেন। তাজ্জব হয়ে গেল তারা। সেই সব মানুষদের বেশির ভাগ আফগান আর মোকরানি মুসলমান। আগাপাস্তলা তারা মরদ। রক্তে তাদের লড়াইয়ের নেশা—বুকে বাসা বেঁধেছে বেপরোয়া সাহস! তাদের খাপে গোঁজা দামাস্কাসের ছুরি শত্রুর রক্তের জন্যে সব সময় পিপাসার্ত হয়ে থাকে। খেতিতে কাজ করার চেয়ে নাঙ্গী তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নামা বেশি ইজ্জৎ মানে তারা!

ফিরুজ শাহ নিজের অভিলাষের কথা জানালেন তাদের। বোঝালেন, দুশমনরা কিভাবে তামাম হিন্দুস্তান গ্রাস করে ফেলছে; আর এই জালিমশাহী কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই না-করা পাপ।

এ লড়াই ইমানের লড়াই। যদি মরি বেহেস্তে পৌছে যাব আর জিতলে ফকৃব্ দৌলত সব আমাদের কবজায়।

ফিরুজ শাহের কথা শুনে কিছু লোক তার দলে জুটে গেল। কিন্তু সীতামাউ ছোট জায়গা বলে মান্দিসোরে হাজির হয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করলেন। চাঁদ-তারা আঁকা পতাকা সূর্য ছোঁবার স্পর্ধা করে আকাশে মাথা তুলল।

চারদিকে খবর ছুটে গেল, তৈমুর বাবুরের বংশধর ফিরুজ শাহ ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে সবাইকে ডাক পাঠিয়েছেন।

চারদিক থেকে দলে-দলে মানুষ হাতিয়ার নিয়ে ছুটে আসতে লাগলো। কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ পায়ে হেঁটে। পিঠে তাদের বন্দুক। উত্তেজনায় ছটফট করছে।

মান্দিখোরের শাসনকর্তা এত গোলমাল, অনবরত বন্দুকের শব্দ আর তলোয়ারের ঝনঝনানি শুনে বিরক্ত হয়ে ফিরুজ শাহকে বললেন, এখান থেকে সরে পড়ো তো বাপু।

বাধ্য হয়ে রাজপুত্রকে সরে যেতে হল মান্দিসোর থেকে আর পথে পথে ঘুরতে হল কিছু দিন। ইতিমধ্যে আরো অনেক লোক এসে যোগ দিয়েছে তার দলে। পাকাপোক্ত একটা ফৌজ তার কবজায়।

একদিন রাতের অন্ধকারে ফিরুজ শাহ মান্দিসোর দখল করে নিলেন। শাসনকর্তা আর কোতোয়াল দুজনেই পালিয়ে গেলেন। রাজা হয়ে বসলেন ফিরুজ শাহ। কিছুদিন লাগলো তার গুছিয়ে নিতে ; তারপর মান্দিসোরের চারপাশের সব রাজ্য—প্রতাপগড়, জাওরা, সীতামাউ, রাতলাম ও সালুম্বার রাজা-রানাদের এক পরোয়ানা পাঠালেন দিল্লির শাহানশাহের বংশধর নিজাম বখতের পুত্র মীর্জা মোহাম্মদ ফিরুজ শাহ বাহাদুর, আমি বর্তমানে দিল্লির সম্রাট। আপনারা আমার অধীনতা স্বীকার করে অবিলম্বে নজরানা পেশ করুন আর বাকি-বকেয়া উসুল দিন।

একমাত্র জাওরা সুলতান আবদুস সাত্তার খাঁ ছাড়া কেউ অধীনতা স্বীকার করলেন না।

কুচ পরোয়া নেই। এ নিয়ে ফিরুজ শাহের মাথাব্যথাও ছিল না। তার লক্ষ্য দিল্লি। তাই দল বাড়াতে লেগে গেলেন।

নভেম্বর মাস নাগাদ তার দলে আঠারো-কুড়ি হাজার যোদ্ধা জমায়েত হল। ফিরুজ শাহের নামে সর্তহীন আনুগত্যের অঙ্গীকার দিল তারা। বুকে সাহস পেলেন রাজপুত্র। এবার পথে নামলেন। যে পথ গেছে দিল্লির দিকে সেই পথে।

নিমচ, জায়গাটা মাইল বিশেক দক্ষিণে। মেবারের একেবারে গা-ঘেঁষে। সেখানে গোয়ালিয়র সেনাবাহিনীর একাংশ আর ফার্স্ট বেঙ্গল ক্যাভালরির একাংশ

মোতায়েন ছিল। সেনানায়কেরা 'বহোৎ' হুশিয়ার হয়েই ছিলেন। সেপাইরা কুচকাওয়াজের ময়দানে হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। হুকুম পেলেই বিদ্রোহ দমন করতে শত্রুর বিরুদ্ধে মার্চ করবে।

চারদিকে এখন আগুন জ্বলছে। কাছাকাছি নয় বটে তবু ভয় হয়, কখন যেন সেই আগুনের ফুলকি ছিটকে এসে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে।

এমন সময় খবর এলো, নাসিরাবাদের কোম্পানী ফৌজ ছাউনি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সামনে কামান সাজিয়ে দিল্লির দিকে তুরন্ত পায় এগিয়ে চলেছে।

দাবানলের মতো এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। প্রতাপগড়, রাত্‌লাম, বন্‌সওয়ারা, সীতামাউ আর মান্দিসোর উত্তেজনার আগুনে ধিকিধিকি জ্বলতে লাগলো : স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়!

কর্ণেল এ্যাবট হাওয়ার গতিক দেখে বুঝে নিলেন হালচাল ভালো নয়; সুতরাং দেরি না করে উদয়পুরের দিকে দৌড় লাগালেন। তাঁর দেখাদেখি সিভিলিয়ানরাও ছেলে-বৌ নিয়ে, মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থা!

দ্বাদশ বোম্বে ইনফ্যানট্রি ও ৮৩তম ক্যাভালরি বিদ্রোহীদের ঠেকাতে নাসিরাবাদের দিকে যাত্রা করলো। ফাঁকা পড়ে রইলো নিমচ্।

অবস্থার সুযোগ নিতে দেরি করলেন না ফিরুজ শাহ। পতাকা উড়িয়ে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে নিমচ্ দখল করলেন। এবার দুর্গের দখল নিলেই নিমচ্ দখল সম্পূর্ণ হয়।

দুর্গের দরজা আগেই বন্ধ হয়ে গেছিল। শুধু তার ফাঁক-ফোকরে কামানের নাক-চ্যাপটা মুখ গুলো মুহুর্মুহু গোলা দেগে বিদ্রোহীদের ঠেকিয়ে রাখলো।

ফিরুজ শাহের বাহিনীও কামানের গোলা দিয়ে তার উত্তর দিয়ে গেল। রাজস্থানী নিরেট পাথর কেটে তৈরি দুর্গের তাতে ক্ষতি হল না এমন কথা বলা যায় না। তবে বিদ্রোহীদের লাভের হিসেবে ইতরবিশেষ কিছু হল না।

দুর্ধর্ষ আফগানরা মরিয়া হয়ে দুর্গের দরজা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা চালাতে লাগলো। দিনে-রাতে সেই চাপ সমান ভাবে দুর্গের ওপর চেপে রইলো।

এই লড়াই চললো দিনের পর দিন।

দুর্গের মধ্যে আটকে-পড়া কোম্পানীর সেপাইদের মনোবল একটু-একটু করে ভেঙে পড়ছিল। হয়তো দু'একদিনের মধ্যে তারা আত্মসমর্পণ করে বসতো। সাহায্য পাবার কোন প্রত্যাশা তাদের ছিল না।

মধ্যভারতের গভর্ণর জেনারেলের অস্থায়ী প্রতিনিধি হেনরি ডুরাণ্ড কাছাকাছি

ছিলেন। তার কাছে খবর গিয়ে পৌছল, নিমচ, দিল্লির এক দুঃসাহসী রাজপুত্র দখল করে নিয়েছে। সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে ব্রিগেডিয়ার সাহেব নিমচের দুর্গ আগলাচ্ছে। এই অবস্থায় সাহায্য না-পেলে নিমচের কেল্লা শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

পত্র পেয়ে হেনরি ডুরাণ্ড পড়ে গেলেন মুশকিলে। পেছনে শত্রু রেখে এগোনো মিলিটারি কেতাবে লেখে, নৈব নৈব চ।

বিপদ বাধিয়েছে ধার্। ইন্দোর থেকে মাত্র বত্রিশ মাইল দূরে। ধারের নবাব নাবালক। বিষয়-সম্পত্তি দেখতেন তার কাকা। ধারের প্রশাসনে যে-সব আফগান আর আরব কর্মচারী ছিলেন তারা সুযোগ বুঝে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাদের খাপে গোঁজা তলোয়ার রোদের আলোয় চমকে উঠলো।

এ ব্যাপারে নবাবের কাকারও যোগ ছিল।

নবাবপরিবারের আর সবাই নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর পক্ষে রয়ে গেলেন।

ধার্ বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেল।

হেনরি ডুরাণ্ড বর্ষার জন্যে সমস্ত আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা বন্ধ রেখেছিলেন কিন্তু ধারে এই কাণ্ড ঘটতে দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ধার্-দুর্গ মুক্ত করবার জন্যে ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ডকে পাঠালেন। স্টুয়ার্ডের তাড়া খেয়ে বিদ্রোহীরা দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। ব্রিগেডিয়ার উপায়ান্তর না-দেখে দুর্গ অবরোধ করে ঘাঁটি গাড়লেন।

দু' তরফের মধ্যে শুধু গোলাগুলি বর্ষণই নিত্যকার ব্যাপার হয়ে রইলো। স্টুয়ার্ড জানতেন, এতে তার লোকসান নেই। রসদ একদিন ফুরোবে আর সেপাইদের কেল্লার দরজা খুলে বাইরে বের হতে হবে সুতরাং বৃথা লোকক্ষয়ের ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না।

অবশ্য ডুরাণ্ডের ভাবনায় নিমচ্ কাঁটার মতো বিঁধে খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। দিল্লির মুঘলরাজবংশের একজন নিমচের দখলদারি নিয়ে কেল্লা অবরোধ করে বসে আছে। এ ব্যাপারটার অবিলম্বে একটা ফয়সালা করা দরকার। তাই স্টুয়ার্ডকে জোর তাগাদা দিতে লাগলেন, ধারের ব্যাপারটা শেষ করে ফেলতে। স্টুয়ার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছিলেন না।

শেষে একদিন বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ব্রিগেডিয়ারের কাছে চিঠি এলো, কোন শর্তে অবরোধ তুলে নেবেন সাহেব?

কোন শর্ত মেনে অবরোধ তুলবো না। জবাব গেল স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে।

বিদ্রোহীরা জানিয়ে দিল, ভালো কথা তবে তাই হোক। সর্ত-টর্তের পরোয়া আমরাও করি না। তোমরা ধারের নবাবের হয়ে লড়াই করতে এসে তারই সম্পত্তি নষ্ট করছ। আমাদের ঘোড়ার ভিম। দু'চার জন লোক আমাদের মরেছে সত্যি; গরু-মোষ ও কিছু মারা গেছে। তা' যাক। আমরা লড়বো। লড়াই করে মরবো তোমরা পার তো লড়াই করে কেল্লা ফতে করে নাও।

সুতরাং যথাপূর্বম। অবরোধ চললো।

তারপর হঠাৎ একদিন অবরোধকারীদের অসতর্ক পাহারা ভেঙে বিদ্রোহীরা দুর্গ থেকে ফেরার হয়ে গেল।

স্টুয়ার্ড দুর্গের দখল নিতেই ডুরাণ্ড নির্দেশ পাঠালেন, ফিরুজ শাহের মুকাবেলা করো।

যে-মুহূর্তে ধারের পতন হল সেই-মুহূর্তে স্টুয়ার্ডের নেতৃত্বে ডুরাণ্ডের বাহিনী মান্দিসোরের দিকে এগোল। মান্দিসোর বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি। সেখান থেকেই লোক-লস্কর রসদপত্তর নিয়ে বিদ্রোহীরা শক্তি বাড়িয়ে তুলছে।

ডুরাণ্ডের বাহিনী এগোচ্ছে শুনে ফিরুজ শাহ অবরোধ তুলে বাধা দিতে এগোলেন। গারোরিয়ার প্রান্তরে দু দলে মুখোমুখি হল।

এই প্রথম ফিরুজ শাহ কোম্পানীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন।

দু পক্ষে তুমুল লড়াই লেগে গেল। কামান-বন্দুকের কিছু ঘাটতি ছিল না কোন দিকে।

আফগান আর মোকরানি যোদ্ধারা দুর্ধর্ষ সাহসে ঝাপিয়ে পড়লো; তাদের হাতের তরবারি বিদ্যুতের মতো চমকে উঠতে লাগলো, হাতের বন্দুক আর রাইফেলের গুলি ঝাক-বাঁধা পঙ্গপালের মতো শত্রুর দিকে ছুটে যেতে লাগলো।

সৈন্যদের সামনে থেকে ফিরুজ শাহ সাহস জোগাতে লাগলেন। প্রচণ্ড চাপ পড়ল স্টুয়ার্ডের বাহিনীর ওপর। তারা ঠিক মতো সাজিয়ে দাঁড়াতে পারে নি তার আগেই হিংস্র নেকড়ের মতো আফগান আর মোকরানিরা ঝাপিয়ে পড়েছিল।

সে-কালের ভারতবর্ষে আফগানরা দুর্ধর্ষতম যোদ্ধা; একমাত্র স্কচ্ ছাড়া এদের মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা কারো ছিল না। সুতরাং মৃত্যুকে বাজি রেখে বেপরোয়া এক ঘোড়ার সোয়ার হয়ে কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে লড়ে গেল তারা।

সারাদিনই একটানা যুদ্ধ চললো।

মাথার ওপর রাজস্থানের নিষ্ঠুর সূর্য দুহাতে আগুন ছড়াতে লাগলো।

বিদ্রোহীদের কামানের গোলার আঘাত কোম্পানীর ফৌজকে বিপর্যস্ত করে

তুলেলো। ফিরুজ শাহের মরিয়া হানায় এক সময় মনে হতে লাগলো স্টুয়ার্ডের বাহিনী বুঝি ছিড়েখুঁড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

কোম্পানীর সেপাইরা সারাদিন মাটি কামড়ে শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে গেল। ক্ষতি হল প্রচুর। ক্ষয় হল পর্যাপ্ত। তবু তারা পিছু হঠলো না। তাদের সেনানায়কের অভিজ্ঞ দক্ষতার কাছে বিদ্রোহীদের বীরত্ব শেষ পর্যন্ত নিহত হল।

সূর্য যতো পশ্চিমে হেলতে লাগলো বিদ্রোহীদের দম ততো কমে আসতে লাগলো আর কোম্পানীর আক্রমণও ততো মাথা তুলতে থাকলো। ব্রিটিশ সেনাপতি জানতেন বিদ্রোহীদের অসংবদ্ধ আক্রমণের মুখ ফেরাতে পারলেই হল তারপর গারোরিয়ার প্রান্তর থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

হলোও তাই। প্রাচ্যদেশে যুদ্ধের সমস্ত আক্রমণই সন্ধ্যার দিকে শিথিল হয়ে যায়, বিশেষ করে সারাদিন যারা যুদ্ধ করে।

কোম্পানীর ফৌজ মাটি কামড়ে সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবার তারা এমন আক্রমণ ছড়িয়ে দিল যে ফিরুজ শাহের বাহিনীকে পিছু হঠতে হল।

তবু প্রায় সারা রাত লড়াই করেও ফিরুজ শাহকে গারোরিয়ার প্রান্তর শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে রাতের অন্ধকারে সরে পড়তে হল।

মান্দিসোর ফিরুজ শাহের হাত-ছাড়া হয়ে গেল। নিমচ্ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিলেন রাজপুত্র। প্রথম পরাজয়ের বেদনা হয়তো তাকে আচ্ছন্ন করে থাকবে, হয়তো গভীর নৈরাশ্যে ডুবে যেতে পারেন, হয়তো প্রচণ্ড এক অসুখ তার আত্মাকে আপ্লুত করতে পারে—তবে সে সবই ছিল সাময়িক। সে-সব ঝেড়ে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি রাজপুত্রের। একথা সম্ভবত তার জানা ছিল, ভারত-বিজয়ী পূর্বপুরুষ বাবুর শাহকেও একবার কাবুলের দখলদারি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। সেই পরাজয় তার দিল্লির বাদশাহ হওয়া আটকাতে পারে নি।

নিমচ থেকে ডেরাডাণ্ডা গুটিয়ে ফিরুজ শাহ আশ্রয়ের খোঁজে যাত্রা শুরু করে ঢোলপুরের দিকে মুখ ফেরালেন।

এদিকে আরেক ঘটনা।

ইন্দোরে বিদ্রোহ সুরু হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মউয়ের সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহের কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠলো।

মউ এতদিন যদিও বাইরে থেকে শান্ত ছিল ভেতরে ভেতরে উত্তপ্ত লাভার মতো ফুটছিল ; হঠাৎ সেই গলিত লাভা-স্রোত বুঝি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ পেরিয়ে অলদচিঅবয়বে নিচে নেমে জনপদপ্রান্তরের দিকে এগিয়ে চলল দুরন্ত গতিতে।

মউতে সেপাইদের নিজেদের যে খবর আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল তাতে অনবরত তারা বাইরের খবর পেত।

ব্যারাকে রাতের আলো নিভে গেলে যে যার খাটিয়া ছেড়ে নিঃশব্দে জমায়েতে গিয়ে মিলতো। সেখানে বসে দিল্লি-কানপুর-বরেলি-আগ্রা-এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ-জগদীশপুর থেকে আসা খবরাখবর নিয়ে উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত আলোচনা চালাতো।

দিল্লিতে মীর আতিশ বখত্ খান চল্লিশ হাজার জঙ্গী সেপাই নিয়ে ইংরেজদের অবরোধ ভেঙ্গে-চুরে দেবার জন্য কী রকম প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে, কিম্বা ৩১মে যদি সারা ভারতে সেনা ছাউনিতে এক সঙ্গে বিদ্রোহের সুরু হতো, তা হলে? মীরাটের সেপাইরা বিদ্রোহ করে দিল্লি আসবার পথে ভোর বেলায় দেখলো গোলন্দাজ বাহিনীর কেউ তাদের সঙ্গে আসেনি—তাতে তারা দমে না গিয়ে কী রকম উৎসাহে বত্রিশ মাইল পথ পেরিয়ে দিল্লি পৌছেছিল; অথবা মিষ্টার হিউম কি ভাবে বৌ সেজে আলিগড় থেকে পালাতে পেরেছিলেন—এসব আলোচনা করতো। আর তারা যে বসে-বসে ডাল-রুটির ছেরাদ্দ করছে সে কথা ভেবে নিজেদের বড়ো অপরাধী মনে করতো।

দুশমন ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হবার জন্যে নানাসাহেব, ফিরুজ শাহ, কুনোয়ার সিং ও অযোধ্যার বেগম সাহেব যে ডাক পাঠিয়েছেন সে-সম্পর্কে তাদের কি করা উচিত তাই নিয়ে সারারাত ফিসফাস আলোচনা চালাতো।

সিপাইরা কখনো বিমূঢ় নৈঃশব্দ্যে বোবা হয়ে বসে থাকতো অথচ তাদের বুকের মধ্যে অশ্রুত সমুদ্র-কল্লোল দুরন্ত ফেনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়তো। তারা বুঝতে পারতো, দেশের এই দারুণ সংকটে কিছু একটা করা দরকার।

কি-করে কেমন-করে কিছু একটা করা যায় সেই ভাবনাটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো তাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতো।

হঠাৎ একদিন ইন্দোর থেকে ফুলকি ছিটকে এসে পড়লো মউতে। শুকনো ঘাসে ফুলকি পড়ে বিনা বাতাসে যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে মউও তেমনি দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

মউয়ের সেনা-ছাউনিতে এমন কেউ ছিল না যে সেপাইদের হালচাল সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে। পদস্থ সামরিক অফিসারেরা খোস-মেজাজে রুটিন মাফিক কাজের মধ্যেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

হঠাৎ একদিন সেপাইদের রাতের জমায়েতে খবর এলো, ইন্দোরে আগুন জ্বলে উঠেছে।

বিদ্রোহীদের নেতা সাদাৎ খান জিজ্ঞাসা করলো, অব্ ক্যা করোগে?

অন্ধকারে সেপাইরা চুপ করে বসেছিল; তারা চেঁচিয়ে উঠলো, লড়্‌হাই—লড়্‌হাই—

ভোরে সূর্য ওঠার আগে বিউগিল বেজে উঠলো। সিপাইরা ইউনিফর্ম পরে লাইনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার তার বাহিনীকে নিয়ে ইন্দোর রোডে বিভিন্ন ঘাঁটিতে মোতায়েন করলেন। তারপর বেরুলো ক্যাভালরি। জেল্লাদার পোষাক পরা ঘোড়সোয়ার বাহিনী খানিকটা পথ দুলকি চালে তারপর জোর কদমে এগিয়ে ইন্দোর রোডের বিভিন্ন ঘাঁটিতে মোতায়েন পদাতিক বাহিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

এই ইন্দোর রোড ধরেই নাকি ইন্দোরের বিদ্রোহী বাহিনী দিল্লি যাবে। তাদের বাধা দেবার জন্যেই কোম্পানী ফৌজ ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে পথ আগলে দাঁড়ালো।

সাদাত খান যে-ঘাঁটিতে ছিল তার কমাণ্ডিং অফিসার একটু দূরে যেতে সহকর্মী দিকে তাকিয়ে বললো, কাল রাত তুম্ লোগ্ লড়হাই-বোল্‌কর্ চিল্লায়ে অর্ আজ সবেরে আস্তরত বন্ গেয়ি!

চাবুকের আঘাত পড়লো বুঝি সেপাইদের মুখের পর।

সকাল বেলায় যাদের নিয়ে ঘাঁটি আগলাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল দুপুরের আগে তারা সব ব্যবস্থা তচনচ করে কমাণ্ডার ও গোলন্দাজদের গুলি করে হোলকারের দেওয়া কামান দুটো দখল করে, 'ফিরিঙ্গিয়ো কো মারো' চিৎকার করতে-করতে মউয়ে ফিরলো।

ছাউনি থেকে খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ কর্ণেল প্লাটিস ছুটে গেলেন তাদের ধমকে শায়েস্তা করতে।

হয়তো কর্ণেল প্লাটিসের হাল্‌চাল বোঝবার জন্যে সেপাইরা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে থাকতে পারে।

কর্ণেল তাদের সামনে ঘোড়া থামিয়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, রোকো—

দুশমন কো মারো। সাদাত খানের গর্জন সেপাইদের কানে ধাক্কা মারলো।

কয়েক শ' রাইফেলের গুলি কর্ণেল প্লাটিসের শরীর ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে গেল আর ঘোড়ার ওপর থেকে মাটিতে আছড়ে পড়লেন কর্ণেল সাহেব।

১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রক্ত দিয়ে নাম লিখলো মউ।

গোলমালের খবর বাতাসে উড়ে গেল মউয়ের কেল্লায়। ক্যাপ্টেন হ্যাঙ্গারফোর্ড কেল্লার দরজা বন্ধ করে ছিলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

উত্তেজিত সেপাইরা কেল্লার দিকে ছুটলো। দখল নিতে হবে কেল্লার।

দুপক্ষের গোলাগুলির শব্দে মউয়ের অপরাহ্ণ মুখর হয়ে উঠলো। পাখিরা ভয় পেয়ে

ডানা ঝাপটে বাতাসে ঝাপিয়ে পড়লো। দুরন্ত সেপাইরা খোলা তরবারি আর বন্দুক হাতে কেল্লার ওপর আছড়ে পড়লো। হাঙ্গারফোর্ড কামান দেগে কোন রকমে দুর্গের মধ্যে টিকে রইলেন। অবশ্য বিদ্রোহীদেরও ঠেকিয়ে রাখলেন।

যুদ্ধের গতিক দেখে মউয়ের বাসিন্দারা বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে সুরু করলো। হাটে-বাজারে ঝাপ নেমে এল। স্বাভাবিক জীবন যাত্রা থমকে গেল।

বিদ্রোহীরা কামানের গোলার মার খেয়েও কেল্লা ঘিরে বসে রইলো আর তাদের গোলন্দাজদের কামানের গোলা গিয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গের পাথরের গায় আছড়ে পড়তে লাগলো। দুর্গের তাতে ক্ষয়-ক্ষতি ঘটলেও বিদ্রোহীদের কিছু সুবিধে হল না।

এই ভাবে কয়েক দিন চলল। বিদ্রোহীরা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। দিল্লি তাদের টানছে—তারাও মীরাটের ভাই-বেরাদরদের পাশে দাঁড়িয়ে দুশমনদের খতম করতে চায়। তাই তাদের কোন দল বলল, চলো ইন্দোর যাই—সেখান থেকে সবাইকে জুটিয়ে-পুটিয়ে নিয়ে তারপর দিল্লির দিকে এগোব। আরেক দল বায়না ধরলো, চলো, গোয়ালিয়রের দিকে মার্চ করি।

এই দোটানার মধ্যে সাদাত খান ভারি মুশকিলে পড়ে গেলেন। বাগ মানাতে পারেন না কাউকে। বেগ পেতে হচ্ছিল তাকে সেপাইদের সামলাতে। এমন সময় খবর হল, শাহাজাদা ফিরুজ শাহ ঢোলপুর থেকে ইন্দোরে যাবেন বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতে। খবর পেয়ে সাদাত খান মউ থেকে সেপাইদের নিয়ে ফিরুজ শাহের হাতে তুলে দিলেন। এই সব ব্যাপারে, ফিরুজ শাহের গেল দেরি হয়ে আর ইন্দোরের বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যে দিল্লির দিকে এগিয়ে গেল।

ঢোলপুরে এসেই ফিরোজ শাহ দিল্লির পতনের খবর শুনলেন।

দিল্লিকে যখন কিছুতেই রাখা গেল না তখন সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক রোহিলা খণ্ডের বীর মহম্মদ বখ্‌ত খান এসে বাদশাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, চলুন হজরৎ, এখান থেকে অযোধ্যা চলে যাই—সেখানে গিয়ে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করা যাবে। শাহান শা, আপনি থাকলে সিপাইদের হিম্মৎ বাড়বে—আমরা জবরদস্ত লড়াই দিতে পারবো—

নুয়ে পড়া মাথা তুলে বৃদ্ধ আবু জাফর সিরাজ-উদ্‌দীন বাহাদুর শাহ গাজী বললেন, ভেবে দেখি—

ভাববার সময় নেই হজরৎ।

বাহাদুর শাহ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, ইচ্ছে তো করছে তবে শরীরের কথাটাও ভাবতে হবে। কালিজায় এতটুকু জোর পাইনে—নতুন করে কিছু করবার। ইচ্ছে থাক আর না-থাক চেষ্টা করে ছিলাম শেষ রক্ষে হল না। অন্তত বিশ-তিরিশ হাজার সেপাইয়ের জান কোরবানী দিয়েও কিছু ফায়দা তুলতে পারলাম না।

বৃদ্ধ সম্রাট মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করলেন, লা শরীক আল্লাহ—।

ফিরে গেলেন বখত্ খান ব্যর্থ মনোরথ হয়ে।

ইতিমধ্যে জীনাত মহল বেগম এসে বাদশার কানে ফুসমন্তর দিলেন, আর লড়াই টড়াই করে কি হবে খোদাবন্দ। চেষ্টা তো অনেক করে দেখলেন—এখুনি কোম্পানীর কাছে ধরা দিলে হয়তো জান-মান বাঁচানো যেতে পারে। হীরে-জহরৎ সোনাদানা-টুকু বাঁচতে পারে। হয়তো না-লায়েক ছেলেদেরও বাঁচানো যাবে।

কোম্পানীর নিমক-খোর মির্জা ইলাহি বক্স্ চারদিক ভালো করে দেখে শুনে বললো, শাহানশাহ আর লড়াই-টড়াইয়ের কথা ভাববেন না। একবার যা হবার তা হয়ে গেছে। আমি হয়তো চেষ্টা করলে আপনাদের বাঁচাতে পারি। এরপর আপনি যদি এইসব ধুরন্ধরদের পাল্লায় পড়েন আবার তবে আখেরের সবটুকু আপনাকে খোয়াতে হবে।

আফিমের মৌতাতে বুঁদ-হয়ে-থাকা বৃদ্ধ শাহানশাহ একথার জবাবেও বললেন, ভেবে দেখি।

বাহাদুর শাহের মতলব হয়তো আগেই ঠিক ছিল। তাই কাউকে কিছু না-বলে দল-বল নিয়ে দিল্লির কেল্লা ছেড়ে কুতুব মিনারে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

মীর্জা ইলাহি বক্স্ খবর পেয়ে তাজ্জব। সম্রাট বাহাদুর শাহ যে এত তাড়াতাড়ি কেল্লা ছেড়ে যাবেন সে কল্পনাও করতে পারেনি। কোম্পানী তাকে মোটা টাকা দেয় বাদশাহের হালফিল খবর ওয়াকেফহাল করবার জন্যে। এরপর শাহানশাহ যদি কোন ধুরন্ধর পাল্লায় পড়ে দিল্লি থেকে সরে পড়েন তা হলে মুশকিল হয়ে যাবে। কোম্পানী তাকে আস্ত রাখবে না।

ইলাহি বক্স্ দেরি না-করে কুতুব মিনারে গিয়ে হাজির হয়ে বাদশাকে লম্বা এক কুর্নিশ করে বললো, খোদাবন্দ এই গরীবী আপনাকে মানায়। বুঝতে পাচ্ছি আপনার ভারি তকলিফ হচ্ছে। আমি তাঞ্জাম এনেছি, টাঙ্গা এনেছি চলুন হুমায়ুনের সমাধি ভবনে গিয়ে থাকবেন। সেখানে অন্তত এর থেকে স্বস্তি পাবেন।

সত্যি অসুবিধে হচ্ছিলো। পরিবার-পরিজনের সবাই ছাদের আচ্ছাদন পায় নি তাই ইতস্তত করেও রাজি হয়ে গেলেন সম্রাট। ইলাহি বক্স্ তাকে হুমায়ুনের

সমাধিতে নিয়ে তুলে কোম্পানীর সাহেবদের কাছে খবর পৌছে দেবার ব্যবস্থা করতে ছুটলো।

কোম্পানীর গুপ্তচর মৌলানা রজব আলির কাছে খবর এসে পৌছনো মাত্তর রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে হডসনের সদর দপ্তরে গিয়ে খবর দিল, শাহান শাহ আর শাহাজাদারা হুমায়ুনের কবরে গিয়ে লুকিয়ে আছে।

খবর পেয়ে তো হডসন সাহেব মহা উত্তেজিত হয়ে জেনারেল উইলসনের সদর দপ্তরে ছুটলেন।

মোমবাতির আলোয় চুরুট ধরিয়ে উইলসন কাগজ-পত্তর নিয়ে চিঠি লিখতে বসেছিলেন। হডসনকে উত্তেজিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে হডসন ?

উত্তেজিত হব না ! হডসন সামনের একটা আসনে বসে বললেন, গুরুতর খবর, বুড়ো বাহাদুর শাহ কেল্লা ছেড়ে হুমায়ুনের কবরে গিয়ে উঠেছেন—হয়তো পালিয়ে যাবার ফিকির করছেন। হয়তো অযোধ্যা কি লক্ষৌ সরে পড়ার চেষ্টায় আছেন, আর তা যদি হয় তবে আমাদের দিল্লি দখল একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে !

ভাবতে হল জেনারেল উইলসনকে। মাথা নেড়ে হডসনকে বললেন, দেখ আমাদের মিলিটারিদের এ ব্যাপারে কিছু করবার নেই', কেন না এটা পলিটিক্যাল ব্যাপার। তুমি বরং সিভিলিয়ানদের সঙ্গে দেখা কর—স্যাণ্ডার্সের সঙ্গে গিয়ে কথা বলো। তিনি নিশ্চয়ই কিছু-একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

হডসন টেবিল থেকে টুপিটা তুলে সিভিলিয়ান স্যাণ্ডার্সের সঙ্গে দেখা করতে দৌড়লেন তার দপ্তরে।

স্যাণ্ডার্সের সামনে হাজির হয়ে হডসন স্যালুট জানালেন, জেনারেল উইলসন সম্রাট বাহাদুর শাহকে আত্মসমর্পণ করবার জন্তে আদেশ পত্র লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। ঝানু সিভিলিয়ান স্যাণ্ডার্সের ব্যাপারটা বুঝে নিতে এক সেকেণ্ড সময় লাগল না। তখনই কাগজ তুলে খসখস করে হুকুমনামায় সই করে দিলেন।

হডসন কাগজটা হাতে তুলে একবার চোখ বুলিয়ে জবরদস্ত স্যালুট করলেন স্যাণ্ডার্সকে। তারপর এ্যাবাউট্ টার্ন হয়ে সেনা ব্যারাকের দিকে ছুটলেন।

গোটা একটা ব্যাটেলিয়ন নিয়ে হডসন ভড়িবড়ি মার্চ করে গিয়ে হুমায়ুনের সমাধি ঘিরে ফেলে সম্রাটের আত্মসমর্পন দাবী করলেন।

কম্বলের উপর বসে ছিলেন বাহাদুর শাহ যেন প্রাচ্যদেশীয় কোন দরবেশ। রঙ্গুনের

রঙ ধরেছে চুলে-দাড়িতে। হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙে ঈষৎ রক্তাভা। ফিকে হয়ে আসা চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি কোথায় কতদূর বুঝি উদাও হয়ে গেছে!

চারপাশে আত্মীয়-পরিজন ভিড় করে আছে। দুঃসহ এক যন্ত্রণার মধ্যে সকলের দিন কাটছে।

নীল-চোখো বর্বর হডসন বুটপায়ে সম্রাটের গালিচার উপর এসে দাঁড়িয়ে বিজাতীয় হিন্দিতে বাহাদুর শাহের আত্মসমর্পন দাবী করলেন। এবং কোম্পানী-শাহীর নির্দেশ নামাও শুনিয়ে দিলেন।

সম্রাট জানতেন আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হবে না। তাই চারপাশে ঘিরে থাকা আজন্মের সঙ্গী-সাথীদের দিকে স্তিমিত চোখে তাকালেন, হয়তো অস্ফুটস্বরে কিছু বললেন তারপর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চিরকালের মতো পা বাড়ালেন। ঝুলে-পড়া মাথাটা সোজা করেই এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সে শুধু স্বল্পক্ষণের জন্যে। কিসের ভারে তার পাগড়ি-বাঁধা শির্ বারবার নুয়ে পড়তে লাগলো। সত্তরটা বচ্ছর পার হয়ে আসা জরাজীর্ণ শরীরটা কোন ভার বুঝি আর বইতে পারছে না। হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝোলান পোষাকের পিঠে হাত দুটো লেপটে আছে, মাথার সফেদ পাগড়িটা অনেকখানি ঝুকে গেছে। সঙ্গে বেগম জীনাত মহল ও অন্যান্য পুর মহিলা।

খোলা পিস্তল হাতে শ্বাপদের হিংস্র নীল চোখে হডসন তাকে আগলে নিয়ে চললেন! সারা মুখে তার বিকীর্ণ জিঘাংসা। না, দেরি হল না দিল্লি ফিরতে। দলবল সমেত হডসন তাকে দিল্লির লাল কেল্লায় নিয়ে তুললেন।

বন্দী হলেন বিদ্রোহী সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। প্রিয়তমা মহিষী জীনাত মহল বেগম আর ছেলে জোয়ান বক্ত্।

কারো পক্ষে সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন উপায় রইলো না।

সম্রাটের আসন হল একটা খাটিয়া, যা কয়েকদিন আগেও তার কোন নোকর ব্যবহার করেছে। শুধু দুজন বান্দাকে ময়ূরপেখমের পাখা হাতে সম্রাটকে বাতাস করবার অনুমতি দেওয়া হল। মুঘলবংশের শাহীজমানার এই টুকুই শেষ চিহ্ন।

একটু দূরে দুজন লালমুখো ফিরিঙ্গি। রাইফেল তাগ করে পাহারা দিতে লাগলো। তাদের নির্দেশ দেওয়া রইলো, পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা হলেই যেন বাহাদুর শাহকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

নিঃসঙ্গ দিন কাটতে লাগলো সম্রাটের। চারপাশে কঠোর পাহারা। বাইরের পৃথিবীর এতটুকু সংবাদ দিল্লির লাল কেল্লার ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারে না।

যদিও তখনো উত্তর ভারত জুড়ে বিদ্রোহের আগুন। বিদ্রোহী নায়কেরা ইংরাজ শাসনের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

সম্রাট নিশ্চিন্ত এক আসনে বসে দিন কাটান। রাত্রে চোখে ঘুম নেই। অসহ্য এক চিন্তার ভার তার কলিজা কাবু করে ফেলেছে। সময় আর কাটতে চায় না। এই অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্যে সম্রাট শায়েরী রচনায় ডুবে গেলেন।

শোনা যায় এই সময় একজন বলেছিলেন তাকে :

দম্ দবে মে দম্ নহী অব্ খয়ের্ মাঙ্গো জান কি!

এয় জাফর ঠাণ্ডি হুয়্ শমশীর হিন্দুস্তান কী।

এখন প্রত্যেক মুহূর্তে আপনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন। জীবনের জন্যে প্রার্থনা করুন (কোম্পানীর-শাহীর কাছে) কেন না হে সম্রাট হিন্দুস্থানের তরবারি চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সম্রাট নাকি এর উত্তরে বলেছিলেন:

গাজীয়ো মে় বু রহেগী জব তলক ইমান কী।

তব তো লন্দনতক্ চলেগী তেগ্ হিন্দুস্তান কী।

(যত দিন আমাদের বীরদের হৃদয়ে (দেশের প্রতি) আনুগত্য থাকবে ততদিন ভারতের তরবারির ধার থাকবে অক্ষুণ্ণ—আর একদিন সেই তরবারি লণ্ডনেও ঝলসে উঠবে।)

এ কাহিনীর সত্যি-মিথ্যে জানা যায় না। তবু এই লোকশ্রুতি বাহাদুর শাহের বুকের ভিতর থেকে ছিটকে-আসা স্ফুলিঙ্গের প্রমাণ দেয়।

সারারাত ঘুম হয় নি হডসনের। দারুন একটা হিংস্র উত্তেজনা তাকে বিনিদ্র করে রেখেছে। দিল্লি অধিকারের সময় কালা শয়তানগুলো ইংরেজ নারী-পুরুষ আর শিশুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে।

কল্পনা করা যায়, এই নরকের কুত্তাগুলো মিস জেনিংসকে ন্যাংটো করে কামানের গাড়ির চাকার সঙ্গে বেঁধে চাঁদনিচক পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছিল তারপর শাহাজাদাদের চোখের সামনে তাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলা হয়েছিল।

মিস ক্লিফোর্ডকে হত্যা করবার আগে তার ওপর নাকি পাশবিক অত্যাচার করা হয়।

এতেও শেষ নাকি! আরো আছে, একজন ক্যাপ্টেনের বৌকে ফুটন্ত ঘিয়ের মধ্যে সেদ্ধ করা হয়েছিল।

তা ছাড়া চল্লিশটা সুন্দরী ইংরেজ মেয়ে—যাদের বয়েস চোদ্দ থেকে চব্বিশ তাদের পোষাক খুলে দিল্লির রাজপথ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছিল; তারপর সকলের চোখের সামনে তাদের ধর্ষণ করা হয়।

পল্লবিত এ সব কাহিনী সত্যি-কি-মিথ্যে কেউ খোঁজ করেনি। করবার দরকারও হয়নি, কেননা যা রটে তা নাকি কিছুটা সত্যিও বটে।

হডসনও তাই বিশ্বাস করেন। সুসভ্য ইংরাজদের একজন হয়ে হডসনও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, এই বর্বরোচিত কাজের প্রতিশোধ নেওয়া তার মহৎ কর্তব্য ও দায়িত্ব। আর এমন প্রতিশোধ নিতে হবে যা এদেশিদের চোখের সামনে ইংরেজ-প্রতিহিংসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে হডসন আবার কয়েকটা বলদের গাড়ি জোগাড় করে হুমায়ুনের কবরের দিকে যাত্রা করলেন :

শাহজাদা তো একজন নয়! আঙুলে গুনে শেষ করা যায় না। মীর্জা মুঘল, মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জা আবুবকর, এ ছাড়া মীর্জা ফিরুজ শাহই সাতজন। আরো নাম-না-জানা কতজন আছে তার হিসেব কে রাখে!

এই সব রাজপুত্রেরা এতদিন রাজপ্রাসাদের বারান্দা-অলিন্দে কপোতকূজন করে ফিরেছে। নিজেদের মাসোহারা নিয়ে ঝগড়া করেছে। এ ছাড়া সারাক্ষণ পারস্পরিক ঈর্ষা-অসূয়া-বিদ্বেষে রাজপ্রাসাদের পাথরে মাথা ঠুকে মরেছে।

তারপর হঠাৎ একদিন সেপাইরা মাথা তুলল। কোম্পানীর ভিৎ নড়লো। ঝোড়ো হাওয়ার গুমরে-ওঠা আক্রোশের ধাক্কায়-পাল শুদ্ধ মাস্তলের ভেঙে পড়ার মতো ইংরেজ রাজত্ব ভেঙে পড়লো।

সেপাইরা দ্বিতীয় বাহাদুর জাফর শাহের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে দিগ-দিগন্তর থেকে ঝাণ্ডা উড়িয়ে জলস্রোতের মতো দিল্লির দিকে এগোতে লাগলো।

বুড়ো বাদশা মৌতাতের খোয়াব ভেঙে সূর্যালোকে বেরিয়ে এলেন। সেই শেষবার মুঘলশাহীর শিরস্ত্রাণ সূর্যকরোজ্জ্বল গৌরবে হিমালয়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়ালো। আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করলো।

এই হঠাৎ-পাওয়া ক্ষমতা নিয়ে গৃহবলিভুক রাজপুত্রদের হামবড়াই গেল বেড়ে। কুড়িয়ে পাওয়া ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য তাদের মাথা বেচাল করে দিল। চকমকির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে তারা ভাবলো, এই হঠাৎ রোশনাই বুঝি বেহেস্ত থেকে তাদের ওপর চিরকালই ঝরে পড়বে।

তাদের যে দুর্ধর্ষ পূর্বপুরুষ অদম্য উৎসাহ আর অনমনীয় জেদ নিয়ে ভারতের মাটিতে পা দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন সেই সাহসের কানাকড়িও তাদের ছিল না। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য যে দুঃখ সহ্য-করা তপস্যার ভিতর দিয়ে আসে সে অনুভব তাদের ছিল না। গোস্ত আর রুটির মতো সুখকে তারা বিনা আয়াসে কবজা করতে

চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আবার হঠাৎ-অন্ধকার নেমে এলো।

গেনের হাত থেকে পিছলে যাওয়া রাজদণ্ড আবার তাদের শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরা পড়লো।

সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানী সেপাইদের সমস্ত প্রতিরোধ তচনচ করে দিয়ে যখন দিল্লি অধিকার করল তখন এই সব শাহজাদারা বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে লাগলো, এসব বুঝি জাদুগরের চেরাগেরখেলা! মুশকিলে পড়ে গেল তারা। সব দোষ সেপাইদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যখন বুঝলো, গোরায়া তাতেও রেহাই দেবে না তখন তারা পালাবার ফিকির খুঁজতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন খবর পেল, খুদ্ শাহানশা কুতুবমিনার থেকে সরে হুমায়ুনের কবরে গিয়ে ডেরা নিয়েছেন তখন তারাও পড়িমরি করে হুমায়ুনের কবরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

ভোর তখনো হয় নি। মাথার ওপর রূপসী শুকতারা। মুয়াজ্জিনের দূর থেকে ভেসে আসা আজানের মতো ঈষৎ আলোর আভাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

তবু সেই কাক-ডাকা ভোরের আগে হডসন কয়েকটা গরুর গাড়ি আর একদল সেপাই নিয়ে হুমায়ুনের সমাধি চত্বরে গিয়ে হাজির হলেন।

পালাবার সবগুলো পথের পহরায় সেপাই-সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে খোলা পিস্তল হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন হডসন।

ইতিমধ্যে খবর পৌঁছেছিল ভিতরে, গোরা-ফিরিঙ্গিরা সেপাই-লস্কর দিয়ে এলাকাটা ঘিরে ফেলেছে।

শাহজাদারা এদিক সেদিক ছুটোছুটি সুরু করে দিল যদি ভেগে যাওয়া যায়।

কশাই খাঁচার ভিতর হাত ঢোকালে মুরগিদের মধ্যে যেমন ত্রাসের ছটফটানি শুরু হয়ে যায়—সমাধি-ভবনের আবছা অন্ধকারে তেমনি একটা ত্রাস ছটফট করে বেড়াতে লাগলো।

কাল হিন্দুস্থানের বাদশাকে ধরে নিয়ে গেছে আজ আবার কাকে নিতে এসেছে কে জানে! বেগম-বাঁদি-আওরতদের মহলে সবাই ডুকরে কেঁদে উঠলো। মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা স্রোত হয়ে গড়িয়ে গেল বুঝি!

হডসনের মনে যাই থাক, অত্যন্ত শান্ত ও সহজভাবে শাহজাদাদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের আত্মসমর্পন দাবী করলেন।

শাহজাদারা বললো, কথা দিতে হবে আমাদের ওপর কোন অত্যাচার করা হবে না।

মাথা নাড়লেন হডসন, এমন কথা দেবার অধিকার আমার নেই। আপনারা কোম্পানীশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছিলেন। যদি নির্দোষ প্রমাণ হন মুক্তি পাবেন আর বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে যা শাস্তি হয় মাথা পেতে নিতে হবে।

সন্দেহ চকচক করে ওঠে শাহাজাদাদের চোখে। ব্রিটিশ বিচার কি বস্তু তা জানতে তাদের বাকি নেই।

হডসন তাদের বোঝান, সেখানে আপনারা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন।

আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। দিল্লির বাইরে থেকে সেপাইরা এসে হাঙ্গামা বাধিয়েছে—আমাদের কোন ইলজাম্ নেই।

বিচারকদের বলবেন সে কথা। নির্দোষ প্রমাণ হলে অবশ্যই মুক্তি পাবেন।

তবু শাহাজাদাদের মন থেকে সন্দেহ যেতে চায় না। পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় তারা।

চলুন দেরি করবেন না। তাড়া লাগান হডসন। জোর-জবরদস্তি করেন না। বরং স্বভাবের চেয়ে বেশি স্থির এবং সংযত মনে হয় তাকে।

শাহাজাদারা হডসনের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। ভিড়-করে-থাকা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও কথা বলে।

ভয় পাবার কিছু নেই মৃদুকণ্ঠে বলেন হডসন, বাদশার মতো আপনাদের লালকেল্লায় রাখা হবে। অসুবিধের মধ্যে আপনাদের লালকেল্লা থেকে বেরুতে দেওয়া হবে না। লালকেল্লার ভেতরে আগেও যেমন থাকতেন তেমনি থাকবেন।

তিন রাজপুত্র অনেক ভাবনাচিন্তার পর গোরুর গাড়িতে গিয়ে উঠলে।

হডসন আর একটি মাত্র কথা না-বলে দিল্লির দিকে রওনা দিলেন। তার মনের কথা জমে-থাকা মানুষদের কেউ দেখতে পেল না।

সারা পথ তিন রাজপুত্র মীর্জা মোঘল, মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জা আবুবকর বলদ-টানা গাড়ির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলে।

গাড়ির চাকার ক্যাচ্-কোচ্ শব্দ আর সৈন্যদের বুটের আওয়াজ ছাড়া সেই নির্জন পথে আর কোন শব্দ ছিল না।

নিজের ধৈর্যকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে পথ হাঁটছিলেন হডসন। তার ইচ্ছে আর উত্তেজনাকে চেপে রাখতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। নিজের অজান্তে বারবার খাপে গোঁজা পিস্তলের উপর গিয়ে পড়ছিল তার হাত।

হুমায়ুনের কবর থেকে কয়েক মাইল পথ পেরিয়ে দলটা এসে দিল্লি গেটে থামলো।

এবার আর হডসন নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তার ভেতরে যে জিঘাংসু জানোয়ারটা এতক্ষণ হিংস্র আক্রোশে লোহার গারদে মাথা ঠুকছিল, ছাড়া পেতেই ধারালো দাঁত আর নখের হাতিয়ার নিয়ে শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়লো।

হডসনের মুখ থেকে একটাই শব্দ বের হল, রোকো—

থেমে গেল গাড়িগুলো।

হাডসনের হিংস্র হাত জড়সড়ো রাজপুত্রদের গাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে নিয়ে এলো; তারপর তিনজনকে পরপর দাঁড় করিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালালেন।

বাবুরের তিন উত্তরপুরুষ দিল্লি গেটের সামনে এক রক্তাক্ত পরিণতি হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

খুদা শুকরগার!

ফিরুজ শাহ ফৈজাবাদের মৌলভী ও অযোধ্যার হজরত মহল বেগমের মতো লক্ষ্ণৌ এসে হাজির হলেন। লক্ষ্ণৌ তখন বিদ্রোহীদের অধিকারে। সেপাইদের মদত দেবার জন্যে কুনোয়ার সিং এবং দিল্লির পতনের পর মীর আতিশ মোহাম্মদ বখত্ খান এসে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির ভিতর থেকে মরিয়া-হয়ে-লড়ে-যাওয়া ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে নিদারুন আক্রমণ শুরু করলেন।

লক্ষ্ণৌ যুদ্ধের সময় তাঁবুতে বসে ফিরুজ শাহ বখত্ খান ও দিল্লি থেকে আসা অন্যান্য অনেকের কাছ থেকে হডসনের নারকীয় ভাবে শাহজাদাদের হত্যা ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে লালকেল্লায় বন্দী করে রাখার যাবতীয় বিবরণ পেলেন।

সারারাত ঘুমোতে পারেন নি ফিরুজ শাহ। চোখে নেই ঘুম। মনে নেই শান্তি। অসহ্য এক যন্ত্রণা তাকে বিমূঢ় করে তুলেছিল। তার বাল্য ও যৌবনের সেইসব সহচর যাদের সহৃদয় সান্নিধ্যে দিল্লি প্রাসাদ রূপকথা হয়ে আছে তাদের নির্মম মৃত্যু বুঝি তাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। সারারাত তাঁবুর ভিতরে-বাইরে পায়চারি করেছেন আর অসহায় ভাবে আল্লাকে স্মরণ করেছেন।

ঘুম ভেঙে সঙ্গীরা অবাক হয়ে গেছে, একি মীর্জা সাহেব আপনি ঘুমোন নি!

প্রশ্ন কানে পৌছোয়নি ফিরুজ শাহের, তিনি তো ব্যথার গভীরে ডুবে আছেন!

জেনারেল হ্যাভেলক কলকাতায় চিঠি লিখলেন, আমরা খুব বেকায়দায় পড়ে গেছি; যদি নতুন করে সৈন্যসামন্ত ও রসদ-পত্তর পাঠালো না-হয় তবে এলাহাবাদ থেকে সরে-আসা এবং লক্ষ্ণৌয়ে আত্মসমর্পন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

খবর পাওয়া মাত্তর কলকাতা থেকে কয়েকদল সৈন্য আযার, আউট্রাম ও কুপারের নেতৃত্ব রওনা হয়ে গেল

কানপুরে যে-সব সৈন্য ছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে হ্যাভেলক সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে গঙ্গা পার হয়ে লক্ষ্ণৌর দিকে এগোতে লাগলেন।

এ সময় হ্যাভেলকের অধীনে মোটামুটি ভাবে হাজার আড়াই ব্রিটিশ সেনা ছিল। এর সঙ্গে শিখদের সংখ্যা ধরলে দাঁড়ায় তিন হাজার দু শ। এ ছাড়া বাছাইকরা ঘোড়সোয়ারের একটা দল ও সেরা স্কচ গোলন্দাজদের একটা বাহিনী। নায়ক নীল, আয়ার ও আউট্রাম তো আছেনই।

দ্রুতগতিতে এগোতে লাগলেন তারা। হ্যাভেলক ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির মধ্যে আটকে পড়া ক্ষুধার্ত, ক্লিষ্ট ও মুমূর্ষু মানুষদের আবেদন পেয়েছেন, তাদের বাঁচাতে গেলে এক্ষুনি লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করা দরকার।

হ্যাভেলকের বাহিনীর বিউগিলের শব্দে উচ্চারিত হয়ে ওঠে:. 'Cheer Boys, Cheer !'

পদাতিক-ঘোড়সোয়ার-গোলন্দাজ বাহিনী তুরন্ত চকাওয়াজ করে পথ-প্রান্তর পার হয়, কামানের চাকার ঘর্ঘর নির্জনতা তচনচ করে দেয়।

এ দিকে লক্ষ্ণৌতে কম বেশি লাখ-খানেক সেপাইয়ের জমায়েত হয়েছে। এরি মধ্যে শ'খানেক কামান শত্রুর পথের দিকে মাথা তুলেছে। প্রায় দেড়শ' পদস্থ সমরনায়ক যুদ্ধের ব্যবস্থা সরেজমিনে তদারক করছেন; কামান ও গোলন্দাজবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছেন, অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদের ভাঁড়ার নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিচ্ছেন, জমে-থাকা খাদ্য-রসদ সরবরাহের জন্যে সুবিধে মতো জায়গা তল্লাস করছেন।

সৈন্যদের মাইনে ও বকেয়া মেটাবার জন্যে কাইজার বাগে মোহরও সিক্কা টাকা এনে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রচুর হীরে-জহরত-চুনি-পান্না মুক্তোও সেখানে জমা করা আছে।

লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীরা যে-ভাবে সৈন্য ও রণসম্ভার মজুদ করছে তা' যেন কোন মহাযুদ্ধের ভূমিকা।

তবু কেমন যেন ঢিলে-ঢালা ভাব।

হ্যাভেলক এগোচ্ছেন এ খবরেও বিদ্রোহী নায়কদের বুঝি হুঁশ নেই। লোক-লস্কর সেপাই-ফৌজ খোশ-গল্পে রং-তামাশায় মেতে রয়েছে।

সেই সময় একদিন অযোধ্যার বীরাঙ্গনা বেগম হজরত মহল বিদ্রোহীদের ডেকে পাঠালেন এক সমাবেশে।

সেখানে তিনি ফুঁসে উঠলেন, আমাদের সমস্ত সেনাই তো লক্ষ্ণৌয়ে হাজির। এদের দেখে মনে হচ্ছে, সবাই বুঝি জেনানা। এই সব আওরত দিয়ে আমরা লড়াই করবো—দুশমনকে হারাব! তাজ্জব, এরা এখনো বসে আছে—এরা এখনই গিয়ে আলমবাগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন! এরা কি অপেক্ষা করছে কবে কোম্পানী আরো নতুন ফৌজ আর ফৌজী সরঞ্জাম এনে লক্ষ্ণৌ ঘিরে ফেলবে? দিল্লিতেও তো এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। সেখানেও হাতিয়ার-আদমি কিছুরই অভাব ছিল না—তবু হঠতে হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, কতদিন আর বসিয়ে-বসিয়ে মাইনে গুনবো। আমি এখনই উত্তর চাই আপনারা কি করবেন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেগমসাহেবা মৃদু কণ্ঠে বললেন, খোদা ভরসা, আপনারা লড়াই না করলে আমাকে ইংরাজদের সঙ্গে কথা চালাতে হবে, আমার জান বাঁচাতে হবে।

সর্দার-নায়কেরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, নেহি—কভি নেহি! ডরিয়ে মত্‌, বেগমসাহেবা। হমলোগ লড়েঙ্গে—জরুর লড়েঙ্গে, ইয়ে হম্‌ লোগো কো মানলেনা হী হুয় কি আগর হম্‌ নহী লড়ে তো ফাঁসি পর্‌ ঝুলনাহি পড়ে গা।

তেইশে সেপ্টেম্বর নাগাদ হ্যাভেলকের বাহিনী লক্ষ্ণৌর উপকণ্ঠে এসে হাজির হল। মুহুর্মুহু কামান গর্জনে ব্রিটিশ সিংহের ক্রোধ প্রকাশ পেল।

শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে ইংরাজদের মুখোমুখি সংঘাত। এই যুদ্ধে ফিরুজ শাহ, ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ আলি শাহ দিল্লি থেকে আসা রোহিলাখণ্ডের বীর মহম্মদ বখত্‌ খান, হজরত মহল বেগমের বিশ্বস্ত ও অনুগত মুম্মু খান, জগদীশ-পুরের কুনোয়ার সিং কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে দুর্বার আক্রমণে সামিল হলেন।

ফিরুজ শাহের নেতৃত্বে মোকরানি পাঠানরা দুর্জয় বীরত্বের পরিচয় দিল। শত্রু ব্যূহের সামনে অশ্বারোহী এই তরুণ রাজপুত্র তার বেপরোয়া বীরত্বের দৃষ্টান্তে সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। দিল্লির হত্যাকাণ্ড তাকে বুঝি মরিয়া করে তুলেছিল।

সারাদিন ধরে দু পক্ষে উন্মত্ত লড়াই চললো।

দেশীয় গোলন্দাজেরা ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের চেয়েও নিখুঁত নিরিখে গোলাবর্ষণ করে চললো।

গোরা সৈন্যরা বলাবলি করতে লাগল, the mutiueers fight like devils.

তাদের কেউ বললেন, he did not see such heavy or sharp firing in Crimea as he has seen here.

কারো গলায় খেদ প্রকাশ পেল, our men do not serve the guns so well, or manage to load them so quickly.

কেউ-কেউ ক্রোধে ফেটে পড়লেন, It is dreadful to think that all the teaching and training they have had from us, and our own guns, should be turned against us.

শরতের দিন।

কখনো রৌদ্র; কখনো-কখনো মেঘছায়া কাঙ্ক্ষিত প্রার্থনার মতো যুদ্ধের এলাকা ছুঁয়ে যাচ্ছে।

কামানের গোলার ধোঁয়ায় গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেল।

বিশ-পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের কামানের গোলা ছুটে যাচ্ছে এদিকে-ওদিকে। তারপর ফাটছে। আগুন ছড়াচ্ছে। তাজা বারুদের গন্ধ উড়ছে।

সন্ধে পর্যন্ত যে-লড়াই হলো তাতে আউট্রাম-আর আয়ার সুবিধে করতে না পারলেও বিদ্রোহীদের পাঁচটা বিশ পাউণ্ডের কামান দখল করে নিলেন।

অবশ্য সেপাইরাও কোম্পানীর একটা কামান হাতিয়ে নিতে পেরেছিল।

সারাদিনের যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রইল। বিজয়লক্ষ্মী কার গলায় মালা দেবেন তখনো বুঝি স্থির করে উঠতে পারেন নি।

অসহ্য গরমে-ঘামে দু পক্ষ ক্লান্ত; তাই সন্ধের দিকে নির্মম সংঘর্ষের দাপট খানিকটা ঝিমিয়ে এল।

দু পক্ষই রাত্রির মতো বিশ্রাম চাইছিল।

বিস্তীর্ণ জলাভূমির স্যাঁতসেঁতে মাটিতে কোম্পানীর সৈন্যরা রাত্রির আড়ালে বিশ্রামের সুযোগ নিতে চাইল।

তারা হয়তো ভেবেছিল সারাদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সিপাইরাও বিশ্রাম নেবে।

বিদ্রোহী নায়কেরা পরামর্শ করে স্থির করলেন, যুদ্ধ চলবে। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! এখন বিশ্রামের সময় নয়।

বিদ্রোহীদের কামান গর্জে উঠলো। ঘোড়সোয়ার আর পদাতিকেরা জমাট-বাঁধা অন্ধকার হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

২৫ সেপ্টেম্বর রক্তাক্ত সূর্য আলমবাগের উপর আলো ছড়িয়ে দিল। বিদ্রোহীদের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে হ্যাভেলক লক্ষ্মৌ ঢোকবার সোজা রাস্তা ছেড়ে রেসিডেন্সিতে যাবার ভিন্ন পথ ধরলেন।

বিদ্রোহীদের কামানও মুখ ফিরিয়ে মুষলধারে গোলা ছুঁড়তে লাগলো। এত ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গীরণ সহ্য করা অসম্ভব তবু স্কট গোলন্দাজরা বেপরোয়া বীরত্বের

সঙ্গে আগুনে-গোলা অগ্রাহ্য করে প্রত্যুত্তর দিতে লাগলো। আর একটু-একটু করে আলমবাগ ছাড়িয়ে চারবাগের সেতুর সামনে গিয়ে হাজির হল। চারবাগ সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেতু পার হতে পারলে হুড়মুড় করে লক্ষ্মৌতে ঢুকে পড়া যাবে।

সেতুর মুখে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে আছেন মহম্মদ বখত্ খান। তাকে মদত যোগাতে আছেন ফৈজাবাদের মৌলভী, ফিরুজ শাহ, আর কুনোয়ার সিং। আজকের যুদ্ধে জীবন কোরবানী তাদের পণ। দাসত্বের শেকল ছুঁড়ে ফেলে সিপাইরাও পণ করেছে, লড়াইতে হেরে তারা ফিরবে না; শত্রু যদি লক্ষ্মৌ ঢুকতে চায় তবে তাদের মৃতদেহ মাড়িয়ে যেতে হবে।

কোম্পানীর ফৌজও মৃত্যু পণ করে এগোচ্ছে। তাদের শক্তি যোগাচ্ছে গোলন্দাজবাহিনী। ক্যাপ্টেন মাউদের গোলন্দাজবাহিনী এক নাগাড়ে প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে গোলা বর্ষণ করে চললো সেতুর ওপর।

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পাথরের চাঁইয়ের মতো অনড় হয়ে সেতুমুখ রক্ষা করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ইযোলো বাংলোর কাছে এবং সেতুর সামনে বেশ কিছু ব্রিটিশ সৈন্য হাতাহাতি যুদ্ধে প্রাণ হারালো।

যুদ্ধের অবস্থা এ-সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুকূল হয়ে উঠছিলো।

হঠাৎ জেনারেল হ্যাভেলকের ছেলে জুনিয়র হ্যাভেলক একদল বাছাই সৈন্য নিয়ে সেতুর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। তাদের পৃষ্ঠরক্ষা করতে পুরো ব্রিটিশ বাহিনী সেদিকে এগিয়ে চললো।

দুই বিরোধী পক্ষের ভারে সেতু থরথর করে কেঁপে উঠলো। ইংরেজদের প্রবল চাপ সহ্য করতে না পেরে সিপাইরা পিছু হঠতে লাগলো। আর জলের তোড়ের মতো ব্রিটিশ সৈন্য এগিয়ে এসে সেতু দখল করে নিল।

লক্ষ্মৌতে ঢোকবার দরজা ভেঙে পড়লো।

তাড়াতাড়ি এগোতে গিয়ে ব্রিটিশ সৈন্য ভুল পথে গিয়ে পড়লো। নীল্ না-থেমে সেই পথ দিয়ে খাশবাজারে পৌছে গেলেন। গোলন্দাজবাহিনী তখনো পিছনে।

ভুল বুঝতে পেরে নীল্ ঘোড়ার লাগাম টেনে পিছন দিকে তাকালেন আর সেই মুহূর্তে একটা গুলি এসে জেনারেল নীলের ঘাড়ে বিদ্ধ হল, ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেলেন নীল্।

জেনারেল নীলের মৃত্যুতে কোম্পানী ফৌজ থেমে গেল না তারা কুচকাওয়াজ করে রেসিডেন্সিতে এসে হাজির হল হ্যাভেলকের অধিনায়কত্বে। সাতাশি দিন

আটকে পড়া তেরোশ' ইউরোপীয় সৈনিক-নারী-পুরুষএবং ও শিশু চারশ' ভারতীয়দের মধ্যে বেঁচে ছিল মাত্তর দু'শ, তারাই আনন্দে স্বাগত জানালো জেনারেল হ্যাভেলককে।

তবু লক্ষ্ণৌ দখল নেওয়া কি সহজ কথা। লক্ষ্ণৌতে কোম্পানী ঢুকতে পারলেও অধিকার কায়েম করতে পারে নি। তখনো বিদ্রোহীরা সবটুকুই প্রায় নিজেদের মুঠোয় রেখেছে।

লক্ষ্ণৌ দখল যে সহজ হবে না এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় নি, কোম্পানী তাই দিল্লির দখলদারী কায়েম হলে সেখান থেকে পীলের অধীনে একদল সৈন্য লক্ষ্ণৌর দিকে মার্চ করলো। স্যার কলিন ক্যাম্পেল কানপুর থেকে গঙ্গা পেরিয়ে এলেন সঙ্গে শিখ আর ব্রিটিশ সৈন্য, আনকোরা হাউটজার কামানও গোটা কয়েক। এদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে রইলেন উইণ্ডহ্যাম।

এর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ব্রিগেডিয়ার গ্রান্ট আর গ্রিমহেড্। ব্রিটিশের পা-চাটা নেপালের মহারানা জং-বাহাদুর ন'হাজার গুর্খা সৈন্য নিয়ে হুজুরে হাজির হলেন।

তারপর সপ্তরথী মিলে লক্ষ্ণৌ ঘিরে কামান সাজালেন, সৈন্য সাজালেন। বিউগিল বেজে উঠলো। কয়েক হাজার সেনা কামানের চাকার সঙ্গে মাটি কাঁপিয়ে সামনে এগোল।

লাল-ইউনিফর্ম-পরা হাইল্যাণ্ডারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে শিখেরা। তাদের নায়ক গোকুল সিং বাতাসে একবার হাসিয়ে হাঁক দিল, পুর্বিয়া সেনা অহনানে সাঁড়া রাজপাট খতম্ করু দিন্থাএ—হুঁড় আর্সি অহনা মুঁ খতম্ করকে ছডাঙ্গে—

সেদিন সিকন্দরবাগে কোম্পানী ফৌজের সামনে যারা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বাতাসে পতপত করে ওড়া সার-বাঁধা ইউনিয়ন জ্যাক, কামানের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, হাউটজারের মুহুর্মুহু গর্জন, যুদ্ধাশ্বের উচ্চকিত হ্রেষা, সূর্যালোকে চমকে ওঠা নাঙ্গা তলোয়ার, হিংস্র শ্বাপদের মতো উদ্যত বেওনেট আর ব্যাণ্ড বিউগিলের সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে-আসা ঢেউয়ের ছড়ানো জল-কল্লোলের মতো সৈন্যদের উন্মত্ত যুদ্ধ কোলাহল মুহূর্তের জন্যেও তাদের বিমূঢ় করে দিতে পারে নি।

সেদিন নায়ক ছিলেন শাহজাদা মীর্জা ফিরুজ শাহ, মহম্মদ বখত্ খান, কুনোয়ার সিং, ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদ আলি শাহ--নিঃশঙ্কচিত্ত বীরযোদ্ধার দল।

ফিরুজ শাহ তরবারি আকাশে তুলে হাঁক দিলেন, সামনে দুশমন—আগে বাড়ো—হুশিয়ার হো—

বীর নায়কেরা তাদের ঘোড়ার লাগাম টেনে প্রস্তুত হলেন। এখুনি ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

'হুঁশিয়ার হো' শব্দটা সামনে থেকে পিছনের দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

মহম্মদ বখত্ খান কামানের আগুন দেবার ছেঁদায় অগ্নিসংযোগ করলেন আর বিশ পাউণ্ড ওজনের কামানের গোলা ছুটে গেল। যুদ্ধ সুরু হল।

সিপাইরা ঝাপিয়ে পড়লো শত্রুর পর।

'অমর মরণ রক্ত-চরণে ডাকিছে সগৌরবে।'

ঢল বয়ে গেল রক্তের। প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্যে মাটি কামড়ে লড়াই!

সিকান্দারবাগের সিপাইরা সেদিন জান কোরবানী পণ করে মৃত্যুর পাঞ্জা কষে ধরলো।

লড়াই তো শুধু সিকান্দারবাগে নয়, দিলখুশবাগ-কদমরসুল-বেগমকোঠী সব জায়গায় আজাদীর সেপাইদের হাতের হাতিয়ার দুরন্ত মৃত্যু হয়ে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো।

একাকার হয়ে গেল দিনরাত্রি।

সুন্দরী লক্ষ্ণৌ ভয়ার্ত কপোতীর মতো ছটফট করতে থাকে। তাজা বারুদের গন্ধে আর কামানের ধোঁয়ায় তার প্রাসাদ-মিনার-মঞ্জিলে কারুকার্য করা মসৃণ মুখ ঢাকা পড়ে গেল।

পুরো সাত দিন ধরে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলল দুপক্ষে।

তবু বিদ্রোহীদের দমানো যায় না।

তারা বারবার কোম্পানীশাহীর আক্রমণ তচনচ করে দিতে লাগলো। অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব আর অপরাজেয় বীরত্বের গাথা হয়ে রইল লক্ষ্ণৌ।

ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ আলি শাহ হাতিতে চড়ে আলমবাগে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

মীর আতিশ বখত্ খান গোলন্দাজদের সঙ্গে থেকে শত্রুর সমস্ত কৌশল তচনচ করে দিতে লাগলেন।

শাহজাদা ফিরুজ শাহ তার রিসালাদার আর পদাতিকদের নিয়ে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখিলড়াইয়ে বিদ্যুতের মতো চমকে উঠতে লাগলেন।

লক্ষ্ণৌ অদম্য এক বীরত্বকে হাতিয়ার করে কোম্পানীর দুরন্ত আক্রমণ প্রতিহত করে দিতে লাগলো।

নতজানু হয়ে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম লক্ষ্ণৌ নয়!

মুশকিলে পড়ে গেলেন কলিন ক্যাম্বেল। শত্রুর শিরদাঁড়া গুঁড়ো করে দেবার মতো আক্রমণ চালিয়েও সুবিধে হচ্ছে না। নতুন করে তাকে সৈন্য সাজাতে হবে। নেতৃত্ব পালটাতে হবে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ তবু যুদ্ধ থামবার কোন লক্ষণ নেই।

রণক্লান্ত ব্রিটিশ ফৌজ লক্ষ্ণৌর সামনে ওৎ পেতে বসলো। কলিন ক্যাম্বেল এবার শেষ লড়াইয়ের জন্যে সৈন্য সাজাতে বসলেন। স্যাপার, আর্টিলারী ক্যাভালরী ইন্‌ফ্যানট্রি এনে জড়ো করলেন দিলখুশাবাগে।

চার হাজার সৈন্য ও পঁচিশটা কামান দিয়ে আউট্রামকে পাঠালেন আলমবাগের দায়িত্ব দিয়ে।

কোম্পানীর সঙ্গে জং বাহাদুরের চুক্তি অনুসারে নতুন তিনদল গুর্খা ফৌজ নেপাল থেকে নেমে এলো সাহায্য করতে।

এছাড়া জেনারেল ফ্রাঙ্কস ও রোক্রাফ্‌ট্‌ দু ডিভিসন সৈন্য নিয়ে কলিন ক্যাম্বেলকে সাহায্য করতে লক্ষ্ণৌ এসে পৌছলেন।

ইংরাজদের চতুরঙ্গবাহিনী লক্ষ্ণৌকে ঘিরে দাঁড়ালো।

হাউটজার কামানগুলো মাথা উঁচু করে নিশানা করতে লাগলো। সহরকে উত্তর-পুবে ঘিরে একসঙ্গে আক্রমণ চালালেন কলিন ক্যাম্বেল।

সিপাইদের পক্ষেও তোড়জোড়ের ঘাটতি ছিল না। আশপাশের বহু রাজা-নবাব-জমিদার-তালুকদার লক্ষ্ণৌ রক্ষা করবার জন্যে লোক-লস্কর সিপাই-সান্ত্রী নিয়ে বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। কামানের শক্তিতে বিদ্রোহীদের যে-টুকু ঘাটতি ছিল বীরত্ব দিয়ে তারা তা পুষিয়ে দিয়ে ব্যগ্র হল।

কলিন ক্যাম্বেল চারদিক থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তার স্কট ফিউজিলিয়ার্সরা মুষলধারে আগুনে গোলা বর্ষণ করে শত্রুর সংহতি নষ্ট করে দিতে ব্যস্ত হল। অশ্বারোহী শিখেরা যেন প্রতিহিংসা নেবার নেশায় মাতাল হয়ে লড়াইতে নেমেছে। তারা এক-একবার মরিয়া হয়ে এগোচ্ছে কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের হাতে দারুণ মার খেয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরছে পিছু হঠতে। তবু তাদের হাতের বর্শা সাপের জিভের মতো বেরিয়ে এসে ছোবল মেরে যাচ্ছে।

এমন সময় খবর ছড়ালো, দিল্লির খুনী হডসন যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছে। এই ঘাতক ঠাণ্ডা মাথায় লাল কেল্লার সামনে অসহায় শাহজাদাদের গুলি করে হত্যা করেছে।

খবরটা শাহজাদা মীর্জা ফিরুজ শাহের কানেও পৌচেছিল। সেই দারুণ লড়াইয়ের মধ্যে তার অস্ত্রের নিরিখ হডসনকে লক্ষ্য করে ফিরতে লাগল।

আক্রমণ যেন তুঙ্গে উঠলো।

স্কট গোলন্দাজেরা নির্বিচারে গোলা বর্ষণ করে চলেছে। সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণের আগুনের ধোঁয়ায় অপরাহ্নের সূর্য ঢাকা পড়ে গেল।

শিখনায়ক গোকুল সিং পুরাবিয়াদের বিরুদ্ধে তার অনুগামীদের চূড়ান্ত জয়ের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন, আগ্ গে বাদো—আগ্ গে বাদো—এনাঙ্ ফিরঙ্গিয়া দে নাল পল্লা বড্‌কে আসি তলবার্ব া দা ধার বনাজে—

'শুধু আত্মরক্ষার সংগ্রামে কিছু হবে না ; দুবার হয়ে আক্রমণ করতে হবে।' মনে-মনে হিসেব করেন মহম্মদ বখত্ খান।

দর্পিত গর্বিত স্পর্ধিত ব্রিটিশ কামানগুলো নাক উঁচু করে আগুন ছুঁড়ে দিচ্ছে। লক্ষ্ণৌ জ্বলছে! দিলখুশবাগ জ্বলছে! কদমরসুল জ্বলছে! শাহনজফ্ জ্বলছে! নরকের আগুন লক্ষ্ণৌকে চেপে ধরেছে। এই আগুন নেভাতে গেলে আগুনেই ঝাপ দিতে হবে।

যুদ্ধের গতিক দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সেপাইদের ভিৎ নড়ে গেছে।

এ সময় মহম্মদ বখত খান কামানের স্থান বদল করে সুবিধাজনক কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলেন। কেন না আক্রমণটা যাতে আরো জোরদার করা যায়।

সেইটেই বোধহয় কাল হল।

সিপাইদের কামানের ভারি আর নিখুঁত গোলার আক্রমণ এবার তচনচ করে দেবার জন্যে সজাগ হয়ে উঠল কোম্পানীর গোলন্দাজবাহিনী। তাদের কামানের বীভৎস মুখগুলো বজ্র-নির্ঘোষে আগুন উগরে দিতে লাগলো। সে-আগুন যেন ঝলসে দিল সিপাইদের।

হঠাৎ একটা ফেটে যাওয়া কামানের গোলার আঘাতে মারাত্মক আহত হলেন মহম্মদ বখত খান।

অন্যদিকে ফিরুজ শাহ শিখ ল্যান্সার ও গোরা ক্যাভালরির মুখোমুখি লড়ে যাচ্ছেন। হেরে ফেরবার ইচ্ছে নেই ফিরুজ শাহের। তাই তার অনুচরদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। হডসনকে নিশানার মধ্যে পাওয়া দরকার।

এদিকে শিখ ল্যান্সাররা ঝাপিয়ে পড়েছে ফিরুজ শাহের ওপর। এগোতে পারছে না তারা কেন না নিমচের দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা তাকে ঘিরে রয়েছে। তবু ওরি মধ্যে বেপরোয়া একদল ল্যান্সার একেবারে ফিরুজ শাহের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। তারা প্রায় ঘিরে ফেলেছিল ফিরুজ শাহকে। তাদের তীব্র অস্ত্রাঘাত বাতাসে তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ফিরুজ শাহ ঘোড়ার পা-দানিতে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত তরবারির সাহায্যে পথ পরিষ্কার করে নিতে লাগলেন। এই সময় কার হাতের অস্ত্র তার মাথার উপর এসে পড়েছিল। ঘোড়া নিয়ে ছিটকে সরে গেলেন ফিরুজ শাহ। তবু সেই অস্ত্র তার চোখকে স্পর্শ করতে

পেরেছিল। ঝাপসা হয়ে গেল চোখ। হাত দিয়ে চোখ মুছে ফেলতে গিয়ে দেখেন রক্ত। রক্ত মুছে নিতে আবার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

যুদ্ধ তখন মোড় ফিরছে।

এই অবস্থায় রোহিলাখণ্ডের আহত বীর মহম্মদ বখত খান চিরকালের মতো চোখ বুঝলেন।

যুদ্ধের গতিক দেখে বোঝা গেল, আবার এক পরাজয় তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হজরত মহল বেগমের একান্ত অনুগত মম্মু খান আর তার সহযোগী রাম বক্স, বেহুনাথ সিং, চন্দ্র বক্স, গুলাব সিং, নরপত সিং ও মেহেন্দিহাসান প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন যুদ্ধের গতি ফেরাতে—তারা যেন অটল শৌর্যের প্রতিমূর্তি।

ব্রিটিশ কামানের গোলা প্রলয়রাত্রির তীব্র দাহ নিয়ে ছুটে আসতে লাগলো।

কোম্পানী ফৌজ যতোটুকু দখলে নিচ্ছে তার থেকে একইঞ্চিও সরানো যাচ্ছে না।

রক্তক্ষয়ী এই সংগ্রামের পরিসর সেপ্টেম্বর পার হয়ে মার্চের মাঝামাঝিঃচলেগেল।

বিদ্রোহীরা পিছু হঠতে আরম্ভ করলো।

কুনোয়ার সিং তো আগেই আজমগড়ের দিকে পা বাড়িয়েছেন। হজরত মহল বেগমের ফৌজ তাব বিশ্বস্ত অনুচর মম্মু খানের নেতৃত্বে বিঠৌলির দিকে সরে গেল।

অযোধ্যার আপোষহীন সংগ্রামী নায়ক মৌলভী আহমদ আলি শাহ লক্ষ্ণৌ থেকে কুড়ি মাইল দূরে বরিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

সারা অযোধ্যা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন সাহসী নায়কেরা।

দেবী বক্স সিং, বেণী মাধো, লাল মাধো সিং, নিজাম আলি খান, গুলাম হোসেন, আলি খান, মেওয়াতি, প্রদেশের নানা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ শাসনকে তচনচ করে দেবার জন্যে নতুন উৎসাহে মেতে উঠলেন।

এর মধ্যে ফিরুজ শাহ যেন কিঞ্চিত বিভ্রান্ত। তার লক্ষ্য ছিল দিল্লি। কিন্তু দিল্লি পৌছনোর আগেই ভারতের আবহমান কালের রাজধানী হাতছাড়া হয়ে গেল। তারপর বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌ ঘিরে দুর্ভেদ্য এক শক্তির দুর্গ গড়ে তুলেছিল। তাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন ফিরুজ শাহ, কিছুতেই কিছু হল না।

এত হিম্মত, এত কোরবানী সবই মিথ্যে হয়ে গেল!

সান্ত্বনা শুধু, খুনী জহ্লাদ হডসনকে হত্যা করা গেছে। মনের মধ্যে তেমন আর জোর অনুভব করেন না ফিরুজ শাহ। সেপাইদের হালচালের ওপর ভরসাও রাখা যায় না। কী তাজ্জব, লক্ষ্ণৌয়ের যুদ্ধ যখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে—তখন বিশ-বাইশ হাজার সেপাই হাতিয়ার নামিয়ে গাঁয়ের দিকে পাড়ি দিল চাষ-আবাদের কাজে!

প্রান্তরের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে সামনের দিকে তাকিয়ে ফিরুজ শাহের মনে হয়, ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে! তবু চেষ্টা করে যেতে হবে।

দিল্লির পর বিদ্রোহীদের একমাত্র আশ্রয় নানা—ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব। ইতিমধ্যে নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করে বিঠুর প্রাসাদ থেকে এক ফর্মান জারি করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাকে ঘিরে বিদ্রোহীদের আশা-আকাঙ্খা পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

দ্রুতগতিতে কানপুরের দিকে এগোতে লাগলেন ফিরুজ শাহ।

মার্চের একুশ। সন আঠেরো শ' আটান্ন।

লক্ষ্ণৌ শহরের ওপর আবার পতপত করে ইউনিয়ন জ্যাক উঠলো।

শহরের পথে হাইল্যাণ্ডার বাজনদারদের ব্যাগপাইপে সুর বেজে উঠলো: রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভস্।

অবশ্য এই জয়ের উৎসব কোম্পানী পুরোপুরি উদযাপন করতে পারলো না। কেননা ব্রিটিশ শক্তির প্রধান স্তম্ভ স্যার হেনরি হ্যাভেলক অসুস্থ হয়ে জয়ের মুহূর্তে মরণের কোলে ঢলে পড়েছেন।

আর তা' ছাড়া যে-সংবাদ কানপুর থেকে এল তা যেমন ভয়ানক তেমনি নিদারুন!

পেশোয়া নানা সাহেবের অনুচর তাঁতিয়া টোপী বিশাল এক বাহিনী নিয়ে কানপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সেই বাহিনীর অগ্রগামী দল ইতিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে কানপুরের ওপর কামান দাগতে সুরু করেছে।

সুতরাং স্যার কলিন ক্যাম্বেল পলায়নপর শত্রু সৈন্যের পিছু ধাওয়া করবার ইচ্ছেটা আপাতত চেপে রেখে কানপুরের দিকে যাত্রা করলেন।

ইচ্ছে রইল, কানপুর সামলে এসে অযোধ্যা প্রদেশের দুশমনদের জারিজুরি ভেঙে তচনচ করে দেবেন।

লক্ষ্ণৌয়ের পরাজয়ের পর উত্তর ভারত জুড়ে বিদ্রোহীদের ওপর বিপর্যয় নেমে এল। এলাহাবাদ-অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌ-বরেলি-কানপুর ও কালপিতে একের পর এক পরাজয় সেপাইদের স্বপ্ন ও আকাঙ্খা ধুলোয় লুটিয়ে দিল।

এবার বিধ্বস্ত ও পলায়নপর শত্রুদের ছেঁকে তোলবার জন্যে স্যার কলিন ক্যাম্বেল সারা উত্তর ভারত জুড়ে জাল ছড়িয়ে দিয়ে গোটাতে লাগলেন। তার পরিকল্পনা ছিল, ফতেগড় থেকে একদল, আরেকটা সাজাহানপুর থেকে আর অন্য দুটো দল আজমগড়

ওএলাহাবাদ থেকে বিদ্রোহী নায়কদের ঠেলে তাড়িয়ে একেবারে উত্তর সীমানার দিকে নিয়ে যাবে।

এলাহাবাদ থেকে যে বাহিনী উত্তরের দিকে এগোতে লাগলো ক্যাম্বেল নিজে তার অধিনায়কত্ব নিলেন। প্রত্যেকটা দলের সঙ্গে প্রচুর স্কাউট আর গুপ্তচর, যারা এগিয়ে থেকে বিদ্রোহীদের খবর জোগাতে লাগলো। বিদ্রোহের নায়কেরা কে কোথায় ঘাপটি মেরে আছেন, কে কোথায় সরে পড়বার চেষ্টায় আছেন—কেউ জাল ছিঁড়ে ভেতরে ঢোকবার ফিকির করছেন কি না!

সেই ঘের-দেওয়া জালের সামনে পড়লেন, দেবী বকস্ সিং, মুহম্মদ হাসান, মেহেদি হাসান, খান বাহাদুর খান, নানা সাহেব আর তার ভাই বালা সাহেব, হজরত মহল বেগম ও তার ছেলে ব্রিজিস কাদের, এবং জাওলা প্রসাদ। নাম-না জানা আরো কত বীর। কোম্পানীফৌজ এই সব নায়কদের তাদের জন্মভূমি, দেশের মানুষ ও স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেপালের সীমানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো।

ওদিকে নেপাল সীমান্ত জুড়ে পাহারা দিচ্ছে দশ হাজার গোর্খা নিয়ে নেপালী রাজা জং বাহাদুর। এইসব পুরবিয়াদের জন্যে তার বুকে জমে আছে তীব্র প্রতিহিংসার জ্বালা। সন ১৮১৫তে ব্রিটিশরা পুরবিয়াদের সাহায্যে দুর্গম উপত্যকায় হানা দিয়ে তাদের পরাজিত করেছে। তাদের সমস্ত শৌর্য বীর্য ও প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিয়েছে এই পুরবিয়ারা। এতদিন বাদে সুযোগ পেয়ে গোর্খারা ইংরেজদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিছনে ইংরাজ—সামনে গুর্খা। মাঝখানে রয়েছে তরাইয়ের নিবিড় জঙ্গল। হয় ধরা দাও না হয় জঙ্গলে রুখে-ভুখে মর। হলও তাই। ইংরাজের জাল ছিঁড়ে যারা পালাতে পারলো না তারা নেপালের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে তখনকার মতো প্রাণে বাঁচলো।

একমাত্র ফিরুজ শাহ ইংরাজের জাল ছিঁড়ে আবার ভারতবর্ষের বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন তারপর এটোয়ার কাছে গঙ্গা পার হয়ে গা ঢাকা দিলেন।

ব্রিগেডিয়ার বার্কার আর ট্রুপ ফিরুজ শাহের পালানোর পথ ধরে ব্লাড হাউণ্ডের মতো তার গন্ধ শুঁকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু বেপাত্তা-হদিশের পাত্তা করতে পারলেন না।

ফিরুজ শাহ শত্রু-ছড়ানো দেশের ভিতর দিয়ে দ্রুত পায় তার দুই অভিন্নহৃদয় সহযোগী রাও সাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর সঙ্গে মেলবার জন্যে এগোতে লাগলেন।

১৮৫৯ সাল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বৎসর। সারা দেশ কোম্পানীর আয়ত্তে চলে গেছে। কোম্পানীর গুপ্তচর বিদ্রোহীদের খোঁজ-খবরের জন্যে গ্রাম-গঞ্জ নগরে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে-ফেরা সেপাইদের টেনে বের করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তাঁতিয়া টোপীর কাছে খবর পৌছল, শাহজাদা ফিরূজ শাহ ফিরে আসছেন।

তাঁতিয়া তখন নতুন বন্ধু নারওয়ার রাজপুত সামন্ত মানসিংহের সঙ্গে এক জঙ্গলের নিভৃতে আত্মগোপন করেছিলেন। সাংঘাতিক একটা হতাশা তাকে পেয়ে বসেছে। যে-উদ্দীপনা নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে নেমে পড়েছিলেন তার এতটুকুও বুঝি মনে আর অনুভব করেন না। নানা সাহেব, বান্দার নবাব বাহাদুর, লক্ষ্মীবাঈ, ফৈজাবাদের মৌলভী সাহেব, বরেলির খান বাহাদুর খান তারা সব কোথায়! এই কয়েকমাস আগেও তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কোম্পানীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছেন। সেইসব সঙ্গী-সুহৃদদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্লিপ্তির শয্যা পেতে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে আছেন।

এমন সময় খবর এলো, দুশমনের জাল ছিঁড়ে ফিরূজ শাহ বেরিয়ে এসেছেন। আর তিনি আসছেন তাঁতিয়া টোপী আর রাও সাহেবের সঙ্গে মিলতে। নতুন করে দুরন্ত এক সংগ্রামের সঙ্গী করে নিতে।

তাঁতিয়া টোপীর বুকের মধ্যে অপরাজেয় আশা মাথা তুলে দাঁড়ালো। আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে।

তর সয় না তাঁতিয়ার। দলবল নিয়ে তখনই ঘোড়ায় চড়ে ফিরূজ শাহের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে জোর কদমে ইন্দরগড়ের দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে ফিরূজ-শাহের অবস্থা খুব শোচনীয়। তার সৈন্য সংখ্যা বেশ কমে গেছে। উৎসাহের সঙ্গে যারা এগিয়ে এসেছিল তাদের অনেকেই স্বাধীনতার সংগ্রামের দুঃসহ দুঃখ সহ্য করতে না-পেরে সরে পড়েছে—একের পর এক যুদ্ধে অনেকেই খতম হয়েছে। শেষ-মেষ নেপিয়ারের হাতের প্রচণ্ড মার তার বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

শাহজাদা গঙ্গা পেরিয়ে যখন কুচ্ আর কালপির দিকে এগোচ্ছিলেন নেপিয়ার ঠিক করলেন, যে করেই হোক ফিরূজ শাহকে আটকাতে হবে। তাই একদল সেনা নিয়ে নেপিয়ার নেকড়ের মতো গন্ধ শুঁকে ঝটিতি এগিয়ে এলেন নিঃশব্দে।

ফিরূজ শাহ নেপিয়ারের ইচ্ছেটা একেবারেই জানতে পারেন নি। তিনি চলেছিলেন বন্ধুদের সন্ধানে। সুযোগ পেলে পথের মাঝখানে দিন-কয়েক একটু জিড়িয়ে সৈন্যদের চাঙ্গা করে নেবেন। এত ধকল আর চাপ সৈন্যদের সইছিল না। তারাও যেন একটু হাত-পা ছড়িয়ে জিড়িয়ে নিতে চাইছিল।

য়নাড়ের কাছাকাছি দুই দলের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। কোম্পানী ফৌজ তৈরি হয়েই ছিল—দেখা হতে ঝাপিয়ে পড়লো।

আচমকা এই আক্রমণের সামনে পড়ে ফিরুজ শাহ দেখলেন, গতিক সুবিধের নয়। তবু বাঁচতে গেলে লড়াই না-করে সরে পড়া যাবে না। যুদ্ধ করবার মতো অবস্থা তখন ফিরুজ শাহের বাহিনীর ছিল না। দুর্মদ এক শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত তারা। অবশেষে শক্তির সমস্তটুকু নিঃশেষ করে তরবারি শূন্যে তুলে ধরলো। আর বিদ্যুৎ হয়ে চমকে উঠলো।

নেপিয়ার দুঁদে সেনাপতি—তাই ইচ্ছে ছিল, ফিরুজ শাহের পুরো দলটাকেই ঘেরাও করে ফেলবেন।

ভাগ্যিস ফিরুজ শাহের ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরী হয় নি তাই বেশ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও মাঝপথে যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে অরনিব জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। মুষলধারে বিষ্টি নেমেছে। ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত যোদ্ধারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো। আলো জ্বালবার উপায় নেই। আলোর সংকেত হয়তো শত্রুকে ঠিকানার হদিশ দেবে। সারারাত বিষ্টিতে ভিজে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ফিরুজ শাহ।

ইচ্ছে ছিল, কয়েকদিন জঙ্গলে কাটিয়ে দলটাকে গুছিয়ে-টুছিয়ে নেবেন ফিরুজ শাহ।

গুপ্তচর এসে খবর দিল গুর্ণার দিক থেকে ক্যাপ্টেন রাইস্ আসছেন।

ফিরুজ শাহ তড়িঘড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ইন্দরগড়ের দিকে যাত্রা করলেন।

দেখা হল দুজনে। ফিরুজ শাহের সঙ্গে তাঁতিয়া টোপীর। ফিরুজ শাহের চোখ জলে ভরে উঠলো। ঘোড়া থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁতিয়া এসে জড়িয়ে ধরলেন। অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, মীর্জা সাহিব আপনি ভালো আছেন তো? ক্লান্ত নায়কের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো। দুদলের সৈন্যরা পরস্পরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে খুশ-মেজাজে গল্পে-আলাপে মেতে উঠলো।

ইন্দরগড়ে বুঝি পরবের আবহাওয়া এলো।

ফিরুজ শাহ তাঁতিয়া টোপী দুজনেরই ইচ্ছে ছিল, তাঁবু ফেলে কিছুদিন ইন্দরগড়ে থেকে যাবেন আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের কাজকর্মের একটা পথও ঠিক করে নেওয়া যাবে। তাছাড়া চেষ্টা করে দেখতে হবে, কিছু লোকও যদি দলে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। লোক বাড়ানোর বড্ড দরকার। দুজনের সৈন্য সংখ্যা সব মিলিয়ে দু হাজারের বেশি কিছুতেই নয়। কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এতো সামান্য সৈন্য দিয়ে কী হবে!

নাঃ, ইন্দরগড়ে শান্তিতেও দুটো দিন কাটানো গেল না। বাতাসে খবর এলো ব্রিগেডিয়ার হোনার ইন্দরগড়ের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইন্দরগড় পৌঁছে যাবেন।

সুতরাং ভাববার অবসর পাওয়া গেল না। ফিরূজ শাহ আর তাঁতিয়া দেরী না-করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর লটবহর লোক-লস্কর সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে ইন্দরগড় ছেড়ে সরে পড়লেন। ব্রিগেডিয়ার হোনার সব পথ আটকে ইন্দরগড়ে ঢুকে দেখেন, ভো-ভা! শূন্য খাঁচা। পাখি দুটো কখন যেন উড়ে গেছে!

ব্রিগেডিয়ার হোনার পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে পালিয়ে যাওয়ার পথের দিকে ক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে আফশোষ করতে থাকেন।

সে-দিনটা ১৮৫৯ সালের ১৪ জানুয়ারী। ঝকঝকে শীতের দিন। রাজস্থানের শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে সেবার। হিমেল বাতাস ছুঁচের মতো বিঁধছে।

সিপাই বিদ্রোহের দুই নেতা তাদের দলবল নিয়ে চলেছেন জয়পুর আর ভারতপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গা দিয়ে। ঘোড়া চলেছে দুলকি চালে। সৈন্যরা গল্প-গুজবে আলাপে-সংলাপে হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত। তাঁতিয়া আর ফিরূজ শাহ তাদের ব্যর্থতার একটা সালতামামি হিসেব-নিকেশে ডুবে ছিলেন। পুরো বাহিনীটাই শরিফ মেজাজে অন্যমনস্ক বাহীর মতো পথ চলেছিল। অবশ্য কাছাকাছি কোন শত্রুর পাত্তা ছিল না।

দেওসার কাছাকাছি হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। ঝাকে-ঝাকে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে দিতে লাগলো কোম্পানী ফৌজ শত্রুর ওপর।

পোড়-খাওয়া দুই নায়ক বোধহয় মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিতে সময় লাগে নি তাদের। একদল সেনা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন দুই নায়ক। তারপর ঝড়ের বেগে ঝাপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে ব্রিগেডিয়ারের চোখে ধুলো দিয়ে পিছনে সরে গেলেন।

সাওয়ার্স বিদ্রোহীদের তোড়-জোড় আর আক্রমণের গতিক দেখে ভেবেছিলেন জোর লড়াই দেবে বিদ্রোহীরা। তা না করে তাদের সমুখভাগ লড়াইয়ের মহড়া দিতে-দিতে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরে গেল। পেছনের অংশ অনেক আগেই সরে গেছিল।

খর পায় এগিয়ে চললো বিদ্রোহীদের দলটা। জয়পুরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে শিকারপুর জায়গাটা তাদের খুব পছন্দ হল। শিকারপুর মেবারের এক সামন্তরাজার রাজধানী। পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট শহর জায়গাটা তাঁতিয়ারও পছন্দ হওয়াতে তাঁবু ফেলা হল। শিকারপুর থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মধ্যে কোন কোম্পানী-ফৌজ

নেই। সুতরাং হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়া যাবে। তা ছাড়া আঠারো শ' সাতান্নর স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেক নায়ক রাও সাহেবও শিকারপুরে এসে মিলিত হলেন। সুতরাং নিঃসঙ্গ তিন নায়কের জল্পনা-কল্পনার আসর এখানে শান্তিতে বসতে পারবে। তা ছাড়া দু চার দিনের মহার্ঘ বিশ্রাম ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত অনুচরদের ভাগ্যে জোটা দরকার। গত দুই বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তাদের স্নায়ুর ওপর যে চাপ পড়েছে এই সুযোগে তার ভার যদি একটু কমানো যায়।

এদিকে গুপ্তচর খবর দিতে ছুটলো, কোম্পানীর তিন কট্টর দুষমন শিকারসহরে তাঁবু ফেলেছে।

সবচেয়ে কাছের সহর নাসিরাবাদ। তাও পঞ্চাশ মাইলের কম নয়। সেখানে ঘাঁটি আগলাচ্ছেন কর্ণেল হোমস্। তার কাছেই প্রথম খবর পৌঁছল। তার ইচ্ছে ছিল, ভালো করে সৈন্য সাজিয়ে যাত্রা করেন।

গুপ্তচর তাড়া দিল, দেরি করবেন না হুজুর। দেরি করলে [illegible]তো গিয়ে দেখবেন চিঁড়িয়া পিঁজরা থেকে হাওয়া— !

কর্ণেল সাহেবও হিসেব করে দেখলেন, দেরি করা ঠিক হবে না। সুতরাং দ্রুতগামী একদল সোয়ার ও গোলন্দাজ নিয়ে শিকারসহরের দিকে যাত্রা করলেন। পাহাড়ি বন্ধুর পথ নদী-নালা পেরিয়ে চব্বিশ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল পথ পেরিয়ে কর্ণেল হোমসের বাহিনী বিদ্রোহীদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো।

একেবারে আচমকা আঘাত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হাতে অস্ত্র তোলার সুযোগ টুকুও পেল না। অস্ত্রহীন শত্রুর প্রতি নির্বিচার ও বর্বর আক্রমণের খেলায় মেতে উঠলো কোম্পানীর ফৌজ। মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইলো চারদিকে। এই দুর্ধর্ষ আক্রমণকে ফাঁকি দিয়ে যারা পালাতে পারলো তাদের হাতের আঙুল অস্ত্রের কাছে পৌঁছতে পারলো না। শুধু হাতেই পালাতে হল অনেককে।

তবু এরি মধ্যে তিন নায়ক বিশৃঙ্খল আর বিপর্যস্ত বাহিনীকে নিয়ে কোন রকমে শিকারসহর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন।

কর্ণেল হোমস্ তার পুরো ফৌজকে লাগিয়ে দিলেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লাশ হাতড়ে তিন বিদ্রোহী নায়কের মৃতদেহ খুঁজে বের করবার কাজে। অনেক সময় নষ্ট করেও তারা ব্যর্থ হল !

শিকারের বিপর্যয়ের পর তিন নায়ক স্থির করলেন, লড়াই করবার ক্ষমতা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন একসঙ্গে না-থেকে ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলাদা থাকাই ভালো। তাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনাও কম। আর এই ভাবে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে নিভৃত

কোন পাহাড়ি এলাকায় অথবা কোন জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করাই ভালো।

শিকারের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর তাঁতিয়া টোপী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। সারাক্ষণ কি ভাবেন কেউ জানে না। প্রথম দিকে আত্মগোপন করে থাকার ব্যাপারে মত দিলে ও তাঁতিয়া টোপীর চাল-চলন কেমন যেন মনে হল। সারা দিন পাহাড়ের দিকে মুখ করে একলা বসে রইলেন।

সন্ধের দিকে উঠে তাঁতিয়া রাও সাহেব আর ফিরুজ শাহকে জানালেন, তিনি তার সৈন্যদল ভেঙে দিচ্ছেন।

তারপর ? জিজ্ঞাসা করলেন ফিরুজ শাহ।

তারপর আর জানিনে। অনেকটা স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলেন তাঁতিয়া টোপী।

এতক্ষণ কথা বলেন নি রাও সাহেব। এবার বিহ্বল হয়ে বললেন, সব কি শেষ হয়ে গেল ?

বোধহয়। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁতিয়া টোপা উত্তর দিলেন॥

তাহলে! ফিরুজ শাহের হলকুম্ আটকে যায়, আপনাকে এ সিদ্ধান্ত পালটাতে হবে টোপীজী—এই অবস্থায় আপনি যদি চলে যান—

চেষ্টা তো অনেক করলাম। তাঁতিয়ার মিশমিশে কালো মুখে বেদনার সবটুকু ধরা না-পড়লেও নৈরাশ্য অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সবাই বুঝতে পারছিল তাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। পিণ্ডারী কোম্পানীরাজ অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে। এরপর জোয়ারের সমুদ্র যেমন করে সংলগ্ন ভূমিকে গ্রাস করে ফেলে তেমনি করে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।

তাঁতিয়া টোপী নিজের বাহিনী ভেঙে দিয়ে একজন মাত্র সঙ্গী, তিনটে ঘোড়া আর একটা টাট্টু নিয়ে নারোয়ার রাজপুত সামন্ত মানসিংহের নিভৃত নিবাস পেরনের জঙ্গলে আত্মগোপন করতে যাত্রা করলেন।

রাও সাহেব আর ফিরুজ শাহ বিমূঢ় বেদনায় এতদিনকার সুহৃদকে বারবার অনুরোধ করেও যখন আটকাতে পারলেন না তখন চোখের জলে বিদায় জানালেন।

বিষণ্ণ ও বেদনার্ত দুই রাজপুত্র তাতিয়াকে চতুর্ভুজ গিরিপথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে—গিরিপথের ওপারে সিরোঞ্জের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। জনপথ বসতির চেয়ে

অরণ্য এখন তাদের পক্ষে নিরাপদ নিকেতন। কিন্তু সেখানেও তাদের শান্তি ছিল না।

কোম্পানীর মাইনে-করা দেশি গুপ্তচরের দল সারন অঞ্চলে ছড়ানো ছিল তারাই কোতোয়ালীতে খবর পৌছে দিল, দুই আসামী তাদের দলবল নিয়ে সিরোঙের জঙ্গলে ডেরা নিয়েছে। সেখান থেকে এই খবর আবার সেনা ছাউনির দপ্তরে গিয়ে পৌছলো।

একটা নয় কাছাকাছি যে ক'টা ছাউনি ছিল সব কটার দপ্তরে এ-খবর পৌছে দেওয়া হল।

ছাউনি থেকে হাতিয়ার-বন্দ ফৌজ নিয়ে দক্ষ সেনাপতিরা কাছাকাছি জঙ্গলের সীমানা ঘিরে দাঁড়ালেন।

যারা এই সব সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন তাদের দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ করবার কারণ নেই। তবে প্রত্যেকেই চাইছিলেন, ধুরন্ধর দুই বিদ্রোহী নায়ককে পাকড়াও করে সম্মানের পালখটা নিজের টুপিতে গুঁজে দেবেন। কাজেই সকলে চাইছিলেন কাজটা চুপিসাড়ে সারতে।

প্রথমে কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হল। তার পেছনে রাইফেলের মুখ উঁচিয়ে কোম্পানীর সাদা-কালো হিংস্র খোজারুর দল।

চারদিক থেকে অন্তত চারটে বাহিনী উকুন-বাছা চিরুনির মতো সিরোঙের জঙ্গলটাকে আঁচড়ে-পিঁচড়ে, খানা-খন্দ অলি-গলি তন্নতন্ন করেও বে-পাত্তা বিদ্রোহীদের পাত্তা করতে পারলো না। শেষে তারা যখন ব্যর্থ হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল, তখনই হঠাৎ বিদ্রোহীদের তাঁবুর সামনে গিয়ে হাজির হল।

শীতের বাতাসে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকা ছেঁড়া-খোঁড়া তাঁবুগুলো তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। আস্তানা ফাঁকা করে বিদ্রোহীরা বুঝি বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

সৈন্যদের বেওনেটগুলো মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচাকা খেয়ে থেমে গেছিল পর মুহূর্তে শ্বাপদের চেয়েও হিংস্র জিঘাংসা নিয়ে সেই ফাঁকা তাঁবুগুলোর পর ঝাপিয়ে পড়লো।

বিমূঢ় সেনাপতিরা মাথার টুপি খুলে শূন্য দৃষ্টিতে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পুরো দলটাই কী জাদু জানে!

ফিরুজ শাহ আর রাও সাহেব কি করে যে এই সব জাঁদরেল ইংরেজ সেনাপতিদের-চোখে ধুলো ছড়িয়ে হাওয়ার মতোউবে গেলেন তা চিরকালই রহস্য হয়ে থাকবে।

বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে একের পর এক ভাগ্য বিপর্যয়ের পরও বিদ্রোহী নায়করা এতটুকু দমেন নি। নতুন করে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।[১]

তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী তূর্য নিনাদ গ্রাম-গঞ্জ নগর-বন্দর পাহাড়-উপত্যকা গিরিপথ কাঁপিয়ে ধ্বনিত হয়েছে। তাদের পদাতিক-সোয়ারের পায়ের ভারে মাটি কেঁপে উঠেছে, যুদ্ধাশ্বের উচ্চকিত হ্রেষাধ্বনি শত্রুর বুক দিয়েছে কাঁপিয়ে, যোদ্ধাদের দুর্মদ তরবারি রোদ্দুরে ঝিলিক দিয়ে উঠে শত্রুকে কবন্ধ করেছে শিকারের বিপর্যয়ের পর তারা যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। বিশেষ করে তাঁতিয়া টোপীর নি.শব্দ ও নিঃসঙ্গ অন্তর্ধানের পর তাদের যেন কিছু আর করবার ছিল না। তারা অনুভব করছিলেন, নির্মম নিষ্ঠুর এক নিষাদের অদৃশ্য জাল তাদের ক্রমশ ঘিরে ফেলছে। বুকের স্পন্দন তাই ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠছিল।

একটু খানি আশার আলো অবশ্য চোখের সামনে দপদপ করছিল। মহারানীর সার্বজনীন মার্জনা।

১৮৫৮র নভেম্বরে মহারানী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষনা পত্রে জানালেন, যারা ইংরাজ নিরস্ত্র নারী-পুরুষ শিশু হত্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন না তাদের মার্জনা করা হবে।

অনেকেই আত্মসমর্পন করে সার্বজনীন মার্জনার সুযোগ নিলেন। বান্দার নবাবসাহেবও এই সুযোগ নিয়ে আত্মসমর্পন করলেন। তার জন্তে চারশ' টাকা মাসোয়ারা বরাদ্দ হল।

নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় দুই রাজপুত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

১৮৫৯-এর ১৯ ফেব্রুয়ারী নিমচের কাছাকাছি দুজন রাহীকে বন্দী করা হল। তারা নাকি বিদ্রোহী শিবিরের লোক। তাদের কাছে দুটো চিঠি পাওয়া গেল। একটা চিঠির ভাষা ছিল ইংবেজি ; লিখছেন, মীর্জা মোহাম্মদ ফিরুজ শাহ বাহাদুরের বিশ্বস্ত ভৃত্য মৌলভী মোহম্মদ উজীর খান।

আগ্রার সাব এ্যাসিসট্যান্ট সার্জেন কাদের ওয়াজির খানকে সম্বোধন করে লেখা। তারিখ : ৩ জিলকাব, ১২৭৫ (৪ জুন ১৮৫৯)।

দারুন দুরবস্থায় পড়েও সেই গর্বিত রাজপুত্র ভুলতে পারছিলেন না যে তিনি দুঃসাহসী বীর নায়ক তৈমুর-বাবুরের বংশধর। মহান মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার বংশধরের পক্ষে সামান্য কোন কাদের ওয়াজির খানকে চিঠি লেখা অপমানজনক তাই ভারত সম্রাটের ওয়ারিশানের পক্ষ থেকে তাকে পরোয়ানা পাঠালেন। তার পরোয়ানার বয়ান ছিল : সারা জাহান ও ইনসানের শাহানশাহ এবং পবিত্র পয়গম্বরের পুত্র ও অনুগামী মীর্জা মহম্মদ ফিরুজ শাহ বাহাদুর তার বিশ্বস্ত ভৃত্য মোহাম্মদ উজীর খানকে জানিয়ে দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন যে কাদের ওয়াজির খানের দরখাস্ত তার হস্তগত হয়েছে।

এখানে তিনি কতকগুলো সর্ত দিচ্ছেন যদি সেইগুলো মেনে চলবার আশ্বাস দেওয়া হয় তবে ফিরিঙ্গী সরকারের সর্তে তার আপত্তি নেই।

১ তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে ?

২. জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ইচ্ছে মতো, কুল্-মুলুকের যে কোন অঞ্চলে যেতে পারবেন।

৩ তার ওপর কোন রকম উৎপীড়ন করা হবে না।

৪ দশ-পনেরো জন সশস্ত্র অনুচর থাকবে। তাদের নিরস্ত্র করা হবে না বা অস্ত্র ত্যাগ করতে বলা হবে না।

উপযুক্ত সর্ত সম্বন্ধে উত্তর এলে তাকে যেন জানানো হয়। এর আগে তিনি তার একজন অনুচরকে খোঁজ খবর নিতে ইন্দোর পাঠিয়েছেন এই মুহূর্ত পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোন খবর এসে পৌছয় নি।

ফিরুজ শাহের চিঠিব বয়ান দেখে মধ্য ভারতের সরকারী প্রতিভূ স্যার বিচার্ড সেক্স্পীয়র খেপে গেলেন। হয়তো একটু বিনীত ধবণের আবেদন করলে বিচার্ড সাহেব ওপরওয়ালার কাছে তার জন্মে তদবির করতেন। কিন্তু যে লোকটার নিজের রুটিটুকু পর্যন্ত জোগাড় করবাব মুরোদ নেই চিঠিতে তার মেজাজের বহর দেখে তার বিরুদ্ধ অভিমত লিখে পাঠালেন।

যাই হোক, ব্রিটিশ সরকার এই দুঃসাহসী রাজপুত্রের যততন্ত্র স্বাধীন বিহারের সর্তে রাজি হলেন না।

রাজপুত্রও 'নিজ বাস ভূমে পরবাসী' হয়ে থাকতে রাজি হলেন না। এই ভারতবর্ষ তার পিতৃভূমি। এখানে ইংরাজ শাসনের দর্পিত অনুশাসন মেনে নিতে তার মন রাজি হ'ল না। না, কিছুতেই নয়।

ইংরাজ সরকারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুলেছেন। রাও সাহেবের ভাগ্যের ইতিহাসে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এবার ভাবতে হল ফিরুজ শাহকে। শত্রুর দেশে হাত বাড়ালে বন্ধু কোথায়! তাঁতিয়া টোপী নেই। রাও সাহেব নেই। ঝাসি নেই। কালপি নেই। নিমচ্-মান্দিসোর নেই। ঠাঁই নেই। বন্ধু নেই। কিছু নেই। কেউ নেই। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়বার ভয়। তার মনে হল, এবার বোধহয় স্বদেশের বাইরে পা বাড়াতে হবে। বুকের সেই অদম্য সাহসে এখন বুঝি ভাঁটা এসেছে। তবু এবার ভেসে পড়তে হবে। বন্দরের কাল হল শেষ!

যাযাবর যৌবনের স্পৃহা একবার তাকে ঘরের বাইরে কোন দূর দেশে টেনে

নিয়ে গেছিল। সেই-যৌবন শরীরে এখনো উজ্জল। বয়েস এখনো তিরিশ পার হয় নি। জীবনের অপূর্ণ স্বপ্ন এখনো মায়া-মৃগের মতো ছলনা করে যায়। সাধ আর সাধ্যে তবু বনিবনা হয় না।

এত দিনকার সুখ-দুঃখের সঙ্গী অনুচরদের এক-এক করে চোখের জলে বিদায় দিলেন রাজপুত্র। তারপর অভিভূত বেদনায় কোথায় যেন চলে গেলেন। দু' চারজন একান্ত অনুগত মানুষজনের কেউ সঙ্গে রইল। নিজের জন্মভূমিকে ভালো-বাসার অপরাধে তাকে অনিকেত হয়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে হল।

আজ আর সঙ্গে কেউ নেই। সঙ্গে শুধু জীবন-সঙ্গিনী। দিনের বেলায় বন-পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে, লোকালয় এড়িয়ে, লোক-লোচন এড়িয়ে এগিয়ে চলেন।

রাজপুত্র যোদ্ধার বেশ খুলে ফেলেছেন। আজ আর তাজীর সোয়ার নন। হাতে শমসের নেই। মাথার আমামা খুলে পাগড়ি পরে নিয়েছেন। পরণে দরবেশের ঢিলে-ঢালা আলখাল্লা। সাধারণ রাহীর মতো পথ চলেছেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় চলেছি। কখনো বলেন, ফতেপুর সিক্রি যাচ্ছি সেলিম চিস্তির দরগায়। তারপর বোরখায় অসূর্যম্পশ্যা স্ত্রীর দিকে মৃদু হেসে তাকান।

অপুত্রক কত জনই তো পুত্র কামনায় দরগায় সুতো বাঁধতে যায়!

দীর্ঘ দিন দীর্ঘ পথ হেঁটে সিন্ধুর ভিতর দিযে কান্দাহারে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ফিরুজ শাহ। ইংরাজ সন্ত্রাসের বাইরে এসে যেন মুক্তির স্বাদ পেলেন। যে-অশুভ ছায়া অশরীরী হয়ে এসে তাকে অহরহ ভয় দিচ্ছিল তার হাত থেকে মুক্তি পেলেন।

ফিরুজ শাহ সম্পর্কে ইংরাজ গুপ্তচর বিভাগের সদা সতর্ক নজর ছিল। ফিরুজ শাহের এই আনাগোনা তাদের অজানা ছিল না! যেখানেই তিনি যান না, গুপ্তচরেরা অনবরত তার সম্পর্কে খবর পাঠিয়ে যাচ্ছিল সামরিক দপ্তরে। সুতরাং ফিরুজ শাহ যে দেশের বাইরে পা দিয়েছেন। এখবরও যথাসময়ে তাদের কাছে পৌছেছিল।

কান্দাহারে পৌছেও কি তিনি শান্তি পেয়েছিলেন! না, দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ তার মনে ঘোর অশান্তি ঘনিয়ে তুলেছিল এক

মুহূর্তের জন্যেও হিন্দুস্থানকে ভুলতে পারেন নি। ভুলতে পারেন নি, দেশকে দেশের মানুষকে এক বর্বর অত্যাচারীর পায়ের তলায় ফেলে রেখে আসতে হয়েছে।

১৮৬১ সালে কান্দাহার থেকে দীর্ঘ পথের দুর্গমতা পেরিয়ে বুখারায় গিয়ে পৌছলেন। তখন অত্যন্ত দুঃস্থ তার অবস্থা। শীতের দেশের উপযুক্ত পোষাক তার ছিল না। দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা পাহাড়ি নেকড়ের মতো তাকে অনুসরণ করে চলেছে। স্থানীয় আমীর-ওমরাদের বদান্যতায় কায়ক্লেশে তার দিন কাটে। ভারত-বিখ্যাত বাবুর-আকবরের রক্তের ধারা তার ধমনীতে বইছে সে কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছেন না ফলে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও আত্মসম্মান ঋজু স্পর্ধায় মাথা উঁচু করে রেখেছে।

ভারতবর্ষ থেকে সুদূর বোখারা তার ভালো লাগলো না। আবার ফিরলেন পারস্যের তেহেরানে। সেখানে থেকে যেন ভারবর্ষের স্বাদ পান। সেইটুকুই ছিল শান্তি। অথচ মাথার মধ্যে দুর্নিবার আগুন জলছে, অত্যাচারী ইংরেজকে শাস্তি দিতে হবে। অর্থ চাই। লোক চাই। সহায়তা চাই। কি করে তা জোগাড় করা যাবে সেই ভাবনায় জলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগলেন।

তেহেরানে ফিরূজ শাহের উপস্থিতি ইংরাজের ভালো লাগলো না। তেহেরান থেকে ইংরাজ রাজদূত দিল্লিতে খবর পাঠালেন। দিল্লি তেহেরানের ইংরাজ মিশনকে এ ব্যাপারে পারস্যের শাহের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। খোঁজ খবর করে বোঝা গেল এ ব্যাপারে খুব সুবিধে হবে না। ইংরাজের অনুরোধে পারস্যের শাহ ফিরূজ শাহকে তার রাজ্যের সীমানা থেকে বের করে দিতে হয়তো রাজি হবেন না। সুতরাং ইংবাজ দূতাবাস এ ব্যাপার দিয়ে কোন নাড়া-চাড়া দিল না। চুপ করে ফিরূজ শাহের হালচাল আর আনাগোনার দিকে কড়া নজর রেখে বসে রইলো।

এ পরের কয়েক বছর ফিরূজ শাহ বুখারা ও হিরাটের মধ্যে বারবার যাতায়াত করতে লাগলেন। খুঁজে-পেতে বের করতে লাগলেন ইংরাজ বিরোধীদের—তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্ধর্ষ একটা বাহিনী গড়ে তুলতে চাইলেন। সুবিধে হল না।

১৮৬৮ সালে আফগানিস্থানের পশ্চিম প্রান্তের শহর হিরাট থেকে পুরো দেশটা পার হয়ে শত্রু ভাবাপন্ন জন্মভূমির কাছে সোয়াট উপত্যকায় এসে দাঁড়ালেন ফিরূজ শাহ। অপলক হয়ে তাকালেন হিন্দুস্থানের দিকে। চোখের পাতায় শিশিরের কৌটার মতো স্বপ্ন ঝলমল করে: হিন্দুস্তাঁ হঁমারা—গুঁলিস্তা হমারা!

পার হয়ে যাবার কতো সাধ! সাধ্য নেই।

স্বদেশ থেকে চিরতরে নির্বাসিত রাজপুত্রের দেশের মাটির দিকে তাকিয়ে দুচোখ সজল হয়ে ওঠে। আশৈশব স্মৃতিবিজড়িত দিল্লি এখন কতো দূর! কতো সুদূর!

দুশমনের দল দিল্লির দখলদারী নিয়ে বসেছে। মনের সমস্ত আক্রোশ বরফের মতো জমতে থাকে। আবার দিল্লি ফিরে যেতে হবে। পিণ্ডারী দুশমনদের ভাগিয়ে দিতে হবে। যারা পরের দেশ লুঠ করে নিজেদের পেট ভরে তারা ডাকাত। তাদের বরাদ্দ আঘাত ফিরূজ শাহ ফিরিয়ে দেবেই।

সোয়াট উপত্যকা থেকে ফিরূজ শাহ আবার কাবুলে ফিরলেন। একটু যদি আনুকূল্যের সম্ভাবনা কোথাও মেলে তবে আবার নতুন উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

কাবুলের আমীর অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন এই অস্বস্তিকর রাজপুত্রকে নিয়ে। কাবুলের ইংরেজরা আমীরের দরবারে দৌড়োদৌড়ি সুরু করে দিলেন। বিশেষ করে আমীরের যারা বন্ধু তারা জানালেন, কাবুলে ফিরূজ শাহের স্থিতি ইংরাজ সরকার বিশেষ ভালো চোখে দেখছে না। দরকার হলে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সেনাও পাঠাতে পারে। সুতরাং ঝামেলা এড়াতে ফিরূজ শাহকে কাবুল থেকে সরে যেতে বলাই ভালো।

আমীরও ভালো করেই জানতেন, ইংরেজরা কি জাতের শত্রু! একবার দাঁত বসালে নিজের ইচ্ছেতেও কামড় আলগা করতে পারে না।

সুতরাং ফিরূজ শাহকে তলপি গুটিয়ে বাদকশান চলে যেতে হল। তারপর সেখানে বেশি দিন না-থেকে আবার সমরখন্দে ফিরে গেলেন।

ভিখারি রাজপুত্র তখন এক দরবার থেকে আরেক দরবারে সাহায্যের প্রত্যাশায় ফিরছিলেন। যদি কেউ সামান্য সাহায্য দিয়ে তার মহৎ উপকার করেন। তাহলে আরেকবার দুঃসাহসী এক অভিযানের নায়ক হয়ে হিন্দুস্থানের বুকের উপর ঝড় তুলতে পারেন।

না, আফগানিস্থান, পারস্য বা মধ্য এশিয়ার বুখারা সমরখন্দ কারো হাত এই হতভাগ্য রাজপুত্রের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো না।

সহানুভূতি হয়তো অনেকেরই এই পরবাসী রাজপুত্রের জন্য ছিল কিন্তু এমন কেউ ছিল না যার কোমরে গোঁজা খাপের তরবারি সূর্যালোকে বুক চিতিয়ে ওঠে। আর একবার অন্তত হতভাগ্য এই রাজপুত্রের অদম্য অভিলাষ রক্ত দিয়ে ইতিহাসে নিজের কথা লিখে যায়!

১৮৭২ সালে মহারাণীর তুরস্কের রাজদূত খবর পাঠালেন দিল্লিতে, ফিরূজ শাহ কন্‌স্টানটিনোপ্যালে এসে হাজির হয়েছেন।

কন্স্টানটিনোপ্যালে তখন ইংরাজ বিরোধী একদল ভারতীয় মুসলমান বসবাস করছিলেন। ফিরুজ শাহ্ গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালেন। বারবার তাদের কাছে আবেদন করলেন, আসুন আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। আমার একলার চেষ্টায় তো কিছু হবার নয়। সকলের চেষ্টা মিলে-মিশে যদি দুর্বার একটা শক্তি হয়ে ওঠে তা হলে হয়তো এই জালিমশাহীর ভিত্ নড়বড়ে করে দিতে পারি।

কনস্ট্যানটিনোপলের ভারতীয়রা ছিলেন কথার লোক। কাজের লোক নয়। তাদের অনেকেই সেখানে বসতি করেছেন। ভারতবর্ষে আর ফেরবার ইচ্ছেও তাদের ছিল না। তারা আর নতুন করে হাঙ্গামায় জড়াতে চাইলেন না।

ইতিমধ্যে অনশন আর অনটন ফিরুজ শাহের শরীর বারবার হিংস্র নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে। শরীরটা গেছে ভেঙে। পাক ধরেছে চুলে। কবে কোন লড়াইতে তরবারির খোঁচা লেগেছিল চোখে, চোখের দৃষ্টি তাই ঘোলাটে। একবার তাড়াতাড়ি শত্রুর হাত এড়াতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছিলেন সেই আঘাতের ফলে তাকে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। অথচ বয়েস তার পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়।

আফগানিস্থান ও বাদকশানের সুদীর্ঘ এলাকায় দীর্ঘ চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে দুর্ধর্ষ এক ইচ্ছের পিঠে সোয়ার হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। চেষ্টা করলেন, ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিকে তার পরিকল্পনায় সামিল করতে। পারলেন না। তার নিষ্পাপ অভিলাষ চিরকালের মতো আকাশকুসুম হয়ে রইলো।

১৮৭৫ সালের জুন মাসে সবদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরুজ শাহ মুসলমানের বাসনার পরমতীর্থ মক্কায় চলে গেলেন। অর্থ নেই। সহায় নেই। নিঃসম্বল রাজপুত্র সেখানে নিরুপায় এক অবসর জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বলতে গেলে মক্কায় প্রধান সেরিফের বদান্যতায় অনৃণী রাজপুত্র ঋণী হয়ে বেঁচে রইলেন।

দীর্ঘ দিনের অনিয়ম আর অবহেলায় শরীর জরাগ্রস্থ ও অসমর্থ। তার চোখের দৃষ্টি তখনো আবিল তবু পিণ্ডারী ইংরাজের কথা মনে হলে তার চোখে আগুনের আঁচড় ধ্বকধ্বক করে ওঠে। হিংস্র শ্বাপদের নীলাভ-হলুদ আলোর সংকেত সেখানে বুঝি ছটপট করে মরে।

ছেঁড়া-খোঁড়া জামার ফাঁকে ঠেলে-ওঠা বুকের পাঁজরায় ঝড়ের বাজ এখনো বাসা বেঁধে আছে—সুযোগ পেলেই মেঘের চূড়োয় উড়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। সংগ্রামী হাত দুটো জমে-থাকা সমস্ত আলস্য ঝেড়ে ফেলে উদ্যত এক বিদ্রোহের কঠিন অঙ্গীকার নিয়ে আকাশে তরবারি ঠেকাতে চায়। ঘুমের মধ্যে ফিরুজ শাহ বাজখাঁই গলায় হেঁকে ওঠেন, হুঁশিয়ার হো—সামনে দুশমন! তার রক্ত জোয়ারের জলের মতো ফুঁসে-ফুঁসে ওঠে!

অর্থ-বিত্ত-সম্পদ-মর্যাদা, সর্বোপরি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে নিঃসঙ্গ এই রাজপুত্র তার আস্তানার সামনে কম্বল বিছিয়ে বসতেন। চোখের সামনে মাথা উঁচু করে আছে মসজিদের মিনার।

আরবের মরুভূমির দিগন্তে সূর্য অস্ত যায়; তার মায়াবী রঙের মায়ায় দিকচক্রবাল জুড়ে রাজকীয় ঐশ্বর্যের সমারোহ। সেই মায়াবী রঙের ছলনা নিমেষের প্রহর পেরিয়ে মিলিয়ে যায়।

কখনো মিনারের মাথার ওপর সন্ধ্যাতারা ওঠে। সেই সন্ধ্যাতারার দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ফিরুজ শাহ্।

এই সাঁঝের তারা কতোদূরে দিল্লি-লক্ষ্ণৌ-কানপুর-ঝাসি মান্দিসোরের ওপরও আলো দিচ্ছে। এমনি করেই আলো দিচ্ছে।

বাইরে অন্ধকার। মনের ভেতরেও অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে স্মৃতিরা নড়ে চড়ে ওঠে।

সেইসব প্রান্তর জনপদ শস্যক্ষেত্র নদী নিভৃত বনাশ্রয় ও জলেস্থলে ছড়ানো স্বদেশ এখনো তার চোখের আলোয় সজীব। এই তো সে-দিন পালতোলা আরব ঢাউয়ে সাগরের রৌদ্রাকোরোজ্জ্বল লবণাক্ত নীল শরীর পেরিয়ে মক্কা থেকে বোম্বাই এসে নেমেছিলেন।

সমুদ্রতীরের জল-কলরবে স্বদেশের মাটির সৌরভ সঙ্গীত হয়ে দেহে-মনে আশ্চর্য এক অনুভূতির শিহরণ এনে দিয়েছিল।

তারপর কানে এসে পৌছলো ভয়ঙ্কর সেই খবর, দিল্লি আগুন হয়ে জ্বলছে!!

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দিল্লি থেকে অনেক দূরে বিপন্ন এক রাজপুত্র সকলের অজ্ঞাতসারে মান্দিসোরে গিয়ে হাজির হলেন। তখনো অসামর্থ তাকে জড়িয়ে, ছায়াটুকু ছাড়া অনুসরণ করবার কেউ নেই। গড়ে তুললেন এক সেনাদল। তারপর যতোবার যুদ্ধ-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন—জয়ী হবার বাসনা আগের চেয়ে দৃঢ় হয়েছে। সংকল্প মনের মধ্যে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হয়েছে।

ইংরাজের শিকারি জিঘাংসাকে বারবার তুবড়ে দিয়েছেন। এইসব যুদ্ধে নারী শিশু ও নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাতের কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

১৮৫৮ সালে এক পরোয়ানা জারি করে ঘোষণা করেছিলেন, নির্দোষ, নারী আর শিশুকে হত্যা নিষিদ্ধ। আমাদের পবিত্র জেহাদ শুধু অত্যাচারীর দুশমনির বিরুদ্ধে। সে-দিন তার বিশ্বাস ছিল পাথরের মতো অনড় অত্যাচারীকে সাগরজলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবোই-পারবো।

আর আজ।

মরুভূমির স্বচ্ছ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফিরুজ শাহের চোখ, চোখের জলে অস্বচ্ছ হয়ে যায়।

মক্কায় কখনো কোন ভারতীয় এসে, স্বেচ্ছানির্বাসিত এই রাজপুত্রের খোঁজ পেলে তার সামনে অবনত হয়ে কুর্নিশ করে নজর রাখে।

তার দিকে অপলক হয়ে চেয়ে থাকেন ফিরুজ শাহ। কতো কথা গলার কাছে ভিড় করে আসে। হিন্দুস্থানের কথা, হিন্দুস্থানের মানুষদের কথা। যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একদিন লড়াই করেছিলেন তাদের কথা, তার প্রিয় দিল্লির কথা। কিছুই কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় না। জমে-থাকা কান্নায় কণ্ঠ বুঝি বোবা হয়ে থাকে।

আগন্তুক বিদায় নেবার পর ফিরুজ শাহ নিজেকে আর সামলাতে পারেন না। পোখরাজ পাথরের মতো জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

বেগম হয়তো নিঃশব্দে পাশে এসে বসেন।

কতোক্ষন বাদে ফিরুজ শাহের হুঁস হয়, তুমি কখন এলে-জানতে পারিনি তো!

সারাক্ষণ তো নিজের ভাবনায় ডুবে থাকো জানবে কি করে?

চুপ করে থেকে রাজপুত্র বলেন, সত্যি তাই। হিন্দুস্থান ছেড়ে এসেছি তার জন্যে আমার ভাবনা করে লাভ নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন ফিরুজ শাহ, আমার ভাবনা তোমাকে নিয়ে। আমার এন্তেকাল হলে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে তোমার কি হবে সেই ভাবনাটাই আজকাল সব চেয়ে পেয়ে বসেছে।

সে ভাবনাটা খোদাতাল্লার ওপর রাখো।

খোদার ওপর রেখে আমার তো শান্তি নেই।

কেন?

জীবনে তো তোমাকে দুঃখ ছাড়া কিছুই দিতে পারি নি। মৃত্যুর পর তোমার জন্যে হয়তো সেই দুঃখই শুধু রেখে যেতে হবে।

বেগমের দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ফিরুজ শাহ ফিসফিস করেন: আগর্ আঁ তুর্কী সিরাজী বদস্ত আরাদ্ দেল্-এ মারা
ব' খালে হিন্দ্ আশ্ বখ্শম্ সমরকন্দ্ বোখারা-রা।

দুজনেই চুপ করে যায়। হয়তো আর বলার কিছুই নেই।

রাত্রির নির্জন বীণাতে দরবারী কানাড়ায় গভীর রাগিণী বেজে চলে। মাথার ওপর তারা-ভরা আকাশ কতো রাত পর্যন্ত উদাসী ফকিরের মতো আন্দোলিত আলখাল্লা গায় সেই গান শোনে। জীবনের সব অনুভূতি সজীব হয়ে অসীম কোন নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা করে।

দিন যায়। রাত আসে। রাত যায়। দিন আসে। অসহায় এক বিড়ম্বনার মধ্যে রাজপুত্রের আয়ুর চেরাগ একটু একটু করে নিভে আসে।

দেশকে ভালোবাসার জন্য দেশ থেকে কতো দূরে আপোষহীন সংগ্রামের নায়ক এই রাজপুত্র সারা দুনিয়ার মুসলমানদের পরমতীর্থ মক্কায় চিরকালের মতো শান্তিতে চোখ বুজলেন। হয়তো ঈশ্বরেরও তাই ইচ্ছে।

পুণ্য করলে মানুষ স্বর্গে যায়। দেশকে ভালোবাসার চেয়ে মহত্তর পুণ্য আর কি হতে পারে! মৃত্যুর পর সেই পুণ্যের জোরেই মীর্জা মহম্মদ ফিরুজ শাহ বেহেস্তে মহাপ্রয়াণ করলেন।

আল্লা তার অসংখ্য প্রয়াত সন্তানের মধ্যে আর্ত ব্যথিত ব্যর্থ ও বিষণ্ণ এই মানব-পুত্রকে হয়তো তার করুণাঘন ভালোবাসার একটু বেশি স্পর্শ দিয়েছেন। আর তা' এই দুঃখী রাজপুত্রের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর তার বেগম ভারত সরকারের কাছে মাসোয়ারার আবেদন জানিয়ে চিঠি দেন।

সরকারের তদানীন্তন প্রতিনিধি পাঁচ টাকা মাসোহারা মঞ্জুর করেন।

লর্ড রিপন সেই টাকা বাড়িয়ে একশ করেন। তবে এই সর্তে তা' দেওয়া হয়, ফিরুজ শাহের স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই মাসোয়ারা অন্য কারো ওপর বর্তাবে না।

কুনোয়ার সিং

শাহাবাদজেলার জগদীশপুরেই নাকাড়া-টিকারা প্রথম বেজে উঠলো। তারপর সেই বাজনা আর বাজনদারেরা ছড়িয়ে পড়লো সারা জেলা জুড়ে। পথ—চলতি মানুষ জন দাঁড়িয়ে গেল পথে, হাটেবাজারে হাটুরের কৌতুহলী ভিড়! গাঁয়ে-গঞ্জে মানুষেরা ভেবে কিনারা করে উঠতে পারে না, হঠাৎ এখন বাজনা বেজে উঠলো কেন! আর সেই বাজনা সারা জেলা জুড়ে এখন লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কেন!

পাহাড়-টিলা ডিঙিয়ে বাজনার শব্দ ছুটে চলেছে। খেত-খামারে কিসান-মজুর হাতের কাজ ফেলে তাকায়। চোখে বিস্ময়ের কুয়াসা জমে ওঠে তবু চোখে তাদের পলক পড়ে না! গাঁয়ের মেয়ে যারা কুয়োতলায় জল আনতে এসে সখিদের সঙ্গে দুদণ্ড লাবণ্যময় পরিহাসে মেতে উঠতো তাদের বুকের তলায় ভয় জমেছে এই বাজনা শুনে; কেউ আর দাঁড়াতে চায় না। ছত্রভঙ্গ পাখিদের মতো ইতিউতি তাকিয়ে খরপায় জল নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

কাড়াদাররা গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে চলেছে দুরন্ত পায়। গাঁয়ের লোক কাড়াদারদের ঘিরে ধরেছে। রঙীন পাগড়ির নিচে কাড়াদারদের চোখ উত্তেজনায় চকচক করে। তারা বললো, খবর শোন নি,

না তো। সমস্বরে হেঁকে ওঠে গাঁয়ের লোক। কাড়াদারদের একজন বলে, বাবু কুঁয়োরসিংকে ধরবার জন্য কোম্পানী পাটনা থেকে ফৌজ পাঠিয়েছে। তারা বাবুজী কে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে। বাবুজী তোমাদের বলে পাঠিয়েছেন, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। শরীরে তাগৎ নেই। আমার মূর্দা ডোমের হাত থেকে তোমরা এসে বাঁচাও—।

হাল কাঁধে রাজপুত চাষি ফুঁসে উঠলো, বেত্তামিজ কোম্পানীকা এৎনা জবরদস্তি!

কাড়াদারদের কথা তখনো শেষ হয় নি। চারদিকে জমে-ওঠা মানুষের দিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে হেঁকে উঠলো তারা, মরদরা সব হাতিয়ার নাও—জোর কদমে জগদীশপুর চলো—বাবু কুঁয়োর সিং তোমাদের ডেকেছেন—

শাহাবাদ জেলার ঘরে ঘরে সেদিন উত্তেজনার বান ডেকেছে বুঝি!

রাজপুত্র মহল্লার সর্দাররা মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়ায় খাপে ঝুলছে তলোয়ার; কারো পিঠে বন্দুক লোকজন তারা নিয়ে ছুটলো জগদীশপুরের দিকে।

রাজপুতদের গ্রামে-গ্রামে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো। জেলা শাহাবাদের মানুষেরা সূর্যের আলোয় নাঙ্গা তলোয়ার ঘুরিয়ে জগদীশপুর রাজপ্রাসাদের দিকে হাঁটতে সুরু করলো। সেখানে আছেন বাবুজী কুঁয়োর সিং।

ঘর-সংসার-চাষ-আবাদ-ছেলে-বউ, মা-বহিন সব রইলো পড়ে। কোমর বেঁধে হাতিয়ার কাঁধে তুলে নিল। খানদানী বুড়ো মানুষটাকে কোম্পানী বেইজ্জত করতে চেয়েছে—শাহাবাদজেলার মানুষেরা তা' কিছুতেই হতে দেবে না। তাদের হিম্মতে কি ঘাটতি পড়েছে !

উৎসব-দিনের মিছিলের মতো লোক চলেছে—পতাকা উড়ছে হাজারে হাজারে, কুঁয়োর সিংয়ের জয়ধ্বনিতে মাঠ-ঘাট কেঁপে উঠছে। এ যেন 'এসেছে সে এক দিন লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে…
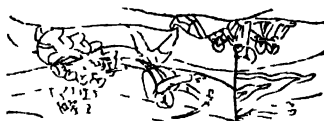
বিহারের রাজপুত প্রধান বাবু কুনোয়ার সিংয়ের বিরাট জমিদারী শাহাবাদজেলা জুড়ে। বার্ষিক আয় তিরিশ লক্ষ টাকা। সরকারী খাজনা দিতে হয় আঠেরো লক্ষ টাকা।

এতটুকু লেখাপাড়া শেখেন নি বাবুজী। জমিদারীর হিসেব-পত্তর তো দূরের কথা সাধারণ হিসেবও বুঝি তার মাথায় ঢোকে না। ফলে সম্পত্তি নিয়ে কতো যে গোল পাকিয়েছে তার ঠিকানা নেই। দালাল-ফড়ে-ঠগ এসে কুনোয়ার সিংকে ঘিরে ধরেছে তাকে ভোক দিয়ে ধাপ্পা দিয়ে যে যা পারছে বাগিয়ে নিচ্ছে। এমন কি রাজবাড়ির পুরনো চাকরগুলো তাকে দিয়ে দলিলে টিপ-ছাপ করিয়ে অনেক টাকা আদায় করে নিয়েছে। কর্মচারীরাও এই সুযোগে তাকে শুষে নিচ্ছে। জমিদার কুনোয়ার সিংয়ের যেখানে আদায় হয় দশ হাজার হাতে আসে একশ'।

তবে এই উদার-হৃদয় ভূস্বামীকে প্রজারা দেবতার মতো মানে ; কতোবার যে খরা আর অজন্মায় খাজনা মকুব করেছেন তার লেখা-জোকা নেই। বিপদআপদ ও অবিচারের প্রতিকারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়। ব্যবস্থা একটা হবেই। নিজে যেমন অন্যায় করেন না অন্যায় বরদাস্ত করতে ও জানেন না। অন্যসব ব্যাপারে বাবুজী দৃঢ়চিত্তের লোক হলেও খরচের বেলায় একেবারেই বেহিসেবী। আর তাতেই হয়েছে মুশকিল। দেনায় মাথা পর্যন্ত ডুবে গেছে। দেনার পরিমাণ শুনলে চমকে উঠতে হয়—এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা। আর বছরে-বছরে তা সুদে-আসলে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে।

পাওনাদারেরা এই সব দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো। ব্যাপারটা ভালো করে খতিয়ে

দেখে বুঝলো, সুদ আর আসল দুই মারা যাবার দাখিল। নিরুপায় হয়ে তারা বোর্ড অব রেভেনিউর দরজায় ধর্না দিল। বোর্ড অব রেভেনিউ জবাব দিল, দরখাস্ত করো—দেখছি।

পাওনাদাররা দরখাস্ত করলো, বাবু কুনোয়ার সিংয়ের জমিদারী দখল নিয়ে তাদের পাওনা গণ্ডা শোধ করে দেবার ব্যবস্থা হোক।

বোর্ড অব রেভেনিউর মিটিং বসলো। অনেক বিচার-বিবেচনার পর কুনোয়ার সিংকে কারো কাছ থেকে এককোটি টাকা ধার নিয়ে পাওনাদারদের মিটিয়ে দেবার হুকুম হল।

ধার দেবার লোকের অভাব হল না।

কিরউনির বাসিন্দা দুই ভাই নারায়ন রাও ও মাধব রাও এগিয়ে এলো। ব্যাপারটা কুনোয়ার সিংয়ের মনঃপুত না-হলে আপত্তি করলেন না।

রাও-ভাইদের সর্ত দিতে বলা হল।

দেনা শোধ না-হওয়া পর্যন্ত জমিদারীতে দখল থাকবে না এই সর্তে কুনোয়ার সিং রাজি হতে পারলেন না। আলোচনা ভেঙে গেল। কমিশনার টেইলর ছিলেন কুনোয়ার সিংয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী। এই সজ্জন জমিদারকে বাঁচানোর জন্যে সাহেব তৎপর হয়ে উঠলেন। কারণ অবশ্য ছিল। টেইলর আর তার বন্ধুরা কুনোয়ার সিংয়ের সহৃদয় আতিথ্যে কতো দিন শোনের চরে পাখি শিকারে গেছেন। জগদীশপুর রাজপ্রাসাদ থেকে নেমন্তন্ন পেয়েছেন। খানাপিনার অঢেল বন্দোবস্ত। বেহেস্তের বাঈদের নাচ আর গান!

সে সব তো সহজে ভোলবার নয়। তাই হয়তো কুনোয়ার সিংকে বাঁচানোর একটা নৈতিক দায়িত্ব টেইটর সাহেবের মনে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে।

বোর্ড অব রেভেনিউর সেক্রেটারীকে চিঠি লিখলেন কমিশনার টেইলর সাহেব, 'জরুরি পাওনা মেটাবার জন্যে অল্পসল্প ধার করলেই যখন চলবে তখন বেশি টাকা ধার না করাই ভাল। বার্ষিক আদায় থেকে মোটামুটি রকমে একটা-টাকা বছর-বছর শোধ দিলেই পাওনাদারদের ঠেকানো যাবে। আমার মনে হয়, শাহাবাদের ডেপুটি কালেক্টর সৈয়দ আজিমুদ্দিনকে এস্টেট দেখা-শোনার কাজে নিয়োগ করলে এ ব্যাপারে আর অসুবিধে হবে না। তা' ছাড়া সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্তর থেকে জানা গেছে যে ইতি-মধ্যে সাত লক্ষ টাকার দেনা শোধ হয়েছে; যদিও দুলক্ষ টাকার কিছু বেশি আবার নতুন দেনা হয়েছে।

হবেই তো। দানসত্র-অন্নসত্র-জলসত্র পণ্ডিতদের বৃত্তি দেবার জন্যে বিস্তর টাকা লাগে। বিভিন্ন পরবের খরচা তো আছেই। এ ছাড়া কুনোয়ার সিং জগদীশপুরে বিশাল এক মন্দির তুলছেন তার জন্যেও অঢেল টাকা কড়ি বের করে দিতে হচ্ছে।

আত্মীয়-পরিজনের জন্তেও মাসে কম খরচা হয় না। না, বলার লোক কুনোয়ার সিং নয়। টাকা আছে খরচা করে যাও। না-থাকলে তখন বোঝা যাবে। কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে সে ভাবনা ভাবতে কুনোয়ার সিং রাজি নন।

টেইলরের চিঠি পেয়ে পাটনায় বোর্ড অব রেভেনিউর সভা বসলো। অনেক আলাপ-অলোচনার পর টেইলরের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। শুধু নাকচ হয়ে গেল না, তারা তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিলেন, পাওনাদারের স্বার্থরক্ষার জন্তে কুনোয়ার সিংয়ের জমিদারীর দখল নেওয়া হোক।

বোর্ড অব রেভেনিউর কোন-কোন সদস্তের মধ্যে একটু দ্বিধা ছিল কিন্তু কোম্পানীর ভাগ্যে, পাওনাদারদের দিয়ে-থুয়ে যা থাকবে সে বড়ো কম নয়। চাই কি তেমন সুবিধে হলে, কুনোয়ার সিংকে চিরকালের মতো কলা দেখানও যেতে পারে!

কাগজ-পত্তর তৈরি হয়ে যাবার পর কোম্পানীর হুকুম কুনোয়ার সিংকে জানানোর জন্তে পাটনা থেকে লোক রওনা হয়ে গেল শাহাবাদ জেলার দিকে।

১৮৫৭ সালে জানুয়ারী মাসের অপরাহ্ন।

জগদীশপুর প্রাসাদের খোলা চত্বরে রামায়ণ পাঠের আসর বসেছে। মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে শুনছেন কুনোয়ার সিং। পোষ্য-পরিজন চার পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে।

শীতের পড়ন্ত বেলার রোদ ঝিমিয়ে এসেচে বুঝি! উত্তর থেকে একটানা কনকনে শীতের বাতাস বইছে।

চন্দনচর্চিতব্রাহ্মনে মৃদু ও মিঠে গলায় তুলসীদাসের রামায়ণ গাইছেন: সব নর করহি পরস্পর প্রীতি। চলহি সধরম নিরত শ্রুতি নীতি॥

চারিউ চরণ ধর্ম জগমাহি। পুরীরাহা সপনে হুঁ অঘ নাহি॥

রাম ভগতি রত নয় আরু নারী। সকল পরম গতিকে অধিকারী॥

অল্প মৃত্যু নহি কব নিউ পীরা। সব সুন্দর সব বিরুহ শরীরা॥

নহি দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা। নহি কোউ অবুধ ন লচ্ছন হীনা॥

কুনোয়ার সিংয়ের মুখেও একটা পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো। তুলসীদাসের রামরাজত্বের বর্ণনাতে জগদীশপুরের ছবি ফুটে উঠেছে বুঝি।

ইতিমধ্যে কার ছায়া পড়লো সামনে!

কুনোয়ার সিং চোখ মেলে তাকালেন, ভাই অমর সিং সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কিছু বলবে ?

ভাইয়া আপনাকে একবার যেতে হবে।

কেন ?

পাটনা থেকে বোর্ড অব রেভেনিউর সাহেব এসেছেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ কুনোয়ার সিং ফরাস থেকে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ আমার কাছে আবার কি দরকারে ?

অমর সিং দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে উত্তর দিলেন, সে সব কিছু তো বললেন না ; শুধু বললেন, পাটনা থেকে আসছি। কুনোয়ার সিংয়ের দেখা চাই।

সাহেবের সঙ্গে দেখা হতেই কুনোয়ার সিংয়ের হাতে বোর্ড অব রেভেনিউর চিঠি তুলে দিয়ে বললেন, কোম্পানী পাওনাদারদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যে জিলা জগদীশপুরের ওপর আপনার জমিদারী সত্ব বাতিল করে খাসদখল নিয়েছে। আজ থেকে সেই হুকুমত কার্যকরী হল।

নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারেন না কুনোয়ার সিং।

আমি দুঃখিত বাবো কুনোয়ার সিং। সাহেব যাবার আগে সমবেদনা জানালেন, পাওনাদারেরা বোর্ড অব রেভেনিউর সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত করাতে বাধ্য হয়ে—

মনোভাব যাই হোক কুনোয়ার সিংয়ের বাইরে তার কোন প্রকাশ দেখা গেল না। সমস্ত ব্যাপারটাকে আপাতশান্ত ভাবে গ্রহণ করলেন। শুধু চোখের সামনে থেকে সাহেবের পালকি যখন দূরে সরে যেতে লাগলো তখন কুনোয়ার সিংয়ের ভিতরে ক্রুদ্ধ এক পশুরাজের কেশরগুলো ফুলে ফুলে উঠছিল।

জগদীশপুরের এই প্রাচীন রাজপুতপ্রধান তার পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে বিশেষ স্পর্শকাতর ছিলেন। কবে কোন অতীতে উজ্জয়িনী থেকে পূর্বপুরুষদের কেউ এসে সাহাবাদ জেলায় বিস্তীর্ণ জমিদারীর পত্তনি নিয়েছিলেন সে কথা কারো মনে নেই ; তারপর কতকাল পার হয়ে গেছে তাদের পূর্বতন বাসভূমি উজ্জয়িনীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে—এখন জগদীশপুরের জমিদারী সিং রাজপুতদের প্রাণ। এখানকার বর্ষা-বসন্ত, পাল-পার্বন, খেতি-খামার-ফসল মানুষজন সব কিছুর সঙ্গে সিংয়েরা একান্ত। তাদের সুখ-শান্তি দুঃখ-বেদনা জগদীশপুরকে ঘিরে।

আর কুনোয়ার সিং তো শিশুরা মাকে যেমন ভালোবাসে এখানকার মাটিকে তেমনি ভালোবাসেন—এখানকার কাদা-মাটির-গন্ধ, ঘাস-পাতা-নলখাগড়ার বনের গন্ধ, গাছপালা-ফুল-পল্লবের সুবাসের সঙ্গে কুনোয়ার সিংয়ের আটকশোর সৌহার্দ। তার সব যেন তার আত্মার আত্মীয়।

জগদীশপুর কুনোয়ার সিংয়ের কৈশোরের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন আর শেষ বয়সের বারাণসী ধাম।

সেদিন রাত্রে জগদীশপুর প্রাসাদের ঘরে-ঘরে অন্ধকার। বিমূঢ় পরিজনের নিঃশব্দ বিলাপ মাঝে-মাঝে ড ুকরে উঠতে লাগলো।

সত্তর বছরের বৃদ্ধ কুনোয়ার সিংয়ের চোখে জলের ধারা। বাধা মানতে চায় না। রামচন্দরজী বৃদ্ধবয়সে একি শেল হানলেন!

পাশে অনুজ অমর সিং। ভাই-পো রীতভঞ্জন সিং। তহসিলদার হরকিষেণ সিং। ষাট বছর বয়সী বন্ধু নিশান সিং। সবাই স্তব্ধ। সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। এ বেদনা পুত্র শোকের মতো গভীর। হয়তো গভীরতর। দীর্ঘদিন ধরে এই জমিদারী সিং পরিবারের রাজপুতদের দুধে-ভাতে লালন করছে।

১৮৫৭র মে মাসে মীরাটে আগুন জলে উঠলো। এর আগে দিল্লিতেও আগুন লেগেছে। দাবানলের মতো সেই আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। 'ভারতের দিকে-দিকে বেইমান কোম্পানীর হুজ্জতি আর জবরদস্তির বিরুদ্ধে সারা ভারত একজাতি এক প্রাণ হয়ে রুখে দাঁড়ালো।'

হাজার-হাজার ফৌজি সিপাই বন্দুক হাতে নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। তারা সেনা ছাউনি ভেঙেছে, ব্যারাক জ্বালিয়ে দিয়েছে, জেল ভেঙে বন্দীদের বাইরে নিয়ে এসেছে, ট্রেজারি লুঠ করেছে, তারপর ক্যান্টনমেণ্টে আগুন জ্বালিয়ে দিল্লির পথ ধরেছে। তাদের গলায় বাজের শব্দ ফেটে পড়েছে, কোম্পানীশাহী খতম করো—ফিরিঙ্গি মারো—দিল্লি চলো—

আগুনের ফুলকি বাতাসে উড়ে যেতে লাগলো আর সেই ফুলকি পড়ে আগুন হয়ে জলে উঠলো কানপুর-ঝাসি-বরেলি-লক্ষৌ-আযোধ্যা-।

সেই আগুনের আঁচ এসে লাগলো বুঝি বিহারের গায়। কুনোয়ার সিংয়ের জমিদারী দখল নিয়ে কোম্পানী এত দিন নিশ্চিন্ত ছিল; এবার বুঝি নড়ে-চড়ে উঠতে হল। এ হাওয়ার গতিক ভালো নয়!

অবশ্য জমিদারী দখল নেবার পর কোম্পানী কড়া নজরে রেখেছে কুনোয়ার সিংকে তেমন বেচাল কিছু চোখে পড়ে নি সত্যি, তবে হিন্দুস্থানের এখন যা হালচাল তাতে সাবধান হওয়া দরকার।

বাইরের থেকে বোঝা না-গেলেও কুনোয়ার সিং লোকটা যে খেপে আছে তাতে আর সন্দেহ কী! তারপর ফৌজী সেপাইরা যে ভাবে ভারত জুড়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে তাতে সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। কে জানে, হয়তো নানাসাহেবের কোন

সাগিদ জগদীশপুরে এসে কুনোয়ার সিংয়ের কানে মন্ত্র দিয়ে যেতে পারে তখন বিহারকে সামলানো ভারি মুশকিল হবে !

তাই আগে-ভাগে সতর্ক হওয়ার জন্যে কোম্পানী কুনোয়ার সিংকে জমিদারী সং ক্রান্ত কাজের অছিলায় ডেকে পাঠালো।

আর কোম্পানীর কর্তারা ঠিক করে রেখেছিলেন হাতের মুঠোয় এসে পড়লেই কুনোয়ার সিংকে সোজা ফাটকে চালান করে দিতে হবে তারপর এই অস্থির অশান্তির দিন শেষ হলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

খবর কিছু কুনোয়ার সিংয়ের কাছেও পৌছেছিল

দিল্লিতে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে আরেক বাহাদুর বক্তখান চল্লিশ হাজার ফৌজ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। ভারি জবরদস্ত সে লড়াই, কোম্পানীর হয়রানির শেষ নেই। কানপুরে নানাসাহেব বালাসাহেব কোম্পানী রাজ খতম করে দিল্লির বাহাদুর শাহকে শাহানশাহ সেজে শাসন কার্য পরিচালনা করতে শুরু করে দিয়েছে।

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ সুযোগ খুঁজছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়বার জন্যে।

বান্দার নবাব তার ডাকাবুকো ঘোড়সোয়ারের দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ইংরেজ শাহী খতম করতে।

সব খবর এসে পৌছচ্ছে শাহাবাদ জেলায়।

এই তো সেদিন কোম্পানী পাটনায় যে কাণ্ড করেছে সারা বিহারে তা ছড়িয়ে পড়েছে। কমিশনার টেইলরের আহ্বানে যে সব ওয়াহাবী নেতা পাটনায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাদের বিচারের পরোয়া না করে নির্বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং কুনোয়ার সিংয়ের কাছে যখন পাটনা যাবার আমন্ত্রণ এলো তখন সবিনয় প্রত্যাখ্যান করলেন।

নিতান্ত পীড়াপীড়িতে বললেন, শরীর ভালো নেই আপাতত ; একটু সুস্থ হলে যাবো। নিশ্চয়ই যাবো।

দূত ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়ে পাটনায় খবর দিল।

পাটনার সরকারী মহল ভারি বিপদে পড়ে গেলেন। তারা অনেক শলা-পরামর্শের পর একজন ডেপুটি কালেক্টরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন জগদীশপুরে।

পাটনায় কুনোয়ার সিংয়ের লোক ছিল। তার কাছ থেকে জগদীশপুরে খবর পৌছল, কোম্পানীরাজ কুনোয়ার সিংকে ধরবার জন্যে ফৌজ পাঠাচ্ছে।

শুকনো খড় শুধু আগুনের অপেক্ষায় ছিল এবার ফুলকি পড়তে চিড়বিড় করে জলে উঠলো। বাতাস ছিল। দাবানলের মতো সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো।

গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে জেনারেল লয়েডের কাছে জরুরি চিঠি এলো, দানাপুর ডিভিসনকে এখনই নিরস্ত্র করা হোক।

ভারতে কোম্পানীর কর্তারা আগেভাগে এবার সাবধান হতে চান। যেভাবে দিল্লি-মীরাট-কানপুরের সেনা ছাউনি থেকে সৈন্যরা হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এসে ধুন্দুমার কাণ্ড কারখানা স্বরু করেছে তাতে আঁৎকে উঠতে হয়। অনেক জায়গায় তো কোম্পানীর নাম ধুয়ে-মুছে গেছে। বহু জায়গায় কেউ-না-কেউ বিস্তীর্ণ এলাকার দখলদারি নিয়ে বাহাদুর শাহের প্রতিনিধি সেজে বসেছে।

এলাহাবাদের এপারের অংশ বাংলা-বিহার এখনো কোম্পানীর শাসনে আছে বটে তবু বিহারের অবস্থা যেন কেমন-কেমন। তাই আগে থেকে কোম্পানী সাবধান হতে চায়।

চিঠি পেয়ে জেনারেল হাসলেন, এই সব সিভিলিয়ানরা সব সময়ই ভয়ে জবুথবু। আবে বাবা, আমরা আছি কি জন্যে—আমাদের সেনা-সামন্তরা আছে কি জন্যে! হঠাৎ একটু কিছু ঘটে যাওয়াতে দুর্বিপাকে পড়তে হয়েছে বটে তবে সামাল দিতে বেশি সময় লাগবে না।

নতুন যে চুরুটের চালান এসে পৌছেছে তার একটা মুখে গুঁজে দিয়ে জেনারেল তার সদর দপ্তর থেকে উত্তর দিতে বসলেন।

জেনারেল চিঠিতে আশ্বাস দিলেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে দানাপুর ডিভিসনের আনুগত্য সন্দেহাতীত। তাদের বিদ্রোহ করবার কোন সম্ভাবনা নেই। ইউরোপীয় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে দেশীয় ফৌজের সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ পূর্ণ।

এতখানি লিখে জেনারেল লয়েড থামলেন। ইতিমধ্যে নামিয়ে-রাখা চুরুট এ্যাসট্রে থেকে তুলে আবার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সামনে আকাশের দিকে তাকালেন। ঝক-ঝকে নীল আকাশ। ইস্পাতের মতো উজ্জ্বল। কোথাও এতটুকু মেঘের চিহ্ন নেই।

সমস্ত আকাশটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এক সময় তার মনে হল, এই আকাশেই তো হঠাৎ রোদ মুছে মিশমিশে কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে আসে।

চিঠির শেষে যোগ করলেন, অবশ্য ইতিমধ্যে অদৃশ্য কারণ যদি উপলক্ষ্য হয়ে হাজির না হয়।

কর্তৃপক্ষ এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তারা জেনারেলের ওপর চাপ দিলেন যাতে কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা হয়। অবশ্য এই কাজের ধরণ ধারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জেনারেলের স্বাধীনতা থাকবে।

তবে এ সম্পর্কে একটু ইঙ্গীত দেওয়া হল, কাজে যেন সতর্ক ভাবে হাত দেওয়া

হয়। সেপাইরা ছেলেমানুষ নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই চতুর। অস্ত্র সম্পর্কে দেশি সিপাইরাও ইউরোপীয়দের মতোই স্পর্শকাতর।

প্রত্যেক সেনাদলেই দুচারজন দুষ্কৃতিকারী থাকেই, সুযোগ গ্রহণে তারা অত্যন্ত তৎপর হয়। সুতরাং এই সব ধান্ধাবাজদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

জেনারেলের কাছে গভর্মেণ্টের এই চিঠির খবর দানাপুর সিপাই লাইনেও এসে পৌঁছেছিল।

সিপাইদেরও চিঠি আদান-প্রদানের একটা গুপ্ত ব্যবস্থা ছিল। তারা সরকারী ডাক ব্যবস্থার চেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খবর দেওয়া-নেওয়া করতো।

খবর পাবার সঙ্গে-সঙ্গে দানাপুর সেপাই ছাউনি 'টেরা-ডেল-ফিউগো' আগুনের দেশ হয়ে উঠলো।

লয়েড পড়লেন মুশকিলে, কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কাজটা ভারি বেয়াড়া। একটু-ওদিক হলে আর রক্ষে নেই। সেপাইদের রাইফেলের গুলিতে ঝাঝরা হয়ে যেতে হতে পারে।

নিজের দপ্তরে বসেই কাজের পরিকল্পনা করেন জেনারেল। একটাও তার মনের মতো হয় না। দপ্তরেরই কারো-কারো সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাতিয়ার হাতিয়ে নেওয়া হোক।

কারো মত কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হোক। অস্ত্রত্যাগ করতে অস্বীকার করলে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

না, এতখানি ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন না জেনারেল লয়েড। তিনি একটু নতুন ধরণের উপায় স্থির করলেন। সৈন্যদের রাইফেল তাদের কাছেই থাক শুধু গুলিগুলো চেয়ে নেওয়া হোক। তাহলে হাতিয়ার সম্পর্কে তাদের স্পর্শকাতরতাকে স্পর্শ করা হবে না অথচ রাইফেল অকেজো করে দেওয়া হবে। সৈন্যদের অপমান বোধ করবারও কোন কারণ থাকবে না।

কাজে নেমে গেলেন জেনারেল লয়েড।

'সাতান্নর ২৫ জুলাই। আরা সেনাছাউনির সামনের মাঠে সকালবেলা একদল গোরা সৈন্য গড়ের বাদ্যিতে 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভ্‌স' বাজিয়ে মার্চ করতে লাগলো।

আরেক দল গোরা সৈন্য ছুটো বলদের গাড়ি যোগাড় করে সেনা ব্যারাকের ভেতর ঢুকে গুলি সংগ্রহ করতে লেগে গেল।

হঠাৎ এমন ভাবে ব্যারাকে ঢুকে জোর করে গুলি নিয়ে নেওয়াতে সেপাইরা ভারি বিরক্ত হল। তাদের কেউ গোরা-সাহেবদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালো।

ব্যাপারটা এমন গোলমেলে হয়ে দাঁড়ালো যে সেভেন্থ ও এইট্থ্ রেজিমেন্টের সৈন্যরা বাইরে বেরিয়ে গুলি বোঝাই ফিরতি বলদের গাড়ি দুটোকে আটকে দিল।

বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ঘটনা কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম রেজিমেন্টের অফিসাররা তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

অফিসারদের দেখে সেপাইরা থতমত খেয়ে গেল।

এমন কি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৪০ তম বাহিনীর সেপাইরা রাইফেল বাগিয়ে ব্যারাক থেকে নেমে এলো। তারা শুধু নির্দেশের অপেক্ষায় রইলো—প্রয়োজন হলেই, দেশোয়ালী ভাইদের দিকে গুলি ছুঁড়বে।

কিন্তু দুচারজন ঠাণ্ডা মাথা ইউরোপীয় অফিসার রুখে-ওঠা সেপাইদের বোঝাতে পারলেন যে শৃঙ্খলা রক্ষাই সামরিক বিধির প্রথম ও শেষ কথা। তা-ছাড়া সেপাইদের মধ্যে আনুগত্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার জোরে মৃদু ভৎর্সনা করে তাদের ছাউনিতে ফিরিয়ে দিতে পারলেন।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বোমার মতো ফেটে পড়তে-পড়তেও থেমে গেল।

লয়েড আধাআধি কাজ হাসিল করলেন বটে তখনো প্রত্যেক সিপাইর কাছে পনেরটা করে গুলি রয়ে গেল।

জেনারেল লয়েড আশা করলেন, এবার সেপাইরা চাওয়া মাত্র গুলিগুলো দিয়ে দেবে। সুতরাং সে-দায়িত্বটা দিশি ফৌজি অফিসারদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল।

এবার কিন্তু সেপাইরা বেঁকে দাঁড়ালো। তারা হেঁকে উঠলো, কভী নহী দেঙ্গে—ক্যায়সে ভী নহী দেঙ্গে—

এমন কি তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের কথাও তারা গ্রাহ্য করলো না। দল-বেঁধে সেপাইরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো। তারা রাইফেল মাথার উপরে তুলে চেঁচাতে লাগলো, জান দে দেঙ্গে পর গোলী নহী দেঙ্গে

কিছু সেপাইরা রুখে দাঁড়িয়ে তাদের অফিসারদের বললো, য়্হাঁসে হঠ্ যাইয়ে—আভী হঠো—তুরন্ত হঠো—।

এই সময় হয়তো একটু ধাক্কাধাক্কি হয়ে থাকতে পারে।

কে দোষী বলা কঠিন।

হয়তো সেপাইরা তাদের অফিসারদের চলে যেতে বলে শৃঙ্খলা ভেঙেছে সেইজন্যে তাদের ওপর গুলি চালানো হল।

এদিকে গুলির শব্দ পেয়ে ইউরোপীয় হাসপাতালের রোগীরা ছাদে-জানালায়-বারান্দায় এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। অবশ্য প্রত্যক্ষ দর্শীদের সাক্ষ্য-বিবরণ থেকে জানা যায়, ইউরোপীয় সৈন্যদের রোগী সাজিয়ে হাসপাতালে মোতায়েন রাখা হয়েছিল। তারা ভাবলো, দেশি সেপাইরা বিদ্রোহ করেছে ; সুতরাং বিচার-বিবেচনা না-করে এলোপাথারি গুলি চালিয়ে জনা-চল্লিশেক সৈন্যকে খতম করা হল।

৪০তম বাহিনীর সেপাইরা প্রথমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় নি ; তারা সেই ব্যারাকেই ছিল। তাদের যে দুচারজন পোস্টের ডিউটিতে ছিল তারাই ছুটে গিয়ে ব্যারাকে খবর দিল দশম ইউরোপীয় বাহিনীর সেনারা গুলি চালিয়েছে। তাতে বিস্তর দেশি সিপাই মারা পড়েছে।

খবর শুনে, যে যার কাজ ফেলে হাতিয়ার নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে তখনও দশম ইউরোপীয় বাহিনীর সেনারা হাসপাতালের ছাদ-বারান্দা থেকে গুলি ছুঁড়ে চলেছে।

গোরা সেনাদের গুলি ছুঁড়তে দেখে তাদের মাথায় রক্ত উঠে গেল। তারা কোম্পানীশাহী খতম কর' এই ধ্বনি দিতে দিতে ময়দানে নেমে পড়লো।

বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল

সেনা ব্যারাকে যত সৈন্য ছিল সবাই কোম্পানীরাজ খতম করবার ধ্বনি দিতে দিতে যুদ্ধের ময়দানে নেমে এলো।

জেনারেল লয়েড্ অসাবধানে কাজ হাঁসিল করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেললেন।

এই কাণ্ডটা যখন ঘটলো জেনারেল তখন স্টীমারে।

সবচেয়ে সঙ্কট মুহূর্তে, যখন তার পরামর্শ দরকার, অফিসাররা তা পেলেন না।

জলের ধারা যেমন নিচের দিকে বয়ে যায়, ঘটনার স্রোতও তেমনি অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চললো।

সেপাইরা সারারাত ধরে শলা-পরামর্শ করলো, কোম্পানীশাহী খতম হোনা চাহিয়ে' বলে ধ্বনি দিতে লাগলো, আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ে রাত্রির অন্ধকার ফালাফালা করে দিতে লাগলো।

পরদিন ভোরে বিহার যে সূর্যের মুখ দেখলো আগুনের মত রঙ তার টকটকে লাল।

সকালে উঠে বিদ্রোহীরা শাহাবাদ জেলার মিলিটারি হেড কোয়ার্টার্সের দিকে রওনা হয়ে গেল।

উত্তর ভারতে যে আগুন জলছিল বিহার পর্যন্ত তার সীমা এগিয়ে এলো।

স্টীমারে জলবিহার করছিলেন জেনারেল লয়েড। খবর শুনে তিনি ভোম্'।

খানিকক্ষণ তো কথাই বলতে পারলেন না ; তবে জবরদস্ত জেনারেল তাই সাময়িক

নার্ভাসনেস্ ঝেড়ে ফেলতে তার সময় লাগলো না। দাঁত দিয়ে চুরুট চেপে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কোন পথে যাবে বলে মনে হয়?

সম্ভবত তারা হেড কোয়ার্টার্সে তাদের দেশোয়ালি সেপাইদের কাছে গেছে।

জেনারেল সেই মুহূর্তে ভেবে নিতে পারলেন, তারা গয়ার দিকে যেতে পারে হয়তো পাটনার দিকেও যেতে পারে।

পাটনা নিয়ে জেনারেল ভারি ভাবনায় পড়লেন। বিদ্রোহীরা পাটনা দখল করতে পারলে বিহারে কোম্পানী শাসন তচনচ করে দেবে। আর তার দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে।

জেনারেলের নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করতে লাগলো। ভালো মানুষী দেখাতে গিয়ে কি বিপদে পড়লেন। এর থেকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে হাত থেকে রাইফেলগুলো ছিনিয়ে নেওয়াই উচিৎ ছিল।

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল। এখুনি কিছু করা দরকার। তার স্টাফ অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তখুনি পেল্লায় দুটো কামান দিয়ে একদল সৈন্যকে ডাঙা পথে বিদ্রোহীদের ধাওয়া করতে পাঠালেন।

আর নিজে গেলেন স্টীমারে জলপথে।

স্টীমারের গতিবেগ বাড়িয়েও লয়েড বিদ্রোহীদের নাগাল পেলেন না।

বিদ্রোহীদের যে সব নৌকো মালপত্তর নিয়ে এসেছিল তাদের কয়েকটা ডুবিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব হল না।

লয়েড চটপট পাটনা চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্যে সৈন্য বোঝাই আরেকটা স্টীমার পাঠালেন শোন নদ দিয়ে।

গ্রীষ্মের শোনে বর্ষার সেই দাপট নেই; একেবারে নিস্তেজ নির্লিপ্ত এক জলধারা। বিশাল খাতের মাঝ দিয়ে জল যেন গড়িয়ে চলেছে—জলের তলায় এখানে-সেখানে ডুব দিয়ে আছে চড়া। এসব চড়া স্টীমারের পক্ষে ভারি বিপজ্জনক।

স্টীমারের সারেঙ গঙ্গার গভীর নাব্যতায় এলাহাবাদ-কলকাতা করে—এ নদী তার অপরিচিত। জরুরী অবস্থার জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল। শোন নদের চড়ার হিসেব তার জানা ছিল না। সুতরাং স্টীমার মাঝ-নদীতে এক চড়ায় আটকে পড়ে রইল।

এখনো বিদ্রোহীরা আরায় গিয়ে পৌছয় নি খবর পেয়ে লয়েড শেষ স্টীমারখানা জোগাড় করে সিভিলিয়ানদের আনতে আরা পাঠালেন। সেই স্টীমারের কপালেও একই বিপত্তি ঘটলো।

ক্ষোভে-দুঃখে জেনারেল লয়েড নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন। পাঠানোর মতো কোন স্টীমার নেই আর। এবার সাহাবাদ জেলা, আরা মিলিটারী হেড্ কোয়ার্টার্স সব কিছু বিদ্রোহীদের হাতে সঁপে দিয়ে ঈশ্বরপুত্র যিশুকে স্মরণ করা ছাড়া কোন উপায় রইলো না।

তবু জেনারেল লয়েড শুতে যাবার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, এলাহাবাদ কিংবা কলকাতা থেকে কোন স্টীমার যদি আসা-যাওয়ার পথে পাটনা এসে থামে তবে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

ভাগ্য একেবারে বিরূপ ছিল না তাই এলাহাবাদ থেকে কলকাতা যাবার পথে যাত্রী বোঝাই একটা স্টীমার মাঝরাতে এসে নোঙর ফেললো পাটনায়।

মাঝরাতেই জেনারেল লয়েডকে জাগিয়ে খবর দেওয়া হল, একটা স্টীমার এলাহাবাদ থেকে কলকাতা যাবার পথে পাটনায় এসে রাতের মতো নোঙর করেছে! ভোরেই ছেড়ে যাবে বোধহয়।

স্টীমার! শব্দটা শুনে জেনারেল ঘুম ঝেড়ে লাফ দিয়ে উঠে তার দপ্তরে গিয়ে হাজির হলেন।

ইতিমধ্যে আর্দালি কাগজপত্র টেবিলে এনে হাজির করেছে।

চুরুট ধরাতে যা দেরি তারপর কুইলের কলম হাতে নিয়ে খসখস করে লিখে দিলেন; এখুনি স্টীমার খালি করে সামরিক বিভাগের হাতে দেওয়া হোক।

জেনারেলের আদেশ নিয়ে একজন সার্জেণ্ট স্টীমারের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে হাজির হল।

ক্যাপ্টেন জেনারেলের নির্দেশনামা পড়ে বললেন, ঠিক আছে। তারপর তার কেবিনে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন।

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমি জেনারেলকে কি বলবো?

বলবেন, তার নির্দেশনামা, আমি পেয়েছি।

কতক্ষণে স্টীমারের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেওয়া হবে?

কাল সকালের আগে নয়।

কিন্তু জেনারেল তো এখুনি চান। আরাতে ভয়ানক গোলমাল লেগেছে—সেপাইরা হয়তো পাটনার দিকে এগোতে পারে—তাদের ঠেকাতে এখুনি একটা রেজিমেণ্ট পাঠানো দরকার—

মানছি, কিন্তু যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে মাঝরাতে তাদের ডাঙায় ছেড়ে দেবার কোন এক্তিয়ার আমার নেই—।

এই অবস্থায় জেনারেল হয়তো তাই চাইবেন।

ক্যাপ্টেন এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন. জেনারেলকে বলবেন তার নিজের বিভাগ যেমন আইন মোতাবেক চলে আমাকেও তেমনি কোম্পানীর আইনের আওতায় চলতে হয়। কাল সকালের আগে স্টীমার তার হাতে তুলে দিতে পারছি না।

দপ্তরে বসেই খবর পেলেন জেনারেল। সকালের আগে তার যে কিছু করবার নেই সেই কথাটা ভেবে হতাশ হয়ে চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে দিলেন।

জগদীশপুরের জমিদারী বেদখল হয়ে যাবার পর কুনোয়ার সিং গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন! জগদীশপুরের জমিদারী তার কৌলিক মর্যাদার প্রতীক। রক্ত মাংসের মতো তার সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জগদীশপুরের মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন শালের জনপদ, সকাল-সন্ধ্যায় পাখিদের কাকলি উৎসব, মিছিল করে আসা রৌদ্র-শিশিরের কাল, পাল-পার্বন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন কুনোয়ার সিং। তার প্রাসাদের অলিন্দ থেকে টিয়া-পাখির ডানা মতো বিছিয়ে থাকা জগদীশপুরের দিকে তাকিয়ে তার বুক ব্যথায় টনটন করে।

এই মাটি যা' একদিন তার একান্ত আপন ছিল আজ পর হয়ে গেছে।

কতো দিন ঘুম ভেঙে জোছনার ঢল নেমেআসা জগদীশপুরের মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে বিনিদ্র চোখে তাকিয়ে থাকেন কুনোয়ার সিং।

ইতিমধ্যে মীরাটে আগুন লেগেছে। দিল্লি-বিদ্রোহে উতরোল হয়ে উঠেছে। উত্তর ভারতের একটার পর একটা সহর আগুনের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। দিগন্ত জুড়ে শুধু লাল আর লাল!

এক-একটা খবর আসে আর কুনোয়ার সিং বন্দীসিংহের মতো নিষ্ফল আক্রোশে প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে গুমরে ওঠেন।

এইসব অস্থির এলোমেলো দিন কুনোয়ার সিংকে ক্রমশ চঞ্চল করে তোলে। দু'চারজন লোক এদিক-ওদিক যা পাঠিয়েছিলেন তারা ফিরে এসে একই খবর শোনাতে লাগলো, কোম্পানীশাহী খতম হোনেবালী হ্যয়!

হতাশা কেটে গিয়ে কুনোয়ার সিংয়ের মধ্যে ক্রমশ একটা বিশ্বাস জেগে উঠছিল, যে শক্তি দিয়ে কোম্পানী তার জমিদারী কেড়ে নিয়েছে—শক্তির সেই আঘাত কোম্পানীর মুখের উপর ছুঁড়ে দিতে হবে!

কুনোয়ার সিং যেন বুকের মধ্যে রাজপুত বীরত্বের ঘুম-ভাঙানি ভাঁয়রো রাগ অনুভব করতে থাকেন। এক সময় তার মনে হল, আর নয় এবার এই নিভৃত কক্ষের নির্বাসন ছুঁড়ে ফেলে খোলা তলোয়ার হাতে লড়াইয়ের ময়দানে লাফিয়ে পড়তে হবে। হিন্দুস্থানের মাটিতে যারা লোভের দাঁত আর নখ

বিঁধিয়েছে তাদের খতম করার পরোয়ানা জটকে দিতে হবে জগদীশপুরের মাটিতে।

তবু কোথায় যেন দ্বিধা জড়িয়েছিল। নানা ভাবনার জটিলতা মিলেমিশে কুনোয়ার সিংকে সাময়িকভাবে নিরস্ত করে রেখেছিল।

এমন সময় পাটনা থেকে খবর এল, সাহেবরা বাবুজীকে ধরবার জন্তে ফৌজ পাঠাচ্ছে

খবর পেয়ে কুনোয়ার সিং ফুলকি-পড়া শুকনো ঘাসের মতো জলে উঠলেন, তা হলে কোম্পানী ভেবেছে জমিদারী কেড়ে নিযে কুনোয়ার সিংকে পঙ্গু করে দিয়েছি। এবার তাকে পাটনায় টেনে এনে ফাঁসিতে ঝোলাব। তারপর তার লাশ মুর্দাফরাসের দিকে ছুঁড়ে দেব।

ভাবতে পারেন না কুনোয়ার সিং শুধু অস্ফুট কণ্ঠে ফিসফিস করেন, সীয়ারাম —সীয়ারাম!

জমিদারী কেড়ে নেবার অবিচার ও অসম্মান নীরবে সহ্য করেছেন। এখন মরবার পর ত্রিলোকতারিণী গঙ্গার পবিত্র স্পর্শ টুকুও তারা পেতে দেবে না!—অসহ্য! কোন রাজপুত এ অসম্মান সহ্য করতে পারে না।

হাঁক দিলেন কুনোয়ার সিং, অমর সিং হাতিয়ার লাও—গাঁয়ে-গাঁয়ে ঢ্যাড়া দাও, জোয়ান মরদরা হাতিয়ার নিয়ে আসুক—

দিগ দিগন্তে ঢ্যাড়া দেবার লোক পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কুনোয়ার সিং।

এই সময় আরা ডিভিসনের বিদ্রোহী সেপাইরা জগদীশপুরের দিকে এগোতে লাগলো। তাদের নেতা নেই। জগদীশপুরে আছেন পুরনো খানদানের মানুষ কুঁয়োর সিং তাকে যদি নেতৃত্বে পাওয়া যায়! দ্রুত পায় পথ হাঁটে সেপাইরা। তাদের সঙ্গে প্রকাণ্ড এক সাদা ঘোড়া। বীর নায়ককে উপহার দেবার যোগ্য হয়রাজ।

বিদ্রোহী সেপাইদের নেতারা ঘিরে দাঁড়ালেন কুনোয়ার সিংকে। সিপাইরা বারবার তার নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো।

নেতারা বললেন, বাবুজী আপনি এগিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ান। আমরা আপনাকে অনুসরণ করব। কোম্পানীশাহীকে খতম করে তামাম হিন্দুস্থানে সাবেক শাহী দিন ফিরিয়ে আনতে চাই যাতে আমাদের জাত-ধর্ম আর নষ্ট না হয়— আমাদের দৌলত কেউ ছিনিয়ে না নিতে পারে—আমাদের ইজ্জত নিয়ে কেউ যাতে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।

ইতিমধ্যে নানা পথ ধরে মানুষ আসছে জগদীশপুরের দিকে; দলে দলে আসছে তারা। কেউ আসছে পায়ে হেঁটে, কেউ সোয়ার হয়ে।

দিগদেশের মানুষের মিছিল নেমেছে জগদীশপুরের পথে।

পতাকা উড়ছে হাজার হাজার, কাড়া-নাকাড়া বাজছে আকাশ কাঁপিয়ে, বন্দুকের শব্দ ছুটছে তীরের মতো এদিক-ওদিক আর মানুষের কণ্ঠস্বর জোয়ারের জলের মতো ছুটে চলেছে।

কতদিন বাদে কুনোয়ার সিং বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বিদ্রোহী সেপাইদের নেতারা। তারা তাঁকে নেতৃত্বের আহ্বান দিয়েছে। উত্তর দেন নি কুনোয়ার সিং।

তার উত্তরের জন্যে সময় বুঝি স্তব্ধ হয়ে আছে।

সমুদ্রের ঢেউ মাথা তুলেছে আছড়ে পড়বে মাটিতে।

অপেক্ষা, শুধু কুনোয়ার সিংয়ের উত্তরের অপেক্ষা!

এ এক পরম লগ্ন।

১৮৫৭'র বিহার কি ইতিহাস হবে না অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়বে!

হাজার-হাজার মানুষ কুনোয়ার সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কুনোয়ার সিং স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

তার মাথায় ভাবনা ঘূর্ণিঝড়ের মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। কত ক্ষয়-ক্ষতি, কত দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে দুর্গম এই তপস্যার অঙ্গীকার অটুট রাখতে হবে।

পাশে লক্ষ্মণের মতো ভাই অমর সিং। ভাই-পো রীতভঞ্জন সিং।

আরেক পাশে ষাট বছরের বন্ধু নিশান সিং। তহশিলদার হরকিষেণ সিং। অনুগত সুহৃদ দেল্‌ওয়ার হোসেন, সরনাম সিং।

জানা-অজানা নামের আরো কত মানুষ। কত মানুষের মুখ।

না, মুহূর্তের বেশি সময় লাগে নি কুনোয়ার সিংয়ের খাপ থেকে তলোয়ার টেনে হেঁকে উঠলেন, তুম্ লোক তৈয়ার হো তো হাম্ ভি তৈয়ার হয় !

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জিন আঁটা সফেদ ঘোড়ায় গিয়ে উঠলেন।

হাজার মানুষের জয়ধ্বনিতে বিহারের ঘুম ভাঙলো।

দিল্লি-লক্ষ্ণৌ-বেরেলি-কানপুর-মীরাটের সঙ্গে একই সুতোয় বাঁধা পড়লো জগদীশপুর।

সত্তর বছরের জীর্ণ বুকে থেকে অপরাজেয় এক রাজপুত্র বীরত্ব বেরিয়ে আকাশের গায় মাথা রেখে দাঁড়ালো।

না, কুনোয়ার সিং আর পিছন ফিরে তাকালেন না। পড়ে রইলো জগদীশপুর প্রাসাদ, সাজানো সংসার, অসমাপ্ত মন্দির, আর শৈশবের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, যৌবনের বিহারভূমি জগদীশপুর!

ডানবারের নেতৃত্বে জবরদস্ত বাহিনী বিদ্রোহী ফৌজকে সামলাতে স্টীমারে করে এগিয়েছিল, তারা মাঝ পথে খবর পেল; বিদ্রোহীরা আরার দিকে এগোচ্ছে।

ক্যাপ্টেন ডানবার ভাববার সময়টুকু নিলেন না। স্টীমার নোঙর করার নির্দেশ দিলেন।

সময়টা তখন সন্ধে।

চকচকে একটা আলোর আভাস শোনের কালো জলে কেঁপে উঠছে তীরের গা বেয়ে পাহাড় টিলা জঙ্গলের পরিলিখনে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। এপারে ওপারে নির্জনতা হাঁসের মতো ডানা গুটিয়ে চরে নেমেছে।

গোরা সৈন্যরা রাইফেল বাগিয়ে নেমে পড়লো দর্পিত পদক্ষেপে।

যদি ক্যাপ্টেন ডানবার স্টীমার থেকে নামবার আগে একটু অন্তত ভাবতেন, জায়গাটা জগদীশপুরের কাছাকাছি হয়তো এর ঘাঁত-ঘোঁত কুনোয়ার সিংয়ের জানা থাকতে পারে। তা'হলে হয়তো ডানবারের ভাগ্যে এত বড় একটা পরাজয় লেখা হতো না।

শোনের খাত থেকে উঠে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খানিকটা এগোতে একটা পাহাড়ি এলাকা পড়ল। দুপাশে উঁচু পাহাড়ের সার মাঝখান দিয়ে পথ। সেই পথের মাঝামাঝি পৌছুতে পেরেছিলেন ডানবার—হঠাৎ গুলির ঝাক নেমে এলো তার বাহিনীর ওপর। ডানবারের বাহিনীও কিছু কম যায় না। তারাও গুলি চালাতে লাগলো।

গাঢ় অন্ধকারে, সামনে থেকে—পিছন থেকে-পাশ থেকে ওৎ পেতে থাকা বন্দুক গুলির ঝাক নামিয়ে দিতে লাগলো। গুলি তো নয় সাক্ষাৎ মৃত্যু!

ডানবার সহজে হঠবার লোক নয়। তার বুঝতে অসুবিধে হল না. বিদ্রোহী সিপাইরা তার স্টীমারের ওপর নজর রেখেছিল আর এখানে নামতেই তাকে ঘিরে ধরেছে। পাহাড়ের খাজে খোঁজে সুবিধামত জায়গা থেকে তারা গুলি ছুঁড়ছে।

এই গিরিখাতটা পার হতে পারলে সুবিধে মত জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়ে যাওয়া যেত।

ডানবার তার দলবল নিয়ে এগোতে চেষ্টা করতে গুলি যেন মুষলধারে পড়তে লাগলো। সহযোগীরা বললো, এখানে দাঁড়িয়ে মরবার চেয়ে পিছু হঠা ভালো।

সেই ভালো। ডানবার আহতদের নিয়ে সরে এলেন কিন্তু স্টীমারে উঠতেও সাহস পেলেন না। গুলির বহর দেখেই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন বেশ বড় একটা দলের সঙ্গে তার পাঞ্জা কষতে হচ্ছে। সুতরাং সরে এসে ডানবার শালের এক বিস্তীর্ণ অরণ্য অংশে রাতের মতো আশ্রয় নিলেন। কাল সকালের আলোয় যা হোক করা যাবে।

ডানবার নিজে সেন্ট্রি পোস্টে পাহারায় থেকে সারারাত বিদ্রোহীদের চোরা গোপ্তা গুলির মোকাবেলা করবেন। বিদ্রোহীদের বন্দুক ডানবারের এনফিল্ড রাইফেলের মুখোমুখি হতে সাহস করলো না। তাই প্রাণে বেঁচে গেলেন ডানবার। গতিক খুব সুবিধে নয় এটা আগে থাকতে বুঝে নিতে তার অসুবিধে হয় নি তাই ঠিক করলেন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে স্টীমারে গিয়ে উঠবেন।

পরদিন সকালেও ডানবার সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাৎ অপসরণ করতে পারলেন না। বিদ্রোহীদের গুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তার সৈন্যরা ছুটোছুটি করতে লাগলো। ছুটোছুটি করেও তারা রেহাই পেল না—অনবরত গুলির ঝাঁক এসে তাদের ওপর পড়তে লাগলো। যারা পালাতে পারলো তাদের মধ্যে মাত্তর পঞ্চাশ জন অক্ষত শরীরে স্টীমারে গিয়ে উঠতে পারলো। আর যে দু'শ পঞ্চাশ জন আহত অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছিল তাদের অন্তত একশ জনের ঘা বিষাক্ত হয়ে গেল।

ডানবার নিজে দু'বার অন্তত ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে মাথা তুলে গুলি করতে গিয়ে এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলেন।

শুধু মাত্র স্টীমারটা নোঙর তুলে মাঝ নদীতে ভেসে পড়বার পর ডানবার বুঝলেন, প্রাণটা এ'যাত্রা কোন রকমে বেঁচে গেল।

ডানবারের এই বিপর্যয়ের কাহিনী বয়ে নিয়ে স্টীমার পাটনা পৌঁছলে সেখানে তুমুল সোরগোল পড়ে গেল।

টেইলরের মতো দুঁদে কমিশনারও বেসামাল হয়ে সমস্ত জেলা অফিসারদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাটনা চলে আসার নির্দেশ দিলেন। তা ছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর পাঠালেন, আরাতে বিদ্রোহীদের আক্রমণ আসন্ন সুতরাং সব রকম সর্তকতা অবলম্বন করতে যেন বিলম্ব করা না হয়।

টেইলরের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্র আরায় যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করা হল। ইংরেজদের পরামর্শ সভা বসলো, সেখানে নারী আর শিশুদের রাতারাতি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—আর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের দানাপুর পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বিদ্রোহীরা কুনোয়ার সিংয়ের নেতৃত্বে আরার দিকে এগোচ্ছে শুনে 'আংরেজ কা গোলাম বাঙালী' বিহারী-হিন্দু-মুসলমান আরা ছেড়ে সরে পড়লো।

আরাতে যারা রইলো সেই-সব ইংরেজ আর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা একটা শক্ত ঘাঁটির খোঁজে সহর তোলপাড় করে তুললো। শেষে রেলের ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার বয়েলের বাড়িটাকে বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘাঁটি করে তুললো। কিন্তু

অসামরিক ইংরেজদের অনেকেই, এই ঘাঁটি বিদ্রোহীদের আক্রমণ ঠেকানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে তড়িঘড়ি দানাপুরে চম্পট দিল।

টেইলর আরাকে একেবারে অসহায় না রেখে জনা পঞ্চাশেক শিখসৈন্য পাঠালেন।

তখন পনেরো জন ইংরেজ আর পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্য মিষ্টার বয়েলের বাড়িটাকে ছোট্টখাট্টো দুর্গ বানিয়ে দুরুদুরু বুকে আশ্রয় নিল।

ইতিমধ্যে একজন সোয়ার এসে খবর দিল, বিদ্রোহীদের যে অংশটা নদীর ওপার ছিল তারা শোণ পেরিয়েছে।

এবার যে কুনোয়ার সিং আরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ কি!

কুনোয়ার সিংয়ের নাম শুনে আরা বুঝি নিথর হয়ে এল। শুধু তার বুকের ভিতর ভয় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

তারিখটা ২৭ জুলাই।

বাজপাখির মতো আরার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুনোয়ার সিং। তার ঘোড়-সোয়ারেরা শহরের বুকের উপর দুরন্ত তৎপরতায় ছুটে বেড়ালো। ট্রেজারি লুঠ হল—বন্দীশালার গারদ ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হল। কোম্পানী শাসনের যা কিছু চিহ্ন ছিল ভেঙে-চুরে তচনচ হয়ে গেল। আরার বুকে কুনোয়ার সিংয়ের পতাকা উড়লো পত-পত করে।

কুনোয়ার সিংয়ের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় এমন সাহস কারো ছিল না।

সাদা ঘোড়ার পিঠে সকলের মাথার উপর মাথা তুলে সত্তর বছরের নায়ক আরার ওপর নিজের অধিকার কায়েম করলেন।

টুকরো দু'একটা সংঘর্ষ হয়েছিল বটে তাতে গোরারা ঝড়ের সামনে খড়ের টুকরোর মতো উড়ে গেল।

না, উড়ে যেতে পারেনি। সবাই গিয়ে মিষ্টার বয়েলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল।

আরা দখল করে কুনোয়ার সিং ঢোল সহরৎ করলেন, ফিরিঙ্গি-গোরা-হিন্দু-মুসলমান-বাঙালিবাবু ইচ্ছে করলে শহর ছেড়ে যেতে পারে—আবার থাকতেও পারে। কারো কোন ক্ষতি করা হবে না।

অকারণে নরহত্যা নিষিদ্ধ হল। রসদের প্রয়োজন ছাড়া লুঠ-পাটও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সারা আরা শহর কুনোয়ার সিংয়ের দখলে এলেও কোম্পানীর লোকেরা রেলের ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার বয়েলের বাড়িতে নকল কেল্লা পেতে পাহারা দিতে লাগলো। ভিতরে বন্দুক উঁচিয়ে রইলো পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্য আর পনেরো জন ইউরোপীয়।

বিদ্রোহীরা দুটো পুরনো কামান টানতে-টানতে নিয়ে গেছিল। কত দিন ব্যবহার হয়নি কে জানে। আগে পেতলের দরজা লাগানো হয়েছিল। আর পেটা লোহার গোলা ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেই দুটোকে সামনে বসিয়ে গোলা দেগে অবরোধ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিদ্রোহীরা সাদা বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছিল না—কেননা তাগ-করা এনফিল্ড রাইফেল জানলা কিংবা ফাঁক-ফোঁকরে মাথা বের করে আছে। তবু বিদ্রোহীরা এক-একবার মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো আর ভিতর থেকে ছুটে আসা রাইফেলের গুলি তাদের আক্রমণকে ঝাঁঝরা করে দিতে লাগলো, টারা-রাট-টা-টারা-রারা-রা। রা-রা।

কয়েকদিন ধরে অবরোধ চললো। ঘাঁটির ভিতরের অবরুদ্ধদের কিছুতে দমানো গেল না। তারা মরিয়া হয়ে ঘাঁটি আগলাতে লাগলো।

শেষে সিপাইরা নিরুপায় হয়ে তাদের পাঞ্জাবী ভাই-বেরাদরদের কাছে আবেদন করলো, ভাইসাহিব, কেন তোমরা এইসব পরদেশী গোরাদের হয়ে লড়াই করছো—ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে এসে—আমাদের সঙ্গে সামিল হও। আমরা মিলেমিশে তামাম হিন্দুস্থানে কোম্পানী-রাজ খতম করি। কোম্পানী তোমাদের রাজ্যপাট কেড়ে নিয়েছে—রাজপুত্রকে বিলায়েৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দুশমনরা দাঁত আর নাখুন দিয়ে হিন্দুস্থানকে কবজা করেছে—বেইজ্জত করেছে। দাঁত দিয়ে গরু আর শুয়োরের চর্বি-মাখানো কার্টুজ কাটিয়ে আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে। তোমরা এখনো কি এই দুশমনদের গোলামি করবে।

অন্যপক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মিষ্টার বয়েলের বাড়ির চারপাশে সিপাইরা সারা দিন সারা রাত চিৎকার আর হল্লা করতে লাগলো।

শেষে সিপাইরা লোভ দেখালো, আমাদের দলে এসো তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচশ' করে টাকা দেব।

শিখরা বধির। এই সব পুরবিয়া সেনাদের প্রতি তাদের অসীম আক্রোশ। এরাই ইংরাজদের হয়ে লড়াই করে তাদের শিখরাজত্ব ছারখার করে দিয়েছে। ফিরোজশাহও সব্রাঁও-এর যুদ্ধের স্মৃতি তারা এখনো ভোলেনি। শতদ্রুর এপার-ওপার দু'পারের বাদশা যে আজ ইংরেজরা—সে তো এই পুরবিয়া সৈন্যদের ক্ষমতায়!

কোন সহযোগিতা নয় এদের সঙ্গে।

সুতরাং বিদ্রোহীদের আবেদন-নিবেদন সব ব্যর্থ হয়ে গেল। উপরন্তু আক্রান্তদের এমনই সৌভাগ্য, জমাদার হুকুম সিং নামে এক অদম্য শিখ তাদের সঙ্গে ছিল।

দুর্গ-বাড়ির জল যখন ফুরিয়ে এল তখন আত্মসমর্পন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না আর তাই হয়তো করতে হত, কিন্তু হুকুম সিং সবাইকে আশ্বস্ত করলো, ঘাবড়াইয়ে মৎ— তারপর সে তার সহযোগীদের নিয়ে সেই বাড়ির ভিতর ১৮ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে কুয়ো বানিয়ে জলের সমস্যার সমাধান করে দিল

অবরোধ আর সরে না।

বিদ্রোহীরা মিষ্টার বয়েলের বাড়ির চারপাশে মাটি কামড়ে পড়ে রইলো। এনফিল্ড রাইফেলের পাল্লার মধ্যে তারা এগোতে পারছে না বটে কিন্তু সরেও যাচ্ছে না।

দুর্গের খাবার ফুরলো। শুধু জল খেয়ে তো বাঁচা যাবে না। এখন উপায়।

জমাদার হুকুম সিং আশ্বাস দিল, কুচ্ পরোয়া নেহি -

রাতের অন্ধকারে সঙ্গী-সাথী নিয়ে বাইরে বেরিয়ে ভেড়া জোগাড় করে নিয়ে এল। আর একদিন সেপাইরা সুরঙ্গ কেটে মিষ্টার বয়েলের বাড়ির ভিতর প্রায় ঢুকে পড়েছিল জমাদার হুকুম সিং ও তার বিনিদ্র প্রহরীরা ধরে ফেললো। সুড়ঙ্গের পথ আটকে ইংরেজদের বাঁচালো।

কুনোয়ার সিংয়ের অবরোধের ভিতর যখন পনেরো জন ইংরেজ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, শিখ পাহারাদারি তখন অবিচল দৃঢ়তায় মিষ্টার বয়েলের বাড়ির নকল কেল্লা রক্ষা করে চলেছে।

এলাহাবাদ যাচ্ছিলেন ভিনসেণ্ট আয়ার। আফগান যুদ্ধ খ্যাত এই সেনানায়ককে গোয়ালিয়র বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বক্সার যাবার পথে আরার পাশে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, ক্যাণ্টনমেণ্টের ওপর আগুনের শিখা দাপাদাপি করছে। বহু যুদ্ধের পোড়-খাওয়া লোক তিনি, আরায় কি ঘটছে সেটা বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে নি। সাহসী ও সুদক্ষ এই যোদ্ধা ভেবেছিলেন ঝাঁপিয়ে পড়বেন এই আগুনে কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন। অন্ধ বীরত্ব দেখাতে গিয়ে কী ভয়ানক ফল পেতে হয় তার নিজের চোখে অনেক দেখা আছে।

নিঃশব্দে তাই সরে গেলেন। এত অল্প সৈন্য নিয়ে হঠকারিতা করা ঠিক নয়।

ভিনসেণ্ট আয়ার তার দলবল নিয়ে বক্সারে গিয়ে পৌছলেন তারপর গঙ্গা পেরিয়ে আফিম বিক্রির আড়ৎ গাজিয়াবাদ গিয়ে হাজির হলেন। সেইখানে পৌছে খবর পেলেন একদল বিদ্রোহী এদিকে এগোচ্ছে।

ভিনসেণ্ট আয়ার ভারি মুশকিলে পড়ে গেলেন। বিদ্রোহীরা এদিকে এসে পড়ার আগে কিছু একটা করা দরকার।

আয়ার যে কিছু করে উঠতে পারবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু হঠাৎ তার ভাগ্যের চাকা গেল ঘুরে।

পাটনা যাবার পথে ক্যাপ্টেন এস্‌ট্রেঞ্জ তার রয়্যাল স্কট ফিউজিলিয়ার নিয়ে গাজিয়াবাদে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে কয়েকটা নাক-ভোঁতা কামান। রোহিলারা ছাড়া স্কট গোলন্দাজের সমকক্ষ যোদ্ধা এদেশে তখন ছিল না।

আয়ার দেরি করলেন না। দুই বাহিনী একত্র করে আরার দিকে যাত্রা করলেন। ডানবারের পরাজয়ের কথা তার মনে ছিল। কুনোয়ার সিংকে কিছুতে পাহাড়-টিলা ঝোপঝাড়-জঙ্গলের সুবিধে নিতে দেওয়া হবে না—খোলা মাঠে কামানের সামনে ফেলে উড়িয়ে দিতে হবে। ঝড়ের বেগে এগোতে লাগলেন আয়ার।

বিদ্রোহীদের একটা দল এগিয়ে এসেছিল—তারা আচমকা বেপরোয়া আঘাত হানলো। ঝড়ের ঝাপটা বুঝি আয়ারের বাহিনীকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। এমন আক্রমণের চাপ সহ্য করা কঠিন!

আয়ার আর এস্‌ট্রেঞ্জের মিলিত বাহিনী কিন্তু সহ্য করলো। প্রাণের দায়ে তারা যেন মাটি কামড়ে আক্রমণের ধাক্কা সামলালো। কেননা, তারা জানতো, পিছু হঠার অর্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সুতরাং লড়াই করে মরাই ভাল। কুনোয়ার সিংয়ের হাতে ডানবারের বাহিনীর যে অবস্থা ঘটেছিল পুবের সব ক্যাণ্টনমেণ্টের গোরা সেপাইদের তা ভালো করেই স্মরণ ছিল।

বিদ্রোহীদের প্রথম আক্রমণের ধাকাটা সামলে গোরা সিপাইরা পালটা আক্রমণ করলো। প্রত্যেকটা গোরা সেপাই ছিল যেমন জবরদস্ত লড়িয়ে আর গোলন্দাজেরা ছিল তেমনি গোলা দাগায় বড়—যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় একেবারে পাকাপোক্ত। তাদের হাতের রাইফেল গর্জে উঠলো— কামানের মুখ আগুনের গোলা উগরে দিতে লাগলো।

শান্ত নির্জন গঙ্গার এপার-ওপার চমকে উঠলো।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পশ্চিম দিগন্তে ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘের ফাঁকে ম্লান সূর্যাস্তের আলো রোগ পাণ্ডুর মুখের ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ধূসর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

গাদা বন্দুক আর বীরত্ব দিয়ে যতক্ষণ লড়াই করা যায় বিদ্রোহী সেপাইরা তার থেকে বেশী সময় ইংরেজদের আটকে রেখে এগোতে দেয় নি।

সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতে বিদ্রোহীরা গা ঢাকা দিল। তাড়া করলে হয়তো তাদের ধরা যেত কিন্তু আয়ার সাহস করলেন না। কি জানি এদের পেছনে যদি বড় কোন দল থাকে তাহলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।

কারো-কারো ইচ্ছে ছিল, সিপাইদের তাড়া করে ধরা হোক।

না। দৃঢ় নির্দেশ দিলেন আয়ার, কাল সকালে দেখা যাবে—এখন বিশ্রাম করতে যাও—

অত্যন্ত সতর্ক পাহারার মধ্যে আহতদের শুশ্রূষা চলল, মৃতদের মাটি চাপা দেওয়া হল, আর যারা যুদ্ধের উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল তারা খোলা আকাশের তলায় কামানের গায় হেলান দিয়ে কিংবা হাতের মুঠোয় রাইফেল রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করলো।

পরের তারিখটা ২রা আগস্ট।

বিদ্রোহীদের মূল বাহিনী কুনোয়ার সিংয়ের অধিনায়কত্বে বিবিগঞ্জের কাছে পথ আটকালো।

কুনোয়ার সিংয়ের মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়াতে হল আয়ারকে।

সন্ধের ছায়া নেমে এসেছে বিবিগঞ্জের পথে-প্রান্তরে।

একটু আগে বিষ্টি হয়ে গেছে। স্যাঁতসেঁতে একটা আবহাওয়া শ্রাবণ-ভাদ্দরের গুমোট গরমে স্থির হয়ে আছে।

আয়ার প্রমাদ গুণলেন। ইউরোপীয়দের পক্ষে অসহ্য এই আবহাওয়া। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। শরীরের রক্ত বুঝি ঘাম হয়ে বেরিয়ে আসে। সময় দরকার এখন, একটু সময় চাই। মনে মনে ভাবলেন আয়ার। এরই মধ্যে কামান সাজিয়ে নিতে হবে, সৈন্যদের পজিসনে দাঁড় করাতে হবে। সঙ্গে পর্যাপ্ত রাম্ ছিল তাই সৈন্যদের মধ্যে ঢালাও বিলি করলেন।

সামনে কুনোয়ার সিং যেন অন্ধকারে জমাট পাথরের মতো তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

সেদিকে তাকিয়ে আয়ারের মতো পোড়-খাওয়া লোকের বুকও দুরদুর করে ওঠে।

না, ইচ্ছে মতো সময় পেলেন না আয়ার তার আগেই অন্ধকারে জমাট বাঁধা পাথরের চাঁই হঠাৎ যেন ভেঙে-চুরে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

দুরন্ত এক আক্রমণের মুখোমুখি হতে হল আয়ারকে!

কুনোয়ার সিংয়ের ঘোড়সোয়ার আর পদাতিকরা দু'পাশ থেকে চাপ দিয়ে

আয়ারের বাহিনীকে চেপ্টে দেবার চেষ্টা করলো। স্কট্ ফিউজিলিয়ারদের কামান ছিল আয়ারের সবচেয়ে বড়ো সহায়। হাল-ফিল দেশ থেকে আসা এই বাহিনীর দক্ষতা একেবারে আনকোরা। মুহুর্মুহু কামান দেগে তারা কুনোয়ার সিংয়ের আক্রমণ থেঁতলে দিতে লাগলো।

মশালের লাল আলোয় অন্ধকার যেন বিকট দর্শন দানবের মুখ। সেই দানবের মুখ যেন অনবরত শত্রু সৈন্য উগরে দিচ্ছে। কাতারে-কাতারে ছুটে আসছে তারা বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে

প্রচুর গেঁয়ে-লোকের ভিড় কুনোয়ার সিংয়ের দলে, সেইটুকুই যা আয়ারের ভরসা।

বিশাল এক ঘোড়ায় চড়ে কুনোয়ার সিং তার বাহিনীকে পরিচালনা করছেন। সেপাইরা কেউ মরতে ভয় পাচ্ছে না—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি। পড়ি গেল কাড়াকাড়ি!

আহত ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, উন্মত্ত সৈন্যের হুঙ্কার, কামানের গর্জন আর বন্দুক-রাইফেলের শব্দ মিলে রাত্রির প্রথম প্রহরে বিবিগঞ্জের মুখের যেটুকু দেখা গেল তাতে নিষ্ঠুর জিঘাংসার পরিলিখন ফুটে উঠেছে।

কুনোয়ার সিং যখন তার পুরোবাহিনী নিয়ে আছড়ে পড়লেন তখন তুমুল হাতা-হাতি লেগে গেল। রয়্যাল স্কট গোলন্দাজ বাহিনীর অনেকেই রাইফেল তুলে বেয়েনট চার্জ করলো।

কুনোয়ার সিং বোধহয় ভেবেছিলেন, ডানবারের মতো আয়ারকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবেন আর সেটাই ছিল তার নিশ্চিন্ত ভুল। যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ভূস্বামী প্রয়োজনে হাতিয়ার তুলে এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন, শুধু মাত্র সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে যে-কোন যুদ্ধ জেতা যায়।

অন্যদিকে স্যাণ্ডহার্স্টের সমর বিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সঙ্গে উৎরে আসা ভিনসেন্ট আয়ারের কাছে, যুদ্ধ একটি বিজ্ঞান; তার তত্ত্ব এবং সফল পরিচালনার অভিজ্ঞান তার আয়ত্তে। সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করে আয়ার তার গোলন্দাজবাহিনী দিয়ে কুনোয়ার সিংয়ের সেনাবিন্যাসের দুর্বল দিকটা তচনচ করে দিলেন।

দেহাতি মানুষ যারা লড়াই করতে এসেছিল তারা মারের দাপট সহ্য করতে না-পেরে ছত্রখান হয়ে গেল। আর সেই বিপর্যস্ত মানুষের মৃতদেহের উপর দিয়ে আয়ার যুদ্ধ ফতে করে আরার দিকে যাত্রা করলেন।

এক রাত্রির লড়াইতে আরা মুক্ত হল; আরায় আবার কোম্পানীর নিশান উড়লো। গর্বিত গোরার উদ্ধত কুচকাওয়াজে মাটি কেঁপে উঠতে লাগলো।

এই জয়ের দাম আরা বাসীকে সুদে-আসলে দিতে হল। কোম্পানীর ফৌজ খ্যাপা নেকড়ের মতো শহর ঢুঁড়ে সন্দেহজনক যাকে পেল ধরে এনে ফাঁসিতে ঝোলালো।

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শহরবাসীকে নেমন্তন্ন করে সেই ফাঁসি দেখান হল; গোরা-ফিরিঙ্গিরা বিবিদের নিয়ে সেজেগুজে সেই ফাঁসি দেখতে গেল।

বিচার সভা বসল। নামে-মাত্তর বিচার হল।

বিচারক বিচার হবার আগেই মনে-মনে ফাঁসির হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন। কাউকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেয়া হয় নি। যাদের ফাঁসি দেওয়া হল, তাদের কেউ-ই মার্জনা বা অন্য কোন সুবিধের জন্য আবেদন করে নি

হ্যাঁ, একটি আবেদন তারা সকলেই করেছিলেন মায় আপ্‌নি খুশিসে গলে মে ফাঁসিকা ফান্দা পহনা চাহতা হুঁ।

কুনোয়ার সিং তার বিধ্বস্ত বাহিনী নিয়ে জগদীশপুরের দিকে ফিরলেন। জগদীশপুর তার সাত পুরুষের ভিটে--একবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে আয়ারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তাগৎ জোগাড় হয়ে যেত।

আয়ারের এটা জানা ছিল। তাই আয়ার তাকে সে সুযোগটা দিতে রাজি হলেন না। আয়ারের বাহিনী ইতিমধ্যে আরো পুষ্ট। নতুন হাতিয়ারে আরো হিংস্র। আরো নির্মম!

কুনোয়ার সিং যদিও জানতেন, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত বাহিনী নিয়ে বাধা দিয়ে বিশেষ সুবিধে করা যাবে না তবু জগদীশপুরের মাটিতে আয়ারকে বাধা দিলেন। আর সে যুদ্ধও হল এক তরফা। যারা বাঁধা দিল মাটিতে শয্যা নিতে হল তাদের।

আয়ার যে এত তাড়াতাড়ি এসে হানা দেবে বুঝে উঠতে পারেন নি কুনোয়ার সিং।

আয়ার জগদীশপুরে পা দিয়ে আরো কঠিন আরো কঠোর এক প্রশাসনের কর্তা হয়ে বসলেন।

দারুণ এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েমী হয়ে বসলো জগদীশপুরের বুকের ওপর। যারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল বাঁচলো শুধু তারাই!

আয়ারের ঘাতক বাহিনী জগদীশপুরের মাটিতে যাদের বন্দুকের নলের পাল্লায় পেল গুলি করে মারলো। নারী-শিশু-বৃদ্ধের বাদবিচার করেনি এব্যাপারে!

কতজনকে ধরে বটগাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিল। যাদের দুর্ভাগ্য তারা এই ঘাতকদের বেওনেটের পাল্লায় পড়ে নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করে মরলো।

জগদীশপুরের যন্ত্রণা তখনও শেষ হয় নি।

গ্রামের বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল গোরারা। রাজপুত-ভূঁইহার-গোয়ালাদের বাড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তাতেও আয়ার সাহেবের রাগ পড়ে না। শেষে সবগুলো হাউটজার কামান এনে জগদীশপুরের প্রাসাদের চারপাশে বসিয়ে আদেশ দিল, ফায়ার—ফায়ার—

আগুনের গোলা ছুটে গিয়ে রাজপুত সিং দের শতাব্দী-প্রাচীন প্রাসাদের গায় আঘাত করলো। যতক্ষণ না মুখ থুবড়ে পড়লো ততক্ষণ সমানে গোলা দেগে যাওয়া হল।

প্রাসাদের এক-একটা অংশ ভেঙে পড়ে আর গোরারা পিশাচের মতো উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে।

জগদীশপুরের অধিবাসী যারা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তারা সজল চোখে দেখলো, তাদের কত দিনের সুখ-দুঃখের সাক্ষী সেই প্রাচীন প্রাসাদ ভেঙে চুরে পড়ছে।

হত্যা আর ধ্বংশের উৎসবে মেতে উঠেছিল আয়ার আর তার সঙ্গীরা।

প্রথমে গ্রামবাসীদের হত্যা করলো তারপর তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিল—শেষে সিং-দের প্রাসাদ ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। হয়তো তারা চেয়েছিল জগদীশপুর থেকে কুনোয়ার সিংয়ের নাম টুকু মুছে দেবে।

ধর্মপ্রাণ কুনোয়ার সিং বিশাল এক মন্দির গড়ে তুলেছিলেন। রাজস্থানী মর্মর পাথরে দক্ষ স্থপতিরা নয়নের আনন্দ অনিন্দ্য এই দেবালয় পাথর কেটে রূপ দিচ্ছিল।

বিগ্রহ তখনও স্থাপিত হয়নি।

আয়ারের সব রাগ গিয়ে পড়লো সেই মন্দিরের উপর, সভ্য ইংরেজ দেবস্থানকে মার্জনা করলো না, কামানের নৃশংস গোলার আঘাত সেই শুভ্র সৌন্দর্যকে নির্বিচার আক্রোশে হত্যা করলো।

সেদিন কি জয়দর্পী ইংরেজদের মনে একবারও উঁকি দিয়েছিল, আরা অবরোধের সময় পনেরোটি ইংরেজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার বেশ কিছুদিন কুনোয়ার সিংয়ের হাতের মুঠোয় ছিল, ইচ্ছে করলেই কুনোয়ার সিং নির্মমভাবে তাদের হত্যা করতে পারতেন! অথচ কুনোয়ার সিংয়ের ঔদার্য ও সতর্ক দৃষ্টি তাদের অক্ষত আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিল। ভাগ্যের পরিবর্তনে সে কথা মনে রাখা হয়তো সভ্যতার নিদর্শন নয়!

জগদীশপুর ধ্বংস হয়ে যাবার পর কুনোয়ার সিং দলবল নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আয়ারের বাহিনী সেখানেও তাকে শান্তিতে থাকতে দিল না। কাজেই

অনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ সম্বল করে পথে বেরিয়ে পড়তে হল। এখন দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু পার হবার পথযাত্রা শুরু হল।

বিস্তীর্ণ শোণে'র ধারাপথ ধরে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগলেন কুনোয়ার সিং—তারপর চড়াই ভেঙে রোটাস পাহাড়ের উপরে প্রাচীন এক নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গিয়ে হাজির হলেন। তার লোক-লস্করের পক্ষে পর্যাপ্ত এই মালভূমি বিশ্রামের পক্ষে নিশ্চিন্ত আশ্রয় বলে মনে হল। বিপর্যস্ত শরীর ও মন দুই এখন সারাবার দরকার আর সে জন্যে এই রকম আশ্রয়ই প্রয়োজন ছিল।

শিলাখণ্ডের ওপর আসন পেতে শোণনদের বিশাল জলধারার দিকে চেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন কুনোয়ার সিং।

জগদীশপুরকে তিনি কিছুতে ভুলতে পারেন না। শোণের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, এই-সেই শোণ সাহাবাদ-জেলার গা-ছুঁয়ে জগদীশপুরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। দীর্ঘনিশ্বাসে তার বুক ভরে ওঠে। এই বয়েসে তার আর তো কোন বাসনা ছিল না।

যে-মাটিতে জন্মেছেন সেই মাটিতে শুয়ে চিরকালের মতো গভীর প্রশান্তিতে ডুবে যাবার অলৌকিক এক অনুভূতি তাকে মগ্ন করে রেখেছিল।

কখনো পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবে যায়।

রোটাস গড়ের প্রাচীন ধ্বংসের ওপর রাত নেমে আসে। প্রাচীন বনস্পতির ডালে-পাতায় বাতাসের প্রগলভ উচ্ছ্বাস মর্মারত হয়ে ওঠে। অসংখ্য জোনাকি বিধ্বস্ত দুর্গ-প্রাঙ্গনের ভগ্ন কক্ষে অলিন্দে বাতায়নে ক্ষণিক প্রদীপ জ্বালে।

সেই অন্ধকারে ভাঙাচোরা পাথরের রাশ সহসা তার চোখে বুঝি সজীব হয়ে ওঠে :

পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের ছেলে রোহিতাশ্বের নামাঙ্কিত রোটাস গড় একদিন জয়স্পর্ধিত সমারোহে পতাকা উড়িয়ে আকাশ ছুঁতে চেয়েছে। কত সুখ-দুঃখ, কত অনুভব কত হাসি-কান্না এই পাথরের বুকে ফুল হয়ে উঠেছে।

আর আজ, কী করুণ কী বিষণ্ন নৈঃশব্দ্য রোটাস গড়কে চিরকালের মতো গ্রাস করেছে।

জগদীশপুরের সঙ্গে রোটাস গড়ের কোথায় যেন মিল আছে! আজ তার জন্মভূমির জন্যে চোখের এক ফোঁটা জল ফেলাবারও কেউ নেই। সাতপুরুষের ভিটে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার সাধের দেব-মন্দিরেরও সেই অবস্থা—জগদীশপুরের অধিবাসীদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে গ্রাম-ছাড়া করা হয়েছে। প্রতিবেশি আত্মীয়-পরিজন সবাই গৃহহারা।

কুনোয়ার সিংও বাসভূমি থেকে পরবাসী। যে-মাটি অন্ন জোগায় সে তো মায়েরই সমান! সেই মাকে যারা লাঞ্ছনা দেয়, অপমান দেয় তার বিরুদ্ধে কি চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করবার নেই।

পাশে-রাখা তরবারিতে হাত দিলেন কুনোয়ার সিং তাঁর জরাবিদ্ধ শরীর ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ঋজু হয়ে উঠলো। হাঁক দিলেন, অমর সিং—নিশান সিং—হোঁশিয়ার হোসেন।

রাত পোহাবার আগেই কুনোয়ার সিং পাহাড় থেকে নেমে এলেন। একটু দূর দিয়ে গেছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সেই পথ দিয়ে অনবরত কোম্পানীর লোক-লস্কর রসদ পত্তর, যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র যাতায়াত করে। এই পথের দুপাশে গভীর অরণ্যের বসতিহীন বিস্তার।

কুনোয়ার সিং তার বাহিনীকে কয়েক ভাগে ভাগ করে এই পথের ব্যাপক এলাকা জুড়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইলেন। আর সরকারী রসদ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যাতায়াত দেখলেই ঝাপিয়ে পড়ে লুঠপাঠ সুরু করে দিলেন।

জগদীশপুরের শেরের ভয়ে সাসারাম থেকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মাল চলাচল লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল দুচার দিনের মধ্যেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হয়ে গেল ফাঁকা। মানুষ-জনের আনাগোনা একেবারে বন্ধ।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ফিরিঙ্গি হিন্দুস্থানী কেউ ভয়ে মাড়াতে চায় না। সবাই বলে, শের নিকলা—শের নিকলা—

হামেশাই মাল-পত্তর লুঠ হতে লাগলো। হররখৎ খুনজখমের কারবার চলতে লাগলো। এসবই হতে লাগলো শুধু কোম্পানীর ওপর।

কোম্পানী যে সব টহলদারী সেনাদল পাঠিয়েছিল জঙ্গল এলাকায় তারা একেবারে লা-পাত্তা হয়ে গেল

কোম্পানীর খয়ের খাঁ শাহ কবীরুদ্দিন খবর পাঠালো, এলাকাটা কুনোয়ার সিংয়ের লোকজনের হাতে চলে গেছে। এখন রসদপত্তের চলাচল ঠিক হবে না।

এই হানাদারির কাজে ব্যস্ত থাকতে-থাকতে কুনোয়ার সিংয়ের মনে হল, বিহারের মাটিতে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন—হিন্দুস্থানকে শাসন করবে তার হিসেব-নিকেশ হবে উত্তর ভারতের মাটিতে। গঙ্গার নিচের দিকে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের কোন গুরুত্ব নেই। ভারতের কেন্দ্রভূমি দিল্লি সেখানেই যাওয়া দরকার। যতোটুকু সামর্থ আছে তাই দিয়ে সকলের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কোম্পানীর দুশমনদারীর বিরুদ্ধে ময়দানে সামিল হতে হবে।

সময়টা ছিল সেপ্টেম্বর।

মৌসুমী হাওয়ার ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে পাহাড়ের মাথায় এসে জমেছে মেঘের দল। কালো ছায়া ঘনিয়েছে কেয়াঞ্জি-ধাউরা-হালদু-শালের নিবিড় অরণ্যে। ডুংরির ঘাটিতে বাজ পড়ার ভারি আওয়াজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে চারদিকে। চমকে-ওঠা ময়ূর হালদুগাছের পাতার আড়ালে থেকে কেকাধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে। পাহাড়ের গা-ধুয়ে-আসা বর্ষণের ধারা জল গাঢ় বাদামি অবয়বে ছায়াচ্ছন্ন বনের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কুনোয়ার সিং মীর্জাপুরের গভীর বনপথ ধরে রেওয়ার দিকে যাত্রা করেছেন। দলে যারা খেত-খামারের মানুষ ছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে বারবার তাদের নিজের ভুঁই খেতের কথা মনে পড়ে—কাজরীর পংক্তি গুণগুণ করে ওঠে।

শাহাবাদ জেলার জগদীশপুরকে কি সহজে ভোলা যায়।

গুপ্তচর শাহ কবীর দিন খবর পাঠালো কুনোয়ার সিং রেওয়ার দিকে পা বাড়িয়েছেন। হয়তো রেওয়ায় গিয়ে ঠাঁই নেবেন। রেওয়ার রাজা তার আত্মীয়—সেখান থেকে ভাঙা দলটা জোড় দিয়ে রসদ-পত্তর গুছিয়ে আবার লড়াইতে নামবেন!

খবরটা রেওয়াতে পৌঁছল মাঝরাতে।

পলিটিক্যাল এজেন্ট উইলোবী অসবোর্ণ তখন ঘুমাচ্ছেন। ঘুম ভাঙিয়ে তাকে খবর দেওয়া হল। খবর পেয়ে তো মিষ্টার অসবোর্ণের চক্ষু চড়কগাছ। যে-সে লোক নন কুনোয়ার সিং—জগদীশপুরের শের!

মিষ্টার অসবোর্ণ তো খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কুনোয়ার সিং একবার যদি রেওয়াতে এসে জমতে পারেন তা'হলে এ' এলাকায় কোম্পানীর যে ভয়াবহ দুদিন এসে উপস্থিত হবে সে কথা ভাবতে গিয়েও মিষ্টার অসবোর্ণ শিউরে ওঠেন।

বাড়িতে টিকতে পারলেন না। সেই রাতেই রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। ভোর হতেই খবর পাঠালেন রাজাকে।

সৌভাগ্যের বিষয় রেওয়ার রাজাবাহাদুরের সঙ্গে মিষ্টার অসবোর্ণের ঘনিষ্ঠতা ছিল সুতরাং দ্বিধাগ্রস্ত রাজাকে বাগ মানাতে প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও মোটামুটি বকমে নিজের মতে আনতে পারলেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট চাইছিলেন রেওয়ার সৈন্য গিয়ে কুনোয়ার সিংকে আঘাত করুক।

রাজা তাতে রাজি হলেন না।

মিষ্টার অসবোর্ণ অন্ততঃ এটুকু করতে পারলেন যে বেওয়ার সৈন্যরা কুনোয়ার সিংকে রেওয়ায় ঢুকতে দেবে না।

অনেক গড়িমসির পর রাজি হলেন রাজাবাহাদুর।

মীর্জাপুরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে দারুণ বিষ্টি মাথায় নিয়ে কুনোয়ার সিং যখন রেওয়ার সীমান্তে এসে হাজির হলেন সীমান্ত বরাবর রাজার সেনা পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর রেওয়ায় ঢুকতে যাওয়ার অর্থ যুদ্ধ।

কুনোয়ার সিং এখন যুদ্ধ চাইছিলেন না, আর যুদ্ধ করবার ক্ষমতাও তার ছিল না। দীর্ঘপথ শ্রমে তার সৈন্যেরা ক্লান্ত। অনেকেই ধকল সহ্য করতে না পেরে দল ছেড়ে চলে গেছে। পাঁচ-সাতশ' অনুচর মাত্র তার সঙ্গে আছে যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুনোয়ার সিংকে বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করে যাবে।

থমকে দাঁড়ালেন কুনোয়ার সিং! রেওয়ায় একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রত্যাশা ছিল সেটুকুও পায়ের তলা থেকে সরে গেল। অনিশ্চিত এক সংশয়ের মধ্যে সারাটা সেপ্টেম্বর মাস রেওয়া আর মীর্জাপুরের মাঝামাঝি এলাকায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আর কোম্পানীর বিধি ব্যবস্থাকে তছনছ করে কোম্পানীকে নাস্তানাবুদ করতে লাগলেন কোম্পানীর মালপত্তর লুঠ হল, সৈন্যদলের ওপর আচমকা হামলা হতে লাগলো। কোম্পানীর থানা, আউটপোস্ট পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হল।

অক্টোবর মাসে কুনোয়ার সিং তার দলবল নিয়ে বান্দাতে নিয়ে হাজির হলেন। কেনে নদীর ধারে সুন্দরী বান্দা।

সাদর অভ্যর্থনা জানালেন বান্দার নবাব বাহাদুর।

এতদিনে একটু স্বস্তি পেলেন কুনোয়ার সিং। বিশ্রাম জুটলো বুড়ো মানুষটার। একান্তর যে পার হয়ে যেতে চললো!

এখানে বসেই কুনোয়ার সিং পরিকল্পনা করলেন, দিল্লি যাবেন। কিন্তু এই রকম একটা নড়বড়ে বাহিনী নিয়ে তো দিল্লি যাওয়া যায় না! তাই শক্তি বাড়ানোর কাজে লাগলেন।

৪০তম রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সিপাইরা এসে কুনোয়ার সিংয়ের পতাকা তলে জমায়েত হল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দলছুট কিছু সিপাই এসে ভিড় করতে

লাগলো কুনোয়ার সিংয়ের চারদিকে। তারা শপথ করলো, মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আছি!

এবার কুনোয়ার সিংয়ের অবস্থা একটু দৃঢ় হল। শিক্ষিত একদল সৈন্য তার অধীনে। দিল্লি যাত্রার তোড়জোড় সুরু হল।

হায়রে কপাল! খবর এল, দিল্লির বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছে। বাহাদুর শাহ বন্দী হয়েছেন।

দিল্লির সম্রাটের পক্ষে লড়াই করবার জন্যে দিল্লি যাত্রা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। এবার সে পরিকল্পনা পালটাতে হল।

এই সময় কানপুর থেকে নানা সাহেবের চিঠি এল কুনোয়ার সিংয়ের কাছে কানপুরে বিদ্রোহীদের সম্মিলিত বাহিনীতে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে

বান্দা থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে যাত্রা করলেন কুনোয়ার সিং। সঙ্গে নতুন ফৌজ, অস্ত্র-শস্ত্রও প্রচুর।

পান্নার সীমানার কাছে কোম্পানীর প্ররোচনায় কিছু জমিদার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। কুনোয়ার সিং আঘাত হানতে পারতেন কিন্তু যুদ্ধ এড়িয়ে গেলেন। সামান্য কয়েকটা সংঘর্ষের পর কুনোয়ার সিং সরে গেলেন। তার লড়াই তো দেশের বিরুদ্ধে বা দেশের মানুষের বিরুদ্ধে নয়। এ যুদ্ধ পরের দেশ লুঠ-করে-খাওয়া ডাকাতদের বিরুদ্ধে। দেশ যখন বিপন্ন তখন ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্ন এই সব মানুষের বিবেক কোন অন্ধকারে অচৈতন্য হয়ে আছে!

কুনোয়ার সিং অবাক হয়ে ভাবেন, এ যুদ্ধতো কারো একার লড়াই নয়—এ আমীর ফকির সকলের লড়াই এক বিদেশী অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে!

বিদেশীরা বারবার এই শস্য-শ্যামলিম দেশে হানাদারি করতে এসেছে—আর এই দেশের মানুষ জীবনপণ করে এগিয়ে এসেছে। সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে আনন্দপাল-ভীমপাল, বাবুরের বিরুদ্ধে রাণা সংগ্রাম সিংহের অবিস্মরণীয় যুদ্ধের কথা তো ভোলবার নয়! সেদিনও সবার ঘুম ভাঙেনি, শত্রুর খিদমতগারি করে নিজের আখের গুছিয়ে নেবার লোকের অভাব হয় নি।

ভাইয়া আমরা এখন কি করবো? কাছে এসে দাঁড়ান ছোটভাই অমর সিং

হঠাৎ বুঝি ভাবনা থেকে জেগে ওঠেন কুনোয়ার সিং। বলেন, পথ পালটাও—ওরা ভাববে আমরা ভয় পেয়েছি—

হাসলেন কুনোয়ার সিং, তারপর হাতের লাগাম তুলে পান্নার সীমানা থেকে ভিন্ন দিকে ঘোড়া চালালেন।

কুনোয়ার সিং অযোধ্যা গিয়ে হাজির হলেন। অযোধ্যার ওয়ালি ব্রিজিস কাদের

দরবার কক্ষে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্মান সূচক মূল্যবান পরিচ্ছদ দিয়ে সম্মান জানালেন এবং এক ফরমান জারি করে তাকে আজমগড় জায়গীর দিলেন।

যতদিন না অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌর যুদ্ধ শেষ হল কুনোয়ার সিং তার দলবল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য ইংরেজ প্রতিরোধ মরিয়া হয়ে ঘাঁটি আগলাতে লাগলো যতক্ষণ না বাইরে থেকে সাহায্য আসে।

দিল্লির পতন হতে বাহাদুর শাহ'কে (দ্বিতীয়) বন্দী করে, রাজপুত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করে তবে ইংরেজেরা নিশ্চিন্ত হল। তাদের সেনাপতিরা এবার দিল্লির চারপাশে ছড়ানো বিদ্রোহী ঘাঁটিগুলোর দিকে নজর দিল আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের বেগে আক্রমণ চালালো।

অযোধ্যার বিদ্রোহীদের দাপট ছিল সব চেয়ে বেশি. লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে তারা ইংরেজদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছিল। অযোধ্যার হজরত মহল বেগম নিজে লক্ষ্ণৌ অবরোধে সক্রিয় অংশ নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। বাগী ফৌজ তো বটেই সাধারণ মানুষও এই লড়াইতে অংশ নিয়েছিল।

তবু ঠেকানো গেল না বিদ্রোহীদের পতন হল।

অযোধ্যার বিদ্রোহ শেষ হতে কুনোয়ার সিং আত্মগোপন করলেন। ইংরেজদের গুপ্তচর ব্যবস্থা তার কোন খবর জোগাতে পারলো না।

১৮৫৮র ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি লক্ষ্ণৌ আর ফরিদাবাদের মাঝামাঝি তাকে দেখা গেল। হয়তো নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ক্লান্ত শার্দূল বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সংগ্রহ করতে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করেছিলেন।

কোম্পানীর সেবক ও অনুগত রানা জং বাহাদুর একদল গোর্খা সৈন্য পাঠিয়েছিল আজমগড় থেকে বিদ্রোহীদের হঠিয়ে দেবার জন্যে -আর সে কাজ তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সুরু ও শেষ করতে পেরেছিল। কাজটা শেষ হবার পরই স্যার কলিন ক্যাম্বেলকে সাহায্য করবার জন্যে তড়িঘড়ি লক্ষ্ণৌ ছুটলো। আজমগড় ফাঁকা পড়ে রইলো।

কুনোয়ার সিংয়ের শ্যেন দৃষ্টিতে তা এড়ালো না, এইতো সুযোগ। সৈন্যদের কানে উচ্চারিত হল তার আদেশ যাত্রা করো—যাত্রা করো—

বৃদ্ধ রাজপুত আজমগড় থেকে কুড়ি মাইল দূরে আত্রাউলি ছোঁ মেরে দখল করে নিলেন।

এলাকার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক কর্ণেল মিলম্যান পড়ি-মরি করে ছুটে এলেন জগদীশপুরের শেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে।

কুনোয়ার সিং তৈরি হয়ে ছিলেন। মিলম্যান এসে পৌছতেই ঝাপিয়ে পড়লেন। সাহেবের সঙ্গে কামান ছিল না কাজেই যুদ্ধ হবে বন্দুকের সঙ্গে বন্দুকে। সুতরাং কুনোয়ার সিংয়ের সাগিদরা চটপট বন্দুক বাগিয়ে বেপরোয়া লড়াই করে গেল।

মিলম্যানের বাহিনী সেই বেপরোয়া বন্দুকবাজদের পাল্লায় পড়ে হটে যেতে শুরু করলো তারপর পালিয়ে পিঠ বাঁচালো।

কুনোয়ার সিং মিলম্যানকে তাড়া করে এলাকা ছাড়া করলেন। এবার পেছন ফিরে তাকালেন কুনোয়ার সিং। আত্রাউলি থেকে সোজা পথ চলে গেছে আজমগড়ের দিকে। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়, পা বাড়ালে দখল করা যায়। এমন সুযোগ ছাড়ে কে! তাছাড়া আজমগড় তো কুনোয়ার সিংয়ের হকের ধন-অযোধ্যার ওয়ালি তাকে জায়গীর দিয়েছেন। আজমগড় দখল নিতে এগোলেন কুনোয়ার সিং।

সেও এক বসন্তকাল। ছায়ায় শীত। রোদে তাপ। গাছে-গাছে ফোটা ফুলের মেলা। মোষ চবাতে গিয়ে আজমগড়ের দেহাতি চাষীরা গাছের ছায়ায় বসে বাঁশিতে সুর তুলেছে। রুক্ষ মাঠের ওপর দিয়ে সেই সুর দক্ষিণের বাতাসে ভেসে চলেছে।

'পানিয়া ভরণে' আসা গাঁয়ের বৌ-ঝি সেই সুর শুনে উদাস হয়ে গেছে।

এমন সময় আজমগড়ের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-থাকা জঙ্গলের ভিতর থেকে ঘোড়সোয়ার আর পদাতিকেরা বেরিয়ে এলো।

গাঁয়ে খবর গেল। ছেলে-বুড়ো-জোয়ান সব দল বেঁধে পালাতে সুরু করলো।

সোয়াররা বললো ডরো মত্‌—ভাগো মত্‌। হাম লোক তুম্‌হারে দোস্ত হয়।

পদাতিকেরা গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে দেশোয়ালী ভাষায় সুখ-দুঃখের আলাপ সুরু করে দিল।

আর ক'দিন বাদে হোলি

সিপাইরা মিষ্টি হেসে বললো, দাগ দিয়ে তোমাদের সঙ্গে হোলি খেলতে এসেছি—এতদিন তো দুশমনের রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছি আমরা!

শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

কুনোয়ার সিংয়ের তাঁবু পড়লো আজমগড়ে।

এমনিতেই হোলির মেজাজে ছিল আজমগড়। কুনোয়ার সিংয়ের বাহিনী এসে পড়তে উৎসবের আগেই গোলির পরব বুঝি জমে উঠলো!

এই সব বীরদের দেখে গাঁয়ের মেয়েদের চোখেও বুঝি নেশা ধরে গেছে। তাদের চোখের দৃষ্টি রহস্যময়!

একদল হোলির গান ধরেছে অন্যদল ঢোলে কাহারবায় বোল তুলেছে। মেয়েদের পায়ের নূপুর কিন্নরীদের কল কণ্ঠে কথা বলে উঠছে।

চাঁদ খুশি হয়ে সারারাত উৎসবের প্রাঙ্গনে আলো দিল।

তবু ভাঙল মিলন মেলা। হোলি খেলা আর হয়ে উঠলো না।

গানের আসর থেকে লাফিয়ে গিয়ে সেপাইরা হাতিয়ার তুলে নিল বারুদের গন্ধ পাচ্ছে তারা বাতাসে।

কর্ণেল মিলম্যানের হেরে গিয়ে পালিয়ে যাবার খবর পেয়ে গাজিপুর থেকে কর্ণেল ডেমস্ দ্রুত গতিতে এগোলেন—আজমগড় শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তাড়াতাড়ি অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক ডেমস্ কুনোয়ার সিংয়ের মুখোমুখি হবার মতো ফৌজ সঙ্গে নিতে পারে নি। তার বিশ্বাস ছিল লক্ষ্মৌয়ের পরাজয়ের পর বিদ্রোহীরা আর আগের মতো ঝুঁকি নিতে পারবে না আক্রমণের আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়বে।

হয়তো তাই হ'তো। কিন্তু কুনোয়ার সিংয়ের মন টানছে জগদীশপুর—আর সেখানে যেতে হলে গাজিপুরের পথ ফাঁকা চাই। গাজিপুর পেরিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে জগদীশপুর পৌছতে হবে। সুতরাং কর্ণেল ডেমসকে এমন ঠ্যাঙানি দিতে হবে যাতে পত্রপাঠ এলাকা ছেড়ে পালাতে দিশে পায় না। শত্রুকে আঘাত হানবার জন্যে উপযুক্ত জায়গা বেছে নিতে কুনোয়ার সিংয়ের তুলনা হয় না।

তেমনি একটি পাহাড়ি জায়গা বেছে কুনোয়ার সিং কর্ণেল ডেমসের অপেক্ষা করে রইলেন।

কর্ণেল ডেমস্ কুনোয়ার সিংয়ের খবর জানবার জন্যে স্কাউট পাঠালেন দলের আগে। তারা চারদিকে তন্নতন্ন করে দেখে-শুনে এগিয়েও কুনোয়ার সিংয়ের পাত্তা করতে পারে না।

পারবে কি করে-গঙ্গা পেরিয়ে কতবার যে কুনোয়ার সিং এপথে লক্ষ্মৌ-দিল্লি করেছেন তার কি লেখা-জোকা আছে। এলাকার নুড়ি পাথর টুকুর সঙ্গেও তার চেনা জানা। শাহাবাদ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে গাজিপুর, গাজিপুরের পরেই আজমগড়।

ছোট একটা দল কুনোয়ার সিং কর্ণেল ডেমসের সামনে ছেড়ে দিলেন তারা মায়ামৃগের মতো সামান্য একটা-দুটো যুদ্ধের ছলনা করে মূল বাহিনীর দিকে টেনে নিয়ে গেল। কর্ণেল ডেমস্ কুনোয়ার সিংকে ধরবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে অত্যন্ত অসতর্ক হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন--কুনোয়ার সিংয়ের চালাকিটা ধরতে পারেন নি। ফলে গুলির পাল্লা-র মধ্যে গিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে

মৌচাক থেকে ছুটে আসা মৌমাছির ঝাঁকের মতো গুলি ছুটে গিয়ে নৃশংস ভাবে তাদের শরীরে বিদ্ধ হতে লাগলো। বিপদ বুঝতে কর্ণেল ডেমসের এক লহমার বেশি সময় লাগে নি। পিছু হঠাও মুশকিল হয়ে পড়লো। তিন ভাগ সৈন্তের প্রায় দু'ভাগ মাটিতে শুইয়ে রেখে কর্ণেল ডেম্‌স 'যঃ পলায়তি 'সঃ জীবতি তু' এই আপ্ত বাক্য অনুসরণ করে প্রাণে বাঁচলেন।

যদিও লক্ষ্ণৌ জয় ভারতের ব্রিটিশ মর্যাদার পতাকা আকাশে তুলে ধরেছিল তবু আত্রাউলি আর আজমগড়ের যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় সেই পতাকাকে বুঝি ধূলোয় নামিয়ে নিয়ে এল!

দুঃসংবাদ! ব্রিটিশের পক্ষে দারুণ দুঃসংবাদ। জগদীশপুরের বৃদ্ধ ব্যাঘ্র কোম্পানীর কর্তাদের হাড়ে শীত ধরিয়ে দিল বুঝি!

এবার কর্ণেল-ক্যাপ্টেনদের ফেলে জেনারেলদের ডাক পড়লো। এলাহাবাদ থেকে লর্ড মার্ক কের্‌ আজমগড়ের দিকে এগোলেন।

লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। এই খবর তার কাছে পৌঁছলে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ক্রিমিয়া যুদ্ধে অভিজ্ঞ লর্ড মার্ক কের্‌কে আজমগড় পাঠালেন কুনোয়ার সিংকে শায়েস্তা করবার জন্যে।

মার্ক কের্‌ পাঁচশ' সৈন্য আর আটটা কামান নিয়ে আজমগড়ের আট মাইলের মধ্যে হাজির হলেন।

মার্ক কের্‌ আক্রমণ শুরু করবার আগেই কুনোয়ার সিংয়ের বাহিনী আজমগড় থেকে সরে যাবার মুখে ঝাঁক—ঝাঁক বুলেট দিয়ে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চালালো। সাদা ঘোড়ায় চড়ে কুনোয়ার সিং বিদ্যুত গতিতে সৈন্যদের আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগলেন। তার বাহিনীর কোথায় দুর্বলতা সেটা কুনোয়ার সিংয়ের ভালো করে জানা ছিল তাই কোম্পানীর কামানের সামনে সংঘবদ্ধ আক্রমণ না-চালিয়ে তার সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়ে আক্রমণ চালালেন।

শত্রুর কামান অনবরত আগুন উগরে যেতে লাগলো। কুনোয়ার সিংয়ের একটাও কামান ছিল না যে শত্রুপক্ষকে স্তব্ধ করে দেয় তাই কুনোয়ার সিং একদল বাছাই-করা লড়িয়ে সামনে রেখে আরেকটা দল নিয়ে মার্ক কেরের বাহিনীর পিছন দিকে গিয়ে ঢু মারলেন।

মার্ক কের্‌ কিন্তু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি যে সামনে পিছনে সমান ভাবে আক্রান্ত হবেন।

এইবার কুনোয়ার সিং তার আক্রমণ সংহত করে এমন প্রচণ্ড ভাবে ঝাপিয়ে

পড়লেন যে কোম্পানীর হাতিগুলো পাগল হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো। মাহুতেরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের বাগে আনতে পারলো না, শেষে প্রাণের ভয়ে তারা হাওদার দড়ি ধরে গলার কাছে ঝুলে রইলো।

মার্ক কের্ যখন দেখলেন তার পিছন দিকটা প্রচণ্ড ভাবে আক্রান্ত তখন আজমগড়ের দিকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় রইলো না। তার কামান তাকে বাঁচিয়ে দিল। কুনোয়ার সিংয়ের হাতে এমন কোন অস্ত্র ছিল না যা মার্ক কেরের কামানগুলো স্তব্ধ করে দিতে পারে। সুতরাং মার্ক কের্ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আজমগড়ে পালিয়ে যেতে পারলেন।

মার্ক কের্ যখন আজমগড় থেকে কুনোয়ার সিংকে তাড়ানোর সুযোগ খুঁজছিলেন— কুনোয়ার সিংও সেই সময় বেপরোয়া পরিকল্পনা করলেন।

মার্ক কের্‌কে সাহায্য করবার জন্যে কর্ণেল লুগার্ড‌কে টেমু নদীর সেতু পার হয়ে আসতে হবে। যদি তার অনুচরেরা এই সেতুমুখ আটকে রাখে তাহলে লুগার্ডের ধারণা হবে কুনোয়ার সিং আজমগড়ের দখলদারী বজায় রাখতে চান।

শত্রুরা এই রকম কিছু ভাবুক কুনোয়ার সিংও তাই চান। তাহলে লুগার্ড অন্যদিকে চোখ না দিয়ে সেতু দখলের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাবে তার ফলে কুনোয়ার সিং আজমগড় থেকে সরে গিয়ে সুবিধে মতো জায়গায় নিজের অবস্থান দৃঢ় করে নিতে পারবেন।

এই কাজের ভার দিলেন, এমন একদল যোদ্ধাদের, জীবন ও মৃত্যু যাদের পায়ের ভৃত্য! তাদের প্রতি কুনোয়ার সিংয়ের কঠিন নির্দেশ রইলো, লুগার্ড যেন কিছুতেই সেতু দখল করতে না পারেন। নিরাপদ জায়গায় পৌছে সংকেত পাঠালে তবে সেতু মুখ ছেড়ে দিয়ে সবাই মূল বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেবে।

লুগার্ড টেমু নদীর সেতু মুখে এসে দেখেন একদল বাগী ফৌজ সেতু দখল করে রেখেছে। সেতু দখল করতে না-পারলে আজমগড়ে কোন সাহায্য পাঠানো যাবে না। সুতরাং দেরি না-করে লুগার্ড কুনোয়ার সিংয়ের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালেন— আক্রমণের পর আক্রমণ দুর্বার হয়ে উঠলো তবু সেতুর এক ইঞ্চি দখল করতে পারলেন না।

এদিকে কুনোয়ার সিং এই সুযোগে গাজিপুর যাবার পথে নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেলেন। আজমগড় থেকে পুরো বাহিনী সরাবার পর সেতু রক্ষাকারীদের সরে আসার সংকেত পাঠালেন।

কুনোয়ার সিং আজমগড় ছেড়ে সরে গেছেন শুনে মার্ক কের্ আর লুগার্ডের মিলিত বাহিনী তার পিছনে ধাওয়া করলো। কুনোয়ার সিং তখন তার বাহিনী নিয়ে

এমন ভাবে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করেছেন যে কোম্পানী ফৌজ তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হল।

তাড়া খাওয়া বাঘ এবার ফিরে দাঁড়ালো। ভয়ঙ্কর তার জন্তুন। সৈনিকদের তরবারি কোষমুক্ত হল, বন্দুকের নল মাথা তুললো, দখল-করা কামানের মুখ শত্রুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো!

কোম্পানীর ফৌজ তীব্র এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরও সিপাইদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ' ভেদ করতে পারলো না। পরন্তু আত্মরক্ষা করাই তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো—তারা আর এগোতে সাহস করলো না। এবার জেনারেল ডগলাস আজমগড় থেকে ছুটে এলেন কুনোয়ার সিংকে তাড়া করে।

কুনোয়ার সিং গুজব ছড়িয়ে দিলেন নৌকোর অভাবে তিনি বালিয়া গিয়ে গঙ্গা পার হবেন। সেখানে গঙ্গা অগভীর—নৌকো যদি নাও জোটে সৈন্যসামন্ত রসদ-পত্র হাতির পিঠে চড়িয়ে পার করে নেবেন।

জেনারেল ডগলাসের কাছে যখন এই খবর পৌঁছলো তিনি আর সময় নষ্ট না করে বালিয়ার দিকে ছুটলেন কেননা বালিয়ার ঘাটে কুনোয়ার সিংকে ধরা কঠিন হবে না।

অর্ধেক রাস্তা যাবার পর ধরা পড়লো, কুনোয়ার সিং ধোঁকা দিয়ে শিউপুর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেছেন।

দিক পালটালেন জেনারেল ডগলাস তারপর পড়ি-মরি করে ছুটলেন কুনোয়ার সিংকে ধরবার জন্যে।

পিছু হঠতে গিয়েও কুনোয়ার সিং রণনায়ক হিসেবে এক আশ্চর্য দক্ষতার নজির রাখলেন।

শত্রুর দুরন্ত গতি ঠেকানোর জন্যে কুনোয়ার সিং তার বাহিনীকে দু ভাগে ভাগ করে একদলকে এগিয়ে যেতে বললেন—তারা শিউপুর ঘাটে গিয়ে ব্যবস্থা করবে। অন্যদল নিয়ে ডগলাসের বাহিনীকে কোনঠাসা করে রাখলেন। সারাদিন এই রকম আক্রমণ চালিয়ে কুনোয়ার সিং শত্রুকে মাঝে-মাঝে নিশ্চল করে দিতে লাগলেন। এই ভাবে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ চলতে লাগলো সকাল থেকে সন্ধে।

ডগলাস ভাবলেন, আক্রমণকারীদের পিছনে মূল বাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে যে-কোন মুহূর্তে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাই তার পক্ষে বেপরোয়া কোন ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হল না। চার-পাঁচ মাইল পর্যন্ত ডগলাস কুনোয়ার সিংকে তাড়া করে গেলেন একই গতিতে তারপর ঢিলে দিলেন। সেই অবসরে কুনোয়ার সিং তার বাহিনী নিয়ে শিউপুর ঘাটে পৌঁছে গেলেন।

গঙ্গা পেরিয়েই শাহাবাদ জেলা—শাহাবাদ জেলায় জগদীশপুর। সামনে গঙ্গা পেছনে ধাবমান শত্রু। ভয় পেলে চলবে না। এমনি করেই দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু পেরিয়েই যাত্রীরা চলে। বাজি রাখে : হয় স্বাধীনতা না-হয় মৃত্যু!

শিউপুর ঘাটে পৌঁছেই ছুটোছুটি লেগে গেল নৌকোর জোগাড়ে।

শিউপুর ঘাট ও তার আশপাশে কাছে-দূরে যত নৌকো ছিল সব টেনে সৈন্যদের তুলে দেওয়া হতে লাগলো। হাতে সময় কম। যে কোন মুহূর্তে কের্ আর লয়েডসের বাহিনী এসে হাজির হতে পারে।

নৌকো কম থাকায় কুনোয়ার সিং হাতিতে চড়ে পার হতে চাইলেন। ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা সবাই বাধা দিল। সেটা ঠিক হবে না। আপনি নৌকো চড়েই যাবেন।

দলের লোকজন সবাই প্রায় পার হয়ে গেছে। শ'দুই লোক মাত্তর বাকি আছে।

অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানা নৌকো এসে হাজির হল।

দূরে কোম্পানীর ফৌজের হল্লার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এক-একবার বাতাসে সেই উন্মত্ত শব্দ ভেসে আসছে নদীর ধারে।

বাকি যারা ছিল সবাই নৌকোয় চড়ে বসলো। শিউপুরের ঘাট ছেড়ে ভেসে চললো নৌকো। প্রাণপণে হাল ফেলছে, দাঁড় টানছে মাঝিরা।

নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে ওপারের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন কুনোয়ার সিং। বিষন্ন বেদনায় নির্লিপ্ত চোখ। দেখা যাচ্ছে না বটে, তবু কে না জানে, ওপারেই আছে শালের অরণ্য দিয়ে ঘেরা জগদীশপুর। ইহজীবনে কুনোয়ার সিং তাকেই মন-প্রাণ দিয়ে রেখেছেন— জগদীশপুরই তার শৈশবের খেলাঘর যৌবনের সুখ-নিকেতন। বার্ধক্যে আত্মার অমৃত নিসর্গ!

সারা-দিনের দুরন্তপনার পর ছেলে যেমন সন্ধ্যেবেলায় মায়ের কাছে ফিরে যায়, কুনোয়ার সিংও তেমনি জগদীশপুরের কোলের কাছে ফিরে যেতে চান।

জীবনের দিন তো শেষ হয়ে এল। বেলা শেষের এই শেষক্ষণে জগদীশপুরের মাটিতে শুয়ে আকাশ-ভরা তারার দিকে চেয়ে শাল কিশলয়ের মৃদু মর্মরে ঘুম-পাড়ানি গান শুনতে-শুনতে দু'চোখ মরণের অশেষ প্রশান্তিতে ভরে নেবার চেয়ে আর সুখ কি!

ইতিমধ্যে ডগলাস তার অগ্রবর্তী দল নিয়ে শিউপুরের ঘাটে এসে হাজির হয়ে দেখেন, গঙ্গার বুক জুড়ে ছড়ানো অসংখ্য নৌকোয় কুনোয়ার সিং ওপার যাচ্ছেন তার দলবল নিয়ে। ডগলাসের কিছু আর করবার নেই। গঙ্গার ওপর চোখ ফেলে ডাইনে বাঁয়ে কোন নৌকোর পাত্তা পাওয়া গেল না। এমন একটা শিকার হাতের

মুঠোয় এসেও ফসকে গেল। রাগে-ক্ষোভে নিরুপায় ডগলাস ছোট কামান থেকে বেপরোয়া গুলি ছুঁড়তে আদেশ দিলেন। কেননা, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছোঁড়বার কোন উপায় নেই। নৌকোগুলো গঙ্গার স্রোতে ইতস্তত পাড়ি দিচ্ছে।

ডগলাসের আদেশ পেয়ে গোলন্দাজরা গঙ্গার বুকের ওপর এলোপাথাড়ি গোলা ছুঁড়তে লাগল। সম্ভবত সেই সব গোলার কোন-একটা টুকরো কুনোয়ার সিংয়ের হাতে এসে বিঁধলো।

যন্ত্রনায় চিৎকার করে নৌকো থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন কুনোয়ার সিং। ভাই অমর সিং পাশে ছিলেন তিনি দাদাকে দু-হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। কিন্তু লোহার টুকরো হাতের মধ্যে ঢুকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতে লাগলো। অনেকক্ষণ দাঁতে-দাঁত চেপে সহ্য করলেন কুনোয়ার সিং। শেষে সহ্য করতে না-পেরে বাঁ-হাত দিয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করে কেউ বাধা দেবার আগে ডান হাত এক আঘাতে নামিয়ে দিলেন।

বিমূঢ় বিস্ময়ে সবাই স্তব্ধ।

কুনোয়ার সিংয়ের মুখে কিন্তু যন্ত্রণার এতটুকু চিহ্ন নেই আর।

গঙ্গা পার হয়ে জগদীশপুরে যাবার পথে আবার বাধা। লে গ্রাণ্ড আরা থেকে ছুটে এলেন কুনোয়ার সিংকে বাধা দেবেন বলে। তিনশ' সৈন্যের একটা জবরদস্ত দল। নতুন কয়েকটা কামান তাদের সঙ্গে।

কুনোয়ার সিংয়ের সঙ্গে তখন ছন্ন-ছাড়া হাজার দুয়েক লোক। যুদ্ধে তারা ক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষত। তেমন অস্ত্র-শস্ত্রও নেই। শত্রুকে ঘায়েল করবার মতো একটা কামানও তাদের সঙ্গী নয়।

শুধু ঘরে ফেরার দুরন্ত টানে তারা পথ চলেছে। এক রাতেই কুনোয়ার সিংয়ের ঘা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

লে গ্রাণ্ড যখন পথ আটকে দাঁড়ালেন আহত বাঘ শেষবারের মতো উঠে দাঁড়ালো শাহাবাদ জেলায় শেষ বারের মতো শোনা গেল বাঘের ভয়াল ভয়ঙ্কর গর্জন। পূর্বপ্রান্ত চমকে উঠলো। একদিকে রীতভঞ্জন সিং অন্যদিকে নিশান সিং দুজনে কুনোয়ার সিংকে ধরে তার প্রিয় শাদা ঘোড়ায় তুলে দিল। বৃদ্ধ অত্যন্ত অসুস্থ তবু তার বসবার ভঙ্গীটা খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঋজু। শরীরে দারুণ দাহ তবু তা যেন কুনোয়ার সিংয়ের অপরাজেয় সত্তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

মাথা তুলে সামনের দিকে তাকালেন কুনোয়ার সিং। এখনো তার প্রাচীন শরীরে দর্পিত রাজপুত বীরত্বের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। রেকাবের ওপর পা রেখে হাতের খোলা তলোয়ার আকাশে ছুঁইয়ে কুনোয়ার সিং উঠে দাঁড়িয়ে তার অবসন্ন অনুচরদের মৃত্যুঞ্জয়ী

আহ্বান দিলেন, দুশমনকে খিলাপ হমারি আখিরী লড়াই হয় চল্‌ও তুরন্ত ঝাপট পড়ে—

একফালি অরণ্যের আবরু। ছায়া দীর্ঘ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে গেছে।

স্থিমিত ম্লান ও অবসন্ন একটা আলোর আভাস পৃথিবীর চোখের তারায় চিকচিক করছে।

একটা ঝড় বুঝি আত্মগোপন করেছিল শালের ছায়ায়!

হঠাৎ হাড়-কাঁপানো ঘূর্ণী হাওয়ার আলোড়ন হয়ে সেই ঝড় ছুটে গিয়ে পড়লো লে গ্রাণ্ডের ৩৫তম, বাহিনীর ওপর।

মেঘে-মেঘে ঘষা লেগে যেমন বিদ্যুতের দীপ্তি ঠিকরে যায় অন্ধকার আকাশের গায় তেমনি লে গ্রাণ্ডের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে রাজপুত বীরত্ব অসামান্য দ্যুতি পূর্ব ভারতের অন্ধকার ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছারখার করে দিল!

মুখ থুবড়ে পড়লো লে গ্রাণ্ডের বাহিনী। তিনশ'জন শিখ আর ইউরোপীয় বাহিনীর মধ্যে সামান্য ক'জন মাত্তর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিল। গোলন্দাজেরা তাদের কামানের পাশে মরে পড়ে রইলো। স্বয়ং লে গ্রাণ্ড ও দুজন পদস্থ অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেন আর তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে হেঁটে জগদীশপুর গিয়ে পৌছলেন বীর কুনোয়ার সিং।

যুদ্ধ জয়ের পরদিন ছিল ২৪ এপ্রিল ১৯৫৮।

জগদীশপুরের মাটিতে শুয়ে পরম প্রশান্তিতে চোখ বুজলেন বীর কুনোয়ার সিং। জগদীশপুরের দুর্জয় শার্দূল!

মাথার ওপর পতপত করে উড়ছে সূর্যকরোজ্জ্বল নীল আকাশ। শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক!

সব আগুন নেভে না। কুনোয়ার সিং তার অনুগামীদের মনে যে-আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন সে আগুনও নিভলো না।

কুনোয়ার সিংয়ের প্রয়াণের পর, তার ভাই অমর সিং এগিয়ে এলেন। যদিও তার কোন সামরিক শিক্ষা বা প্রতিভা ছিল না তবু সহজাত রাজপুত বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্প তাকে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে।

অমর সিং এতদিন নত মস্তকে অগ্রজের অনুগমন করে নির্দ্বিধায় তার নির্দেশ পালন করে গেছেন। নেতৃত্বের দায় যখন কাঁধে নেবার সময় হল সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এলেন।

নেতৃত্ব হাতে নেবার একটু বুঝে নিতে তার অসুবিধে হয় নি যে মুখোমুখি লড়াইয়ে কোম্পানীকে ঘায়েল করবার ক্ষমতা তার নেই। তাই অমর সিং তার প্রজাদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকার গড়ে তুললেন।

শাহাবাদ জেলায় অমর সিং ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করলেন। বন্দীশালা তৈরি করলেন। তার কোতোয়াল ও অন্যান্য কর্মচারী কাজকর্ম তদারক করে বেড়াতে লাগলো।

অমর সিংয়ের মাথার জন্যে যেমন কোম্পানী-রাজ মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল—অমর সিংও তেমনি ইংরাজ কর্মচারীদের মাথার জন্যে নগদ টাকা ঘোষণা করেছিলেন।

ইংরেজের বিরুদ্ধে অমর সিংয়ের এই সর্বাত্মক জেহাদ শাহাবাদজেলায় জাতীয় আন্দোলনের পর্যায়ে উঠে এসেছিল। ছোট-খাট জমিদার এবং জনসাধারণ বিশেষ করে রাজপুতরা। প্রায় প্রকাশ্যেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অমর সিংয়ের এই লড়াইকে সমর্থন করতে ভয় পেত না।

কুনোয়ার সিংয়ের জমিদারীর রাজপুত গ্রামগুলো তো বিদ্রোহের চাপা উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতো। প্রত্যেকটা গ্রামে অমর সিংয়ের লোকজনের যাতায়াত ছিল অথবা গুপ্তচর মারফত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করতো, সিংজী হামে কব্ বোলায়েঙ্গে? কবে আমরা তার জন্যে তলোয়ার তুলে এগিয়ে যাব?

গ্রামবাসীরা ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি কোন বিবাদ-বিসম্বাদে যেত না। ইউরোপীয়রা নির্বিঘ্নে তাদের গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারতো। তবে পুলিশ কখনো যদি কোন বিদ্রোহীকে ধরবার জন্তে গাঁয়ে আসতো তবে গাঁয়ের লোক এক হয়ে পুলিশকে বাধা দিত।

শাহাবাদ জেলার মানুষেরা বিশ্বাস করতো, তাদের আত্মীয়-স্বজন রাজপুত গৌরব ও বীরত্বের জন্তে অমর সিংয়ের নেতৃত্বে লড়াই করছে। আর তাদের সমর্থন করা একান্ত কর্তব্য।

তিক্ত বিরক্ত কোম্পানীর মান সম্মান শাহাবাদ জেলায় বুঝি দেউলে হয়ে যাবার দাখিল হল। টনক নড়লো কোম্পানী কর্তৃপক্ষের। তারা অমর সিংকে শায়েস্তা করবার জন্তে ডগলাসকে পাঠালেন দানাপুর থেকে, আজমগড় থেকে স্যার এডওয়ার্ড কী লুগার্ড আর সাসারাম থেকে কর্নেল কোরফিল্ড। তিনজনের সৈন্ত সংখ্যা কিছু কম নয়। সঙ্গে গোটাকয়েক হাউটজার কামান। সৈন্তদের অর্ধেক হল ঘোড়সোয়ার।

গুপ্তচর এসে খবর দিল।

অমর সিং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সিপাইদের নিজের কাছে টেনে নিলেন তার সৈন্ত হবে হাজার আড়াই কি-তিন। ঘোড়সোয়ার শ'চারেক। এছাড়া বেশ কিছু রাজপুত জমিদার গোপনে লোকজন দিয়ে সাহায্য করলেন।

তবু ইংরেজদের সৈন্ত সমাবেশ আর কামানের সংখ্যা দেখে অমর সিং সামনা সামনি লড়াইয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেলেন আর সেখানে বসে শত্রুর গতিবিধির কড় নজর রেখে সুযোগ-সুবিধে মতো তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে রসদপত্র লুঠ করতে লাগলেন।

জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেবার ফলে জগদীশপুর হাতছাড়া হয়ে গেল। তখন অমর সিংয়ের মূল ঘাঁটি হল লাতেহারপুর।

অমর সিংয়ের সাকিন বের করতে বেশ কিছুদিন লাগলো। তারপর অধিনায়করা যখন নিশ্চিন্ত হলেন, অমর সিংয়ের মূল ঘাঁটি জঙ্গলের অভ্যন্তরে তখন লুগার্ডই প্রথম এগিয়ে এলেন জঙ্গল ঘেরাও করে বিদ্রোহীদের ধরবার উদ্যোগ নিতে।

জঙ্গলের চারদিক ঘিরে আউট পোস্ট বসালেন লুগার্ড। সেখানে দিনরাত উদ্যত রাইফেল রইলো অতন্দ্র প্রহরায়। বন থেকে কাকপক্ষীটিরও বাইরে আসবার উপায় নেই। তেমনি প্রহরারত সৈনিকের চোখ এড়িয়ে কারো বনের ভেতর ঢোকবারও উপায় নেই। লুগার্ড নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত কাজটা প্রত্যক্ষ তদারকিতে শেষ করে নিশ্চিন্ত হলেন। এবার বিদ্রোহীদের জালে ফেলা সহজ হবে। রসদ ফুরোলেই বাইরে আসতে হবে আর তখনি টপাটপ ধরে ফেলা যাবে।

বেশ কিছু দিন কেটে গেল বিদ্রোহীদের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কর্নেল আশ্চর্য হলেন! বিদ্রোহীরা কি তবে ফেরার হয়ে গেল অন্য কোথাও!

না তা তারা হয় নি। খবর পাওয়া গেল, তারা ভেতরেই আছে আর দরকার মতো বাইরে আনাগোনাও করছে।

মাথা নাড়লেন লুগার্ড, না, এভাবে তো হবে না জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে বিদ্রোহী-দের ওপর হামলা করতে হবে। যে-কথা সেই কাজ। তবে তার আগে জঙ্গলের ভিতর সুশৃঙ্খল একটা বাহিনীর চলাফেরার জন্যে উপযুক্ত রাস্তা চাই। না-হলে বিদ্রোহীদের দমন করা যাবে না।

লোক-জন এল! কাজে লেগে গেল তারা। জঙ্গলের এপার-ওপার ছুঁয়ে বড়ো বড়ো রাস্তা তৈরি হল। পায়ে-হাঁটা, ঘোড়ায়-চড়া সিপাইরা বন-বাঁদাড় ভেঙে চুরে বাগী সিপাইদের আস্তানা খুঁজে ফিরতে লাগলো। কর্নেল লুগার্ড এইসব অভিযানের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখলেন।

বিদ্রোহীরা প্রমাদ গুণলো। তারা ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়লো। বড়ো-বড়ো গাছের উঁচু ডাল-পালার মধ্যে তাদের পাহারাদাররা আত্মগোপন করে কোম্পানী ফৌজের চলাফেরার দিকে নজর রাখতে লাগলো আর সংকেত দিয়ে সারা বনময় ছড়ানো সাথী-সঙ্গীদের সতর্ক করে দিতে লাগলো। এ ছাড়া এমন কিছু বেপরোয়া লোক কোম্পানীর ফৌজের পেছনে লাগিয়ে রাখা হল যারা নেকড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে নিঃশব্দে অনুসরণ করবে আর সুযোগ পেলেই ঝাপিয়ে পড়ে টুটি চেপে ধরবে। আর সে সুযোগ তাদের হামেশাই জুটে যেত।

প্রায়ই দেখা যেত লুগার্ডের পোস্টের পাহারাদার নিকেশ হয়েছে না-হয় টহলদারী ফৌজের কেউ-না-কেউ খতম হয়ে গেছে। যারা এ কাজ করতো তাদের আসা-যাওয়া বাতাসের মতো অদৃশ্য হয়ে থাকতো।

লুগার্ডের কাছে যখন খবর পৌছতো ক্ষেপে যেতেন তিনি। সারাদিনের ধকলের পর শ্রান্ত লুগার্ড হয়তো ক্যাম্পে পৌছে বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ করছেন। এমন সময় খবর এল লাতেহারের দিককার আউট পোস্টের চারজন পাহারাদারই খতম। বেরিয়ে পড়তে হয় লুগার্ডকে নিরুপায় হয়ে।

রাত হলে তো কথাই নেই। লুগার্ডের বাহিনীর সমস্ত সিপাইকে বিনিদ্র চোখে উদ্যত রাইফেল নিয়ে সতর্ক থাকতে হয়। কখন যে কোন অংশে বিদ্রোহীদের আক্রমণ আছড়ে পড়বে কে জানে!

এই রকম একটা হঠাৎ আক্রমণ ঠেকিয়ে লুগার্ড পলায়নপর বিদ্রোহীদের তাড়া

করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কিংবা এও হতে পারে, পালাবার অছিলায় বিদ্রোহীরা তাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

কাল-প্রাচীন অরণ্যের ছায়া নিবিড় অন্ধকারে বিদ্রোহীদের তাড়া করে বেশ খানিকটা ঢুকে যাবার পর, গাছপালায় ঝোপঝাড়ে ও লতায় জটিল পথের কোথায় যেন তারা হারিয়ে গেল। মশালের লাল আগুনে অন্ধকার পুড়ে খাক হয়ে যতোখানি দেখা যাচ্ছিল তাব বাইরে কালো গ্রানাইনের মতো অন্ধকার থরে-থরে সাজানো। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না লুগার্ড। অনির্দেশ্য অন্ধকারে এগোবেনই বা কোথায়! তার বুকের মধ্যে ভয় থরথর করে।

সেই ভয় বুঝি পাতার মর্মরে, প্যাঁচার ভাবি গলার আওয়াজে, কখনো নিশাচর পাখির বিচিত্র স্বর-তরঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দমকা বাতাসের ঝাপটায় বিদ্রোহীদের হামলা আছড়ে পড়ে বুঝি। বুকে ভয় নিয়ে ফিরতে হল কর্ণেল লুগার্ডকে। কয়েক কদম বোধহয় ঘোড়ায় করে পিছিয়ে ছিলেন, বিকট শব্দে অন্ধকারকে ভয় পাইয়ে বিদ্রোহীরা এসে ঝাপিয়ে পড়লো।

অন্ধকারে লড়াই কি হল কেউ জানে না তবে লুগার্ডকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

দিনের পর দিন একটানা পরিশ্রমে লুগার্ডের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। শুধু কি পরিশ্রম, অমর সিংয়ের দলবল কখন কি করে বসে সেজন্যেও স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়তে লাগলো। এর পর উপর থেকে অনবরত তাগাদা আসতে লাগলো, বিদ্রোহীদের কতোখানি ঢিট করা গেছে সে সম্বন্ধে সবিস্তারে জানাও।

বেচারা কর্ণেল লুগার্ড এত ঝামেলা সহ্য করতে না পেরে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অজুহাতে ছুটি নিতে বাধ্য হলেন।

এই ডামাডোলের বাজারে অমর সিং জঙ্গল থেকে ঘোড়সোয়ার নিয়ে রাত্রে বেরিয়ে পড়ে আশপাশের ইংরাজদের খয়ের-খাঁ জমিদারদের শাস্তি দিতে লাগলেন। ইচ্ছে মতো ইংরেজদের অনুগত গ্রামগুলোতে হানা দিয়ে ফিরতে লাগলেন।

জুন মাসে অমর সিং গঙ্গার ডান তীরে গুরমুরে গিয়ে হাজির হলেন। হয়তো তার ইচ্ছে ছিল অযোধ্যা কিংবা অন্য কোথাও যাবার।

গাজীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেয়ে পাটনায় খবর পাঠালেন। সম্ভবত গাজীপুর অমর সিংয়ের আক্রমণের লক্ষ্য!

বেনারসের ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেয়ে জানালেন, অমর সিং হয়তো বেনারসও আক্রমণ করতে পারেন।

কয়েক দিন ধরে অমর সিং বেনারস ও গাজীপুরের আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করলেন বটে তবে হামলা করলেন না। কী ছিল তার মনে কে জানে!

কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অমর সিংয়ের এই উদ্দেশ্যহীন রহস্যময় আনাগোনায় ভয়ের প্রহর গুনতে লাগলেন। বিদ্রোহীরা কি-যে করতে যাচ্ছে সে-কথা ভেবে তারা অস্থির হয়ে পড়লেন।

অমর সিং কিন্তু কোম্পানীর আয়ত্তের বাইরে অথচ তাদের চোখের সামনে উদ্যত-থাবা ক্রুদ্ধ ও হিংস্র শার্দুলের মতো ক্রূর-কুটিল জিংঘাংসা নিয়ে হানাদারি করে বেড়াতে লাগলেন!

১৮৫৮ সালের জুন মাস এই ভাবেই গেল।

আরা শহরে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভিক্টর সাহেব দিনের কাজ শেষ করে কোয়ার্টার্সে ফিরলেন। সারা দিন অসহ্য গরম গেছে। মেঘে-ঢাকা দিন একফোঁটা বিষ্টি হয়নি। চাপা গরম সারা দিন সবাইকে ডিমের মতো সেদ্ধ করে ছেড়েছে।

গোসলখানা থেকে স্নান সেরে মিষ্টার ভিক্টর হাফপ্যান্ট পরে বাংলোর লনে এসে বসলেন। বাবুর্চিরা সেখানেই খানা সাজিয়ে দিল।

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

মিষ্টার ভিক্টর আকাশের দিকে তাকালেন। কালো হয়ে এসেছে দিগ-দিগন্ত। এবার বিষ্টি নামবে। মনে মনে আশ্বস্ত হলেন তিনি।

পুবের বাতাসে লনের সবুজ ঘাস মাথা দোলাচ্ছে।

পশ্চিম দিকে কালো আকাশের বুক জুড়ে নীল বিদ্যুতের শিখা ঠিকরে যাচ্ছে।

খুশি হলেন মিষ্টার ভিক্টর। গ্রীষ্মের দীর্ঘ কয়েকটি বিনিদ্র রাতের পর ঘুমোবার মতো চমৎকার একটা রাতের ভূমিকা তৈরি হচ্ছে।

খোলা বাতাসে ডুবে বসে থাকতে কী যে ভালো লাগছে মিষ্টার ভিক্টরের! ভাবলেন, জলের ফোঁটা গায়ে না পড়া পর্যন্ত বাইরেই থাকবেন।

বসে থাকতে-থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মিষ্টার ভিক্টর। হঠাৎ একটা গোলমেলে শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল আর একগলা অন্ধকারে বসে আতঙ্কিত চোখে দেখলেন, একদল ঘোড়সোয়ার মশাল জ্বেলে তার বাংলোর দিকে ছুটে আসছে।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে মিষ্টার ভিক্টরের এক মিনিটের ষাট ভাগের একভাগ

মাত্র সময় লেগেছিল। সংজ্ঞা ফিরতে দেখলেন তার বিশস্ত পা দুটো লাথি মেরে টেবিল উলটে বেতের চেয়ার ছুঁড়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে আরম্ভ করেছে। নিজেকে কোন রকমে সামলে তিনি পেছন দিককার পাঁচিল টপকে কাছাকাছি জঙ্গলে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন। আর খানিক বাদেই দেখলেন, তার বাংলো ঘিরে আগুনের শিখা সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলছে।

মাসটা ছিল ১৮৫৮র জুলাই।

আগস্টে আরা ট্রুপ সের কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ওয়াল্টার খবর পেলেন আবার বারো মাইল পশ্চিমে বিদ্রোহীরা হানা দিয়েছে। তখন সময় সন্ধে পেরিয়ে গেছে।

যে লোকটা খবর এনেছিল কর্ণেল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন গেলে কি তাদের ধরা যাবে?

তা যেতে পারে। আর আমাদের যাবার পথ দিয়েই তো তারা ফিরবে।

দেরি করলেন না কর্ণেল ওয়াল্টার। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্ট টাইট্ করে নিলেন।

কোম্পানীর সোয়ার ছাউনি থেকে পথে নামলো। জোর কদমে এগিয়ে চললো বিসলাদাররা। দূর থেকেই তারা দেখতে পেল পশ্চিম দিগন্ত লালে-লাল।

সুতরাং কর্ণেল ওয়াল্টারের বিদ্রোহীদের নিশানা ঠের করতে দেরি হয়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছতেও দেরি হয় নি। তন্নতন্ন করে সারা এলাকা খুঁজেও তাদের হদিশ পাওয়া গেল না। কর্ণেল আর তার রিসলাদার বাহিনী আগুন নেভানোর কাজ ছাড়া আর কিছু সুবিধে করতে পারলো না।

কোম্পানীফৌজের এগোবার খবর পেয়ে অমর সিং তার ঘোড়সোয়ার নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে আরার দিকে মুখ ফেরালেন। কর্ণেল ওয়াল্টার যখন বারো মাইল পশ্চিমে বিদ্রোহীদের সাকিন ঢুঁড়ে ফিরছেন অমর সিং তখন আরায় হাজির। আর দলবল নিয়ে আরা সহরের দোকান-পাট লুঠে-পুটে নিয়েছে, কোম্পানী যাদের সন্দেহ করে জেলে পুরেছিল তাদের মুক্ত করে দিয়েছে, খানদানি আদমিদের পঁচিশটা বাড়ি আগাপাস্তলা খুঁজে পেতে টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

ফেরবার পথে অমর সিং জুমেরিয়াতে হাজির হলেন। সেখানকার জমিদার প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী রাজভক্ত। এই লোকটা ধনজন দিয়ে সাধ্য মতো ইংরেজ ভক্তির পরকাষ্ঠা দেখিয়ে যাচ্ছিলো।

অমর সিং তক্কেতক্কে ছিলেন, সুবিধে পেয়ে জুমেরিয়াতে প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়িতে হানা দিলেন। রাত বোধ হয় তখন শেষ হয়ে এসেছে।

ঝিরঝিরে বিষ্টিতে জমিদারবাড়ির সবাই গাঢ় ঘুমে ডুবে ছিল। অন্ধকারে অমর সিং তার সোয়ারদের নিয়ে জমিদারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো বাড়ি। এই মুহূর্তে বাড়ির ভিতর ঢুকে প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীকে কোতল করা বা টাকাকড়ি লুটেপুটে নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ কিছু একটা করা দরকার যাতে লোকটার উপযুক্ত শিক্ষা হয়! কোম্পানীর দালাল এই জমিদারপুঙ্গব অমর সিংয়ের দলবলের খোঁজ-খবর কোম্পানীর দপ্তরে পাঠায়।

সহজ উপায়টাই গ্রহণ করলেন অমর সিং। দলবল নিয়ে তিনি বাড়ির ভিতরে বাইরে যেখানে যেখানে পারলেন আগুন লাগালেন। সারাবাড়ি ঘিরে যখন আগুনের শিখা লকলক করে উঠলো তখনই তিনি তার বনবাসের দিকে যাত্রা করলেন

পরদিন অন্তত সবাই নিশ্চিন্ত ছিল, আজ বোধহয় অমর সিংয়ের দল হামলা করতে আরার দিকে আসবে না।

রাত গভীর হতে পঞ্চাশজন ঘোড়সোয়ার অন্ধকার ফুঁড়ে আরার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝড়ের বেগে তারা এল আর ঝোড়ো বাতাসের মতো আরাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটপাট করে বেরিয়ে গেল।

কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ভারি বিপদে পড়ে গেলেন। কিছু একটা করা দরকার; কোম্পানীর মান-সম্মান লাটে উঠে যাবার দাখিল

এই সময় খবর এল, অমর সিংয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের একটা দল গয়ায় গিয়ে জেল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছে।

আরা জেলা আর তার আশপাশ এলাকার প্রশাসন একেবারে ভেঙে পড়লো।

অমর সিং যেন তুড়ি মেরে কোম্পানী-রাজের শাসন ব্যবস্থা মুছে দিয়ে নিজের একচেটিয়া শাসন কায়েম করেছেন।

এবার বিদ্রোহীকে দমন করতে এলেন ডগলাস। সিপাই বিদ্রোহে বহু যুদ্ধের তিনি নায়ক। মুশকিল আসানের জন্যে কোম্পানী তাকেই পাঠালেন।

ডগলাস এসে জঙ্গলের কাছে ক্যাম্প করলেন। কয়েক দিন ধরে জঙ্গলের চার-ধার ঘুরে সরেজমিনে তদন্ত করে শেষে এক সর্বাত্মক পরিকল্পনা করলেন। বিদ্রোহীদের আশ্রয় যে জঙ্গল সেটা ঘিরে ফেলা হবে তারপর তন্নতন্ন করে বনের সর্বত্র খুঁজে-পেতে বিদ্রোহীদের টেনে বার করা হবে।

সেই হিসেব মতো তার বাহিনীকে সাতটা ভাগে ভাগ করলেন। সাত দিক দিয়ে তারা হানা দিয়ে জঙ্গলের কেন্দ্রে গিয়ে মিলবে। জঙ্গল এলাকা নখদর্পণে এমন দুচার জন লোক জুটে গেল যারা টাকার লোভে বিদ্রোহীদের ডেরা দেখিয়ে দিতে রাজি হল।

শাল-সেগুনে দুর্ভেদ্য সেই অরণ্যে ডগলাস তার বাহিনী নিয়ে হানা দিলেন।

ভিজে-মাটি, অসংখ্য ঝোপঝাড়, পাহাড়ি নদীর আঁকাবাঁকা পথ-চলা আর টিলার সার জঙ্গলে সুলুক সন্ধান অসম্ভব করে তুলেছে।

সেই বনভূমির নিথর নির্জনতায় একমাত্র ঝিঁঝিঁর নক্সা বোনা গান ছাড়া অবিচ্ছিন্ন মৌনতা।

ডগলাসের বাহিনী অমর সিংহের বেপরোয়া বিসলাদারদের ভয়ে উদ্যত বেয়নেট তুলে চলেছে এক পা দু'পা যায় আর প্রতি ইঞ্চি মাটি প্রত্যেকটি গাছ তন্নতন্ন করে দেখে তবে আবার পা বাড়ায়।

বনে তখন উত্তরে বাতাসের ছোঁয়া লেগেছে। পাতা ঝরার খেলায় মেতে উঠেছে বনের গাছপালা। আলুথালু একটা চঞ্চলতা যখন বনভূমির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যায় ডগলাসের সেপাইরা বেয়নেট হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে—গোপন শত্রুর দিকে উদ্যত রাইফেল তুলে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় সংকটের প্রহর গোণে।

ডগলাস শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ। ইংলণ্ডের পোষ-মানা প্রকৃতির কোলে আশৈশব লালিত। নবক্ষ অঞ্চলের বনভূমির বিশালতা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, কাঁটা ঝোপ ও অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে-থাকা লতা-গুল্মের আধিক্য তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

পথ প্রদর্শক দীর্ঘকায় এক গাছের মাথায় উঠে দেখে শুনে নেমে এসে সাহেবকে জানালো, সামনের এই গাছপালাগুলো পার হলেই বিদ্রোহীদের ছাউনি দেখা যাবে।

তোড়-জোড় করে ডগলাস কয়েক পা মাত্তর এগিয়েছিলেন দলবল নিয়ে। হঠাৎ প্রবল জলস্রোত এসে আটকে দিল তাদের। থমকে গেল সবাই। বিষ্টি-বাদল-প্লাবন নেই অথচ এত তোড়ের সঙ্গে জল আসছে কোথা থেকে। ক্রমশ জল বাড়তে লাগলো। জলের বেগও বাড়তে লাগলো।

হুড়মুড় করে জলেরা যেন বাঁধভাঙা বন্যাস্রোতে ছুটে আসতে লাগলো। সেই খরস্রোতের মধ্যে এগনো যেমন কঠিন দাঁড়িয়ে থাকাও তেমনি অসম্ভব।

ডগলাসের মনে হল, যে ভাবে জল আর জলের চাপ বাড়ছে তাতে এখানে থাকলে হয়তো ডুবে মরতে হবে। ফিরতে হল তাকে প্রাণ হাতে নিয়ে। ভ্রূকুটি, বিরক্তি আর আক্রোশে তার মুখের চেহারাই পালটে গেছিল।

কোম্পানী কর্তৃপক্ষের চাপ আর বিদ্রোহীদের খোঁচা এই দুয়ের মধ্যে বিষণ্ণ ভাবে দিন কাটতে লাগলো ডগলাসের। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না; তবে অমর সিং আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের যে-কোন ভাবে শায়েস্তা করা দরকার এই ভাবনাটা মনে-মনে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো।

এমন সময় একদিন জুনিয়র হ্যাভেলক এসে হাজির। (লক্ষ্ণৌ যুদ্ধে তার বীরত্ব প্রবাদ হয়ে রয়েছে!) তিনি ডগলাসকে পরামর্শ দিলেন, ক্যাপ্টেন জঙ্গলে পায়ে হেঁটে এই সব দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করা মুশকিল—কেন না এই সব বনবাদাড়ের অলিগলি-চোরাপথ এদের এমন রপ্ত যে পলকে উধাও হয়ে যেতে পারে। তাই বলছিলাম চোখ তুলে তাকালেন ডগলাস, ক্যাভালরি লাগান। মনে হয় কাজ হবে।

আখা যাক। সিগারে দীর্ঘ টান দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন কর্ণেল ডগলাস।

তারিখটা ছিল ১৮৫৮র অক্টোবর ২০।

রাত থাকতেই একদল বাছাই করা অশ্বারোহী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডগলাস।

দু'একদিন পরে বেরোবার কথা ছিল। ইচ্ছে করেই কর্ণেল সাহেব সময়টা এগিয়ে নিয়ে এলেন। আগে ঠিক ছিল হানাদারিটা দিনের বেলাতেই শুরু হবে, খবরটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়লেন।

পাকাপোক্ত ট্রাকার দিয়ে বিদ্রোহীদের আস্তানার হাল-ফিল সাকিন জোগাড় করে নিয়েছিলেন। সুতরাং বিনা তকলিফে অন্ধকারের কালি-ঝুলি মুড়ি দিয়ে মস্ত এক জলাভূমি পেরিয়ে বিদ্রোহীদের আস্তানায় গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন

বিদ্রোহী সেনাদের কেউ-কেউ সেই আস্তানায় সংসার পেতেছিল।

কোম্পানীর কশাইরা নির্বিচারে হত্যা করলো নারী-পুরুষ-শিশুকে।

মন্দভাগ্য মানুষগুলো কিছু বুঝে উঠবার আগেই গুলিতে ঝাঝরা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাদের অসহায় আর্তনাদ বনভূমির নির্জনতায় বিস্ময় ঘটিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

যে-সব সাহসী হাত অন্ধকারে শেষবারের মতো হাতিয়ার হাতড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল মুখ থুবড়ে পড়তে হল তাদের মাটিতে।

ছড়িয়ে থাকা মৃত-মুমূর্ষুদের মধ্যে ক্যাপ্টেন ডগলাস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা অমর সিংয়ের মৃতদেহ খুঁজে হয়রান হল। শেষে বুঝে নিতে কষ্ট হল না, যাদের ধরবার জন্যে এই আয়োজন—সেই অমর সিং, নিশান সিং, হরকিষেন সিং হাতের মুঠো থেকে পিছলে গেছে।

তবু এই স্বস্তিটুকু ডগলাস বোধ করেছিলেন, বিদ্রোহীদের শক্তি একেবারে গুঁড়িয়ে

দেওয়া গেছে। আবা প্রশাসন এখন নিশ্চিন্ত। বিদ্রোহীদের রাত-বিরেতের হানাদারি আর আবা জেলার চোখের ঘুম কেড়ে নিতে পারবে না।

১৮৫৮র নভেম্বরে কাইমর পাহাড থেকে জরুরি এক খবর ভেসে এল, বিদ্রোহীরা নাকি পালিযে গিযে সেখানে ডেরা বেঁধেছে। লোকজন আর হাতিযার জোগাড় করে আবার নাকি আবার দিকে হানা দেবার মতলব ভাঁজছে। বিদ্রোহীদের নেতা অমর সিং, নিশান সিং আর হরকিষেণ সিংকে সেখানেই দেখা গেছে।

সেবার নভেম্বরেই পাহাডি এলাকায জাঁকিযে শীত নেমেছে।

শুকনো পাতায ভরে উঠেছে বনস্থলী।

শোণ থেকে হু-হু করে উত্তুরে বাতাস ছুটে আসছে।

সেই হাড-কাঁপানো শীতের মধ্যে বেরিযে পডলেন ডগলাস।

কুয়াসায় ঢাকা পাহাড় জঙ্গল-খেতি-জলা পার হযে এগিযে চললো তারা।

ডগলাস যে এখানে হানা দিতে পারেন বিদ্রোহীরা সেটা ধারণা করতে পারেন নি। আচমকা এই হানাদারি তাদের বিমূঢ করে ফেলেছিল। তারা যখন খবর পেলেন ডগলাস তখন পালানোর সবকটা পথে ওৎ পেতে বসেছেন

কাইমর পাহাড়ের যে উপত্যকায অমর সিং তার দলবল নিযে ডেরা পেতেছিলেন নিশুতরাতে সেই পাহাড়ের নিচে পৌছে চারপাশ ঘিরে সকালের প্রতীক্ষায রইলেন ডগলাস।

সেদিনও সকালের মুখ ছিল কুয়াশায ঢাকা। গাছপালা জডিযে-ছাডিযে গাঢ কুয়াসা পাহাড়টাকে বুঝি অদৃশ্য করে দিযেছে।

সূর্য আর ওঠে না। অধৈর্য ডগলাস কুযাশার ভিতরেই অভিযান স্বরু করলেন। প্রচণ্ড বাধা দিল বিদ্রোহীরা। চট করে এগোতে পারলেন না ডগলাস। সেই কুয়াসা -ঢাকা সকালের মুখ বুলেটে ঝাঁঝরা হযে গেছিল।

কেউ কাউকে দেখতে পারছে না অথচ দুপক্ষেরই গুলি চলছে অবিরাম। ঘণ্টা কয়েক লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীরা চুপ মেরে গেল।

মৃত্যুর নির্জনতা নেমে এল কাইমর পাহাডে।

ক্যাপ্টেন ডগলাস জাল গোটালেন। এবারে আর একেবারে ব্যর্থ হলেন না। ধরা পডলেন, নিশান সিং, হরকিষেণ সিং। অমর সিং তবু হাতের বাইরে রযে গেলেন।

সেই দুরন্ত বীরত্ব কাইমর পাহাড়ের মতো চিরকাল মাথা উঁচু করে রইলো। ইংরাজদের অত্যাচারী হাতের কলুষ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তার অজ্ঞাতবাস সকলের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল।

ইংরাজ জিঘাংসা নিশান সিং আর হরকিষেণ সিংকে সাড়ম্বরে ফাঁসি দিল।

১৮৫৮য় অক্টোবরে নেপালের রানা জং বাহাদুর কর্ণেল র‍্যামসের কাছে খবর পাঠালেন: জগদীশপুরের অমর সিং তরাইতে বিদ্রোহীদের পক্ষে নানা সাহেব ও বালা সাহেবের সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন।

তারপর ইতিহাস তার সম্পর্কে একেবারে বোবা!

ঝাঁসির পর কালপি পেশোয়া শক্তির স্নায়ুকেন্দ্র

এখানেই বর্ষার কেঁপে-ওঠা নদীর মতো বিদ্রোহীদের সমাবেশ ঘটছে।

দিল্লি গেছে। লক্ষ্ণৌ গেছে উত্তর ভারতের প্রধান দুটো ঘাঁটি হাত-ছাড়া হয়ে যাবার পর কালপিতেই বিদ্রোহী নেতারা এসে তাঁবু ফেলেছেন। এখানে তাদের শলা-পরামর্শের আসর বসবে।

অথচ ঝাঁসিতে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

মাত্তর দু'হাজার সৈন্য নিয়ে হিউ রোজ ঝাঁসি অবরোধ করে বসলেন—তারপর দুড়ুম-দুড়ুম করে কামান দেগে চললেন। আর সেই কামানের ঘায় দুর্গের বুরুজ পড়লো ভেঙ্গে—প্রাকারের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচিলের কতক-মতক উড়ে গেলে বিদ্রোহীদের কামান বে-আবরু হয়ে পড়লো—গোলন্দাজদের দাঁড়াতে হল কোম্পানীর গোলা-বারুদের মুখে। এতটুকু রাখ-ঢাক নেই। ফলে বিদ্রোহীদের কামানগুলো বোবা মেরে গেল। হয়তো দু'একদিনের মধ্যে ঝাঁসি বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে।

এই রকম একটা মুহূর্তে তাঁতিয়া টোপী বাইশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দুর্বার গতিতে ঝাঁসির সদরে এসে হাজির হলেন। তার সৈন্যবাহিনীর তুমুল কোলাহলে ও কামানের বজ্র-গর্জনে হিউ রোজ থরথর করে কেঁপে উঠলেন। বাইশ হাজার সেপাইর সামনে তো দু'হাজার তো ফুঁয়ে উড়ে যাবে। তার উপর আরো সঙ্কট তাঁতিয়াকে ঠেকাতে গেলে ঝাঁসি থেকে অবরোধ তুলে নিতে হয়। আবার অবরোধ বজায় রাখতে গেলে তাঁতিয়াকে ঠেকানো হয় না। যে দিক থেকে মুখ ফেরাবেন সেই দিক থেকে শত্রু এসে হানা দেবে। তবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকলেও চলবে না—মৃত্যু পর্যন্ত সৈনিককে কর্তব্য করে যেতে হয়। তাই হিউ রোজ পাঁচ-ছ'শ সৈন্য মোতায়েন করে অবরোধের কাজ চালু রেখে পনেরো শ' সৈন্যের একটা বাহিনী নিয়ে তাঁতিয়ার মুখোমুখি হতে চললেন।

হয়তো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, হয়তো যুদ্ধ জয়ের দ্রুত প্রচেষ্টা কিম্বা কে জানে হয়তো অন্য কিছু তাঁতিয়ার বিপর্যয় এনে দিল।

হিউ রোজ নাম মাত্তর সৈন্য নিয়ে তাঁতিয়াকে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলেন যে

বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে কালপির দিকে সরে গেল। এত তাড়াতাড়ি তাদের সরে পড়তে হল যে যাবার পথে বেশ কয়েকটা কামান আর প্রচুর গোলা-বারুদ ফেলে যেতে হল। তারিখটা ১লা এপ্রিল।

এদিকে ঝাঁসিদুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ যারা রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের নেতৃত্বে অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলো এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁতিয়া টোপীর সাহায্যের প্রত্যাশা করছিল তাদের আত্মসমর্পণ করা অথবা দুর্গ ছেড়ে সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। ৪ এপ্রিল রাণী লক্ষ্মীবাঈ দুর্গ ত্যাগ করলেন। ৬ এপ্রিল ঝাঁসির যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

রাণী কালপিতে গিয়ে তাঁতিয়া টোপীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

এদিকে হিউ রোজ ঝাঁসির দখলদারি বজায় রাখার ব্যবস্থা করে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের পেছনে ছুটলেন।

তাঁতিয়া আর লক্ষ্মীবাঈয়ের সম্মিলিত বাহিনী কোঁচ সহরে হিউ রোজকে আটকালেন। স্থানীয় জমিদার এবং সামন্ত-প্রধানেরা তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। তবু হিউ রোজকে ঠেকানো গেল না। হিউ রোজ এখানেও তাদের সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত করলেন।

যুদ্ধে হেরে তাঁতিয়া গোয়ালিয়র যাবার পথে জালাউর থেকে চার মাইল দূরে চিরকিতে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চলে গেলেন। হয়তো তার কোন গোপন উদ্দেশ্য ছিল।

পরাজিত বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত সেনারা সব কালপিতে এসে জমতে লাগলো। এই পরাজয় তাদের মনে প্রচণ্ড অসন্তোষের সৃষ্টি করলো। পরস্পরের প্রতি তারা দোষারোপ করতে লাগলো। নিদারুণ আত্মগ্লানিতে ভরে গেল তাদের মন। এই পরাজয়ের জন্য একদল আরেক দলের সঙ্গে তুমুল কলহ ও বাকবিতণ্ডায় মত্ত হয়ে উঠলো।

পর-পর দুটো যুদ্ধে হেরে বিদ্রোহী ফৌজের এমন মনের অবস্থা হল যে যেই তারা শুনলো হিউ রোজ কালপির দিকে এগোচ্ছে অমনি তারা ডেরাডাণ্ডা তুলে ভেগে যাবার ফিকির করতে লাগলো।

এই অবস্থায় বান্দার নবাব আলি বাহাদুর কালপি এসে হাজির হলেন। লক্ষ্মীবাঈ তো আগেই এসে পৌঁছেছিলেন আর রাও সাহেব তো কানপুর থেকে সোজাসুজি কালপিতে এসে উঠেছেন।

এই ডামাডোলের বাজারে এগিয়ে এলেন রাও সাহেব। নানাসাহেবের ভাই-পো পেশোয়া পরিবারের সবচেয়ে উৎসাহী এবং কর্মঠ যুবক। তিনি বান্দার নবাব আলি

সাহেব ও ঝাঁসির রাণীকে নিয়ে ক্ষুব্ধ সেপাইদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন। তাদের নতুন করে উৎসাহ যোগালেন। নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে তাদের সামিল করলেন।

নানা সাহেবের ভাই-পো রাও সাহেব এই প্রথম সঙ্কীর্ণ দিনযাপনের সীমানার বাইরে এসে ইতিহাসের এক দুর্যোগমন্দ্রিত প্রহরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন।

পেশোয়া শাহীর শেষ পুরুষ দ্বিতীয় বাজীরাও। ১৮১৭—১৮ সালে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে ইংরাজদের কাছে হেরে রাজ্যপাট হারিয়ে বিঠুরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। জায়গাটা কানপুরের কাছাকাছি। ব্রিটিশ সরকার তার জন্যে বার্ষিক বরাদ্দ করেন আট লাখ টাকা। বাজী রাওয়ের ছেলে ছিল না। তাই তিনটি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন ধুন্দু পন্থ বা নানা সাহেব, সদাশিব পন্থ বা দাদা সাহেব আর গঙ্গাধর রাও বা বালা সাহেব।

বাজী রাওয়ের মৃত্যুর আগেই তার এক দত্তকপুত্র সদাশিব পন্থ একটি মাত্র ছেলে রেখে মারা যান। এই ছেলেই পাণ্ডুরঙ রাও বা রাও সাহেব।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর সবচেয়ে বিস্তৃত মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজ্যহীন উত্তরাধিকারীদের বিষয়-বৈভবের কিছু অভাব ছিল না। হীরে-জহরত-মণি-মাণিক্য-সোনা-রুপোর স্তূপীকৃত সঞ্চয় কুবেরের ভাণ্ডারকেও হার মানায়। সুতরাং অকর্মণ্য ও অলস পেশোয়া ও তার পরিবারবর্গ সঞ্চিত সম্পদ ও ব্রিটিশ মাসোহারার উপর নির্ভর করে, 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাকনা'। ১৮৫ সালে বাজী রাওয়ের মৃত্যু হলে ব্রিটিশ সরকার নানাকে তার সঞ্চিত সম্পদও বিঠুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্বীকার করলেও বার্ষিক বরাদ্দ নাকচ করে দিলেন।

কোন পেশোয়ারের যখন মৃত্যু ঘটে তখন তার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে পাঁচটি মহাদান দেওয়া হয়: হাতি, ঘোড়া, সোনা, মণি-মুক্তো আর ভূমি। পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ যেমন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের শ্রাদ্ধকার্যেও সেই সমারোহের কোন কার্পণ্য ছিল না।

ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য নিয়ে বিস্তৃত চন্দ্রাতপের তলে দানসামগ্রী সাজানো। অভ্যাগত-আত্মীয় স্বজনে শ্রাদ্ধবাসর পূর্ণ।

কৃষ্ণকায় মারাঠা ব্রাহ্মণ উদাত্তকণ্ঠে দানের মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন। চারবার দানের মন্ত্রোচ্চারণের পর থেমে যেতে হল। ভূদান সম্পর্কে তো কিছু বলা হয়নি। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কোন গ্রাম দান করবেন নাম বলুন?

পেশোয়া বংশের প্রধান পুরুষ নানা সাহেব ভাই আর ভাইপোর মুখের দিকে তাকালেন। কারো মুখে কোন কথা নেই।

হায়রে কপাল, মহারাষ্ট্র থেকে পাঞ্জাবের সীমানা ছুঁয়ে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড একদিন যাদের পদানত ছিল সামান্য পাঁচখানা গ্রামও এখন তাদের মুঠোর বাইরে! ছুঁচের পরিমাণ জমিও তাদের নেই।

শ্রাদ্ধ বুঝি পণ্ড হবার দাখিল।

নিরুপায় হয়ে নানা সাহেব পণ্ডিতদের বিধান চাইলেন মহাদান থেকে ভূমিদান বাদ দিলে শ্রাদ্ধের অঙ্গহানি হবে কি না?

পণ্ডিতেরা কি বিধান দিলেন তারাই জানেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেখানে পেশোয়া বংশের একান্ত অনুগত ও শুভাকাঙ্ক্ষী সদার রঘুনাথ রাও ভিনচুরকার উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধে ভূমিদান বাদ যায় দেখে নানাকে অনুরোধ করলেন, আপনাদের কাছ থেকে জায়গীর পাওয়া বাহান্ন খানা গ্রাম আমার আছে। ভূমিদানের জন্যে যা দরকার এর থেকে নেওয়া হোক।

পেশোয়া পরিবারের প্রতি রঘুনাথ রাওয়ের এই অসামান্য শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখে নানার চোখে জল এসে গেল।

শ্রাদ্ধকার্য শেষ হল। সমাগত সুহৃদ-স্বজনেরা ফিরে গেলেন।

পূর্ব-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের এই আয়োজন পেশোয়া বংশধরদের এক চরম বাস্তবের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। তাদের রাজ্যপাট যা ছিল কোম্পানীশাহী তার হিংস্র জিহ্বার লোভ মেলে দিয়ে চেটেপুটে নিঃশেষ করে ফেলেছে। বিশাল ভারতবর্ষে বসতবাড়ির ভূখণ্ডটুকু ছাড়া তাদের আয়ত্তে মাটি আর নেই।

দারুণ একটা আক্রোশ রাজপুত্রদের মনে ফোনযে উঠতে লাগলো কোম্পানী শাহীর বিরুদ্ধে। কিছু একটা করা দরকার। অবশ্য এরি মধ্যে নানা সাহেব একজন তরুণ কর্মচারী আজিমুল্লা খানকে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্সে তার আবেদনের তদ্বির-তদারক করতে বিলেত পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজিমুল্লা খান বিলেতে হাজির হবার আগেই কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স তার বার্ষিক বরাদ্দের আবেদন সরাসরি নাকচ করে দেন।

কিছু একটা করা দরকার। ইংরাজের এই বেয়াদপির উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথরের মত নানা সাহেবও নানা ফিকিরের সুলুকসন্ধান করতে-করতে, হঠাৎ তার মনে হল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষের আশ্রয় নেওয়া দরকার। গুরু পাকড়ালেন তিনি।

দাসা বাওয়া নামে এই গুরুদেব কাশ্মীর উপত্যকার লোক—কাংড়ার ওপার কালিধারে তার বাড়ি। দাসা বাওয়া নাকি বহুবিধ অলৌকিক প্রকরণে সিদ্ধপুরুষ।

তাকে ধরে পড়লেন নানা। বললেন, এই তো আমাদের হাল। জানিনে কপালে আরো কি আছে। অনুগ্রহ করে আমার ভবিষ্যতটা যদি বলে দেন। পূর্বপুরুষের ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য কি কোন দিন ফিরে পাব—না, চিরকাল কোম্পানীর নাগড়া বয়ে বেড়াতে হবে ?

দাসা বাওয়া ছক কেটে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান হিসেব-নিকেশ করে বললেন, বৎস সেদিনের আর দেরি নেই—অল্পদিনের মধ্যে পূর্বপুরুষদের সমস্ত ক্ষমতা তোমার উপর বর্তাবে—অপ্রতিহত প্রভাবে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে।

খুশি হয়ে নানা সাহেব তাকে পাঁচলাখ টাকার জায়গীর আগে-ভাগে দিয়ে রাখলেন। অবশ্য ব্যবস্থাটা নানা সাহেব পেশোয়া হবার পর কার্যকর হবে।

এরপর দাসা বাওয়া নানার আটকোণা হনুমান কোষ্ঠীপত্র করে দিলেন। নানা সাত দিন ধরে পুজো ব্রত-উপবাসের পর সেই হনুমান কোষ্ঠীপত্রিকার উপর শুয়ে ঘুমোতে গেলেন।

লোকশ্রুতি, ভগবান পবন-নন্দন স্বয়ং তাকে দেখা দিয়ে, 'জয়যুক্ত হও' বলে আশীর্বাদ করে গেছেন।

খুশি হয়ে নানা গুরুকে পাঁচশ হাজার টাকা মূল্যের হীরে-জহরত প্রণামী দিলেন। প্রণামী নিয়ে গুরুদেব হিমালয়ের উপত্যকায় নেপালে চলে গেলেন।

এরপর নানা সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন। এবং গোপনে ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পাততে লাগলেন। আর সে-জাল সাঁতরা, কোলাপুর, সিন্ধিয়া থেকে হোলকার রাজ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে চাইলেন।

বাইরে তার ইংরেজদের প্রতি বুঝি প্রীতি ও ভালবাসার অন্ত ছিল না। কানপুর গ্যারিসনের অফিসারদের সঙ্গে তো তার মাখামাখি ছিল। বিঠুরের রাজপ্রাসাদের হর-বখত্ খানাপিনার ঢালাও আসর বসতো। গোরা সাহেবদের সেখানে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ বাঁধা ছিল। সারারাত উৎসব চলতো। পান-ভোজনের কৃপণতা থাকতো না। ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় গন্ধর্বপুরীর ললন্তিকা বিলাসিনীদের মত রূপসী বাইজীরা সেই সভায় মদালস শরীরের লাবণ্য বিস্তারের সঙ্গে ঠুম্‌রি-গজল-টপ্‌পার বাহার ছড়িয়ে দিত।

সাহেবদের পার্টির নিমন্ত্রণ নানার পক্ষে রাখা সম্ভব ছিল না কেন না পেশোয়া হিসেবে তাকে কোন সেলাম মঞ্জুর করা হয় নি। নানার মনে যাই থাক বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না।

আগ্রার জেলা জজ মিষ্টার মোরল্যাণ্ড ১৮৫৭র এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নানা

সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। সাহেব তার বিবরণে লিখেছেন, বন্ধু হিসেবেই আমরা খোলামেলা আলাপ করেছিলাম। সন্দেহ করবার মত কিছু দেখতে পাই নি। নানাকে আগের মতই আবেগে উচ্ছ্বসিত দেখা গেল। এবং আমাদের প্রতি তার কথাবার্তা সহৃদয় সম্ভ্রমে পূর্ণ ছিল।

ছোট ভাই গঙ্গাধর রাও বা বালা সাহেব একেবারে ছা-পোষা মানুষ ছিলেন। তার কোন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল না; তবে স্বভাবতই পেশোয়াদের পূর্বগৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হোক এ কামনা তার মনেও ছিল। জ্যেষ্ঠ নানা সাহেবের তিনি ছিলেন 'লক্ষ্মণ ভাই'। এ ছাড়া তার দিন আপ্লুত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সময়ের সমুদ্র পারাপার করতো।

ভাই-পো রাও সাহেব একটু স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। পেশোয়ার-বংশের দুরবস্থা তার মনে বেজেছিল সব চেয়ে বেশি। এই সম্ভ্রমহীন সাজানো ঐশ্বর্যের ভিতরটা যে ফাঁপা সে-খবর পিতামহের শ্রাদ্ধের সময় নির্মম ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর তাই তাকে কেমন বিদিশা করে তুলেছিল। কাজে মন বসতো না। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন পাহাড়ে-প্রান্তরে। কিসের খোঁজে যেন ঘুরে বেড়াতেন। আর মনের মধ্যে ঘর বেঁধে একটাই আকাঙ্খাকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন: যদি সুযোগ কখনো আসে পেশোয়াদের অধিকারের সীমানা থেকে কোম্পানীর নৃশংস লোভ আর অত্যাচারকে হঠিয়ে দিতে হবে।

সুযোগও হঠাৎ একদিন এসে গেল।

কালের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল মহাকালের মন্দিরে

সেপাইদের তরবারি আকাশে মাথা তুললো। তারা হেঁকে উঠলো, আংরেজ মারো—আংরেজ হঠাও—

কানপুর থেকে ইংরেজ শাসন মুছে গেল নানা সাহেব পেশোয়া হয়ে বসলেন। তিনিই রাও সাহেবকে আদেশ দিলেন, যাও, আমার প্রতিনিধি হয়ে সেপাই নিয়ে তাঁতিয়াকে সাহায্য করতে কালপির দিকে এগোও।

বিশাল এক বাহিনী সাজিয়ে কালপির দিকে যাত্রা করলেন রাও সাহেব।

'ধূলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে লুকালো প্রভাত-সূর্য।'

কালপির দুর্গ যমুনার দক্ষিণ পারে একেবারে খাড়া পাহাড়ের মাথায়। তিন দিকে দুর্গম গিরিখাতে ঘেরা। সেখানে ঘোড়া চলে না। কামানের গাড়ি চলে না। বর্ষায় বিষ্টি নামলে এ-পথ একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ছাড়াও গভীর পরিখা কেটে কালপি দুর্গকে আরো

সুরক্ষিত করা হয়েছে। সুতরাং পারাপারের সেতু তুলে দুর্গের ঝাঁপ নামিয়ে দিলে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না।

রসদ-পত্তর ও গোলা-বারুদও প্রচুর মজুদ করা হয়েছে।

বিদ্রোহীরা এখানে জোর লড়াই দিতে চায় ঝাঁসি থেকে হঠে আসার প্রতিশোধ এখানেই নেবে।

নেতৃত্বেরও ভাবনা নেই।

ঝাঁসির রাণী আছেন। বান্দার নবাব আলি বাহাদুর আছেন। তাঁতিয়া টোপী আর রাও সাহেব তো আছেনই।

দিগ্‌দেশ থেকে আরো বাগী সেপাই কালপির দিকে আসছে।

কালপির দুর্গ এখন জম-জমাট। বুরুজে কামানের সার মাথা উঁচু করে আছে। দুর্গ-চত্বরে সকাল-সন্ধ্যে সিপাইদের কুচকাওয়াজ চলছে।

ইতিমধ্যে নেতৃত্ব দুর্গকে আরো সুরক্ষিত করবার জন্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে সামরিক দিক দিয়ে সুবিধে-জনক একটা জায়গা পেয়ে গেলেন ঝাঁসি রোডে সেখানেই কামান পেতে সৈন্য সাজিয়ে শত্রুর প্রতীক্ষায় দাঁড়ালেন।

এদিকে কোম্পানী প্রশাসনও জানতেন, কালপি দুর্গের পথ বড় দুর্গম। দুস্তর নদী ও গিরিখাতের পাহারা পেরিয়ে এগোতে হবে। সুতরাং রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া টোপী মধ্যভারতে ব্রিটিশ সামরিক মর্যাদা যে-ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছেন তাতে তাড়াতাড়ি করে কোন ব্যবস্থা না-নিলে হয়তো পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

তাই ম্যাক্সওয়েলকে গোপনে নির্দেশ পাঠানো হল, নিঃসাড়ে এগিয়ে পিছন দিক থেকে শত্রুকে আঘাত হানো।

নির্দেশ পাওয়া মাত্তর, ম্যাক্সওয়েল এগিয়ে এসে যমুনার উত্তর পারে গোলা-উলিগাঁ'য়ের ঠিক উল্টো দিকে ছাউনি ফেললেন।

হিউ রোজ দম ধরে বসেছিলেন, যেই খবর পেলেন ম্যাক্সওয়েল শত্রুদের প্রায় পিঠের ওপর গিয়ে পৌঁছেছেন অমনি বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। ইংরেজদের হাউটজার কামান গর্জে উঠলো।

কঠিন লড়াই বেঁধে গেল।

রোজ যতবার এগিয়ে আসে বিদ্রোহীরা ততবারই তাকে দুমড়ে-মুচড়ে ফিরিয়ে দেয়।

বিদ্রোহীদের সামনে দাঁড়িয়ে চার প্রধান।

বান্দার নবাব আলি বাহাদুর, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাও সাহেব আর তাঁতিয়া টোপী।

এমন সময় গুপ্তচর খবর নিয়ে এল, ম্যাক্সওয়েল যমুনা পেরিয়েছেন।

বিদ্রোহী নায়কেরা বিপদে পড়ে গেলেন!

ম্যাক্সওয়েল যে যমুনা পেরিয়ে বেহোড়ের পথে হানা দিতে পারে এটা তাদের হিসেবের বাইরে ছিল। যে-পথে ঘোড়া চলে না, কামানের গাড়ি চলে না সে-পথ দিয়ে এগিয়ে এসে কেউ আক্রমণের ঝুঁক নিতে পারে এটা তাদের কল্পনায়ও আসে নি।

খবর ছড়িয়ে গেল। আতঙ্কের ছোয়া লাগলো সেপাইদের মনে। সামনে হিউ রোজ পিছনে ম্যাক্সওয়েল হিংস্র তেঁতুয়ার মত শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে কঠিন নখের ধার মেলে এগিয়ে আসছে আর এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে বে-ঘোরে প্রাণ হারাতে হবে এই আশঙ্কায় বিদ্রোহীদের পায়ের তলা থেকে শক্ত ভিৎ বুঝি সরে গেল।

তবু বিদ্রোহীরা লড়াই চালিয়ে যেতে চাইলো। অন্তত ম্যাক্সওয়েল আসবার আগে। পরদিন সকালে দেখা গেল, ম্যাক্সওয়েলের বাহিনী সেই তিনটে গিরিপথ ধরে পিলপিল করে এগোচ্ছে।

২৩ মে কাল্পির যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

রক্তক্ষয়ী এক সংগ্রামের পর কাল্পি দুর্গ ছেড়ে সবে আসতে হল। যমুনার দক্ষিণে বিদ্রোহীদের শেষ শক্তিকেন্দ্র হাতছাড়া হয়ে গেল। যুদ্ধ চালানোর জন্যে নতুন কোন জায়গা চাই।

বিদ্রোহী নেতাদের আবার মন্ত্রণা সভা বসলো।

সেপাইরা ইতিমধ্যে বায়না ধরলো অযোধ্যা চলো!

ঝাঁসির রাণী বললেন, আমার পছন্দ করেবা কিংবা বুন্দেলখণ্ডের কোন জায়গা। যেখানে একটু সুস্থির হয়ে নতুন উদ্যমে লড়ে যাওয়া যাবে।

মাথা নাড়লেন তাঁতিয়া। না, বুন্দেলখণ্ডে খুব সুবিধে হবে না অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহের খুব সুবিধে নেই। তা'ছাড়া সেখানকার বাসিন্দাদেরও আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতি নেই। হয়তো ইংরেজদের প্ররোচনায় আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রও ধরতে পারে। আর সে ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে।

রাও সাহেব এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

রাও সাহেব দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালেন, উত্তর ভারতে আর নয়। অনেক চেষ্টা তো করে দেখা গেল। আমার মনে হয় ইংরেজ উপদ্রুত-উত্তর এলাকা ছেড়ে মহারাষ্ট্রে

গিয়ে ঘাঁটি গাড়াই উচিৎ হবে। সেখানে আমরা অন্তত শত্রুদের মধ্যে থাকবো না।

পেশোয়াদের সমৃদ্ধির দিনে সেখানকার মানুষেরা যথেষ্ট সুখ শান্তি ভোগ করেছেন। যথেষ্ট নিরাপত্তা পেয়েছে, সম্পদও তাদের ভাগ্যে জুটেছে। হয়তো সে-সব স্মৃতি এখনো একেবারে মুছে যায় নি। পেশোয়াদের নাম শুনলে হয়তো তাদের মরচে পড়া তলোয়ারে শান দিয়ে আমাদের সঙ্গে সামিল হতে পারে। জমিদার-সামন্ত-রাজার দল হয়তো সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াতে পারে।

সবাই চুপ করে রইলেন।

কে জানে, রাও সাহেবের পরামর্শ মত কাজ হলে হয়তো সিপাই বিদ্রোহের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হত

অনেকক্ষণ বাদে তাঁতিয়া টোপী নতুন প্রস্তাব দিলেন হাতের কাছে গোয়ালিয়র— সিন্ধিয়ার কেল্লা, সেখানেই চেষ্টা করে দেখা যাক। তা'ছাড়া আমি ইতিমধ্যে একবার গোয়ালিয়র ঘুরে এসেছি। সেখানকার সেপাইরা বোধহয় আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাও সাহেব স্বগতোক্তি করলেন, এমন কপাল প্রথম বাজী রাওয়ের নাগড়া-বরদার রণজী সিন্ধিয়ার বংশধর জয়াজীরাও সিন্ধিয়া পেশোয়ার এই দুঃসময়ে দুশমনের পক্ষ নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করতে চাইছে।

কেউ একবার গিয়ে চেষ্টা করে দেখলে হত সিন্ধিয়াকে আমাদের মতে আনা যায় কি না। বান্দার নবাব সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

তেমন বান্দা সিন্ধিয়া নয় উঠে দাঁড়ালেন রাও সাহেব, গোয়ালিয়র নিতে হলে আমাদের সৈন্য সাজিয়ে এগোতে হবে

১৮৫৭র কিছু আগে জয়াজী রাও সিন্ধিয়া কলকাতা ঘুরে এসেছেন।

পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর চার্টার ম্যাকফারসন বললেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি একবার চলুন কলকাতা ঘুরে আসবেন—

আমি। অবাক হলেন সিন্ধিয়া।

হাসলেন মেজর। পরিমিত এক চিলতে হাসি। দাঁতের একটুখানি ঝকঝক করে উঠলো, হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আবার কে।

—আমি কলকাতায় গিয়ে কি করবো।

—কোম্পানির হয়ে আপনাকে আমি কলকাতায় নেমন্তন্ন করছি। একটু সময় করে গিয়ে দেখে আসবেন—কলকাতাকে আমরা কেমন করে সাজাচ্ছি। অবশ্য গোয়ালিয়রের মত এত শ্রী ও সমৃদ্ধি কলকাতার নেই তবু আপনার হয়তো ভাল লাগতে পারে।

কলকাতায় একবার সময় করে যেতে হল সিন্ধিয়াকে মেজর ম্যাক্‌ফারসনের অনুরোধে।

বেশ স্ফূর্তিতে কেটেছিল নানা রঙের দিনগুলো।

পোলো খেলার মাঠে, গঙ্গার স্টীমারবিহারে, গভর্ণর জেনারেলের বাড়ির পার্টিতে ম্যাক্‌ফারসন ছায়ার মতো লেগেছিলেন যাতে মহামান্য সিন্ধিয়ার কোন তকলিফ না হয়।

সেইসব উত্তেজক মুহূর্তে স্ফটিকপাত্রের সামনে বসে সিন্ধিয়ার কানে কানে বলেছিলেন, ইয়োর ম্যাজেষ্টি, এ কথা আপনাকে মানতেই হবে যে জাতিগত পার্থক্যের জন্যে আপনার অবস্থাটা একটু আলাদা। ভেবে দেখবেন. ব্রিটিশরা যদি সত্যি এদেশ থেকে চলে যায় তবে আপনার অবস্থা কি হবে! একটু থেমে সিন্ধিয়ার মুখের দিকে তাকান মেজর ম্যাকফারসন: তারপর একটুখানি তরল দ্রাক্ষাসাবে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলেন, যেদিন কোম্পানী ভারত ছাড়বে তার পরদিনই দেখবেন, জাঠ-বুন্দেলা-রাজপুতরা মাথা তুলেছে—তাদের বেওনেট আর তরবারি মারাঠীদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর তার ফল কি সাংঘাতিক হবে—। কথার সবটুকু শেষ না করে ম্যাক্‌ফারসন একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে সিন্ধিয়ার মুখের পরিলিখন তন্নতন্ন করে মেপে-জুকে তার মানসিক অবস্থার হদিশ পেতে চাইলেন।

জয়াজী রাও সিন্ধিয়ার অভিজাত মুখে কোন ভাবনার আলোছায়া দেখা গেল না গাঢ় পিঙ্গলরঙের চোখদুটো অপলক হয়ে মেজরের মুখের উপর আটকে রইলো।

এই অবসরে ম্যাকফারসন চুরুট ধরিয়ে গাঢ় ধোঁয়া ছাড়লেন। ধোঁয়ার আড়াল থেকে মেজর সিন্ধিয়ার কানে মন্ত্র দিলেন, কাজেই আপনার বোধহয় কোম্পানীর সঙ্গে থাকাই ভাল।

কলকাতা থেকে গোয়ালিয়র ফিরলেন সিন্ধিয়া।

শুরু হল ১৮৫৭-র সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রাম। মীরাট-দিল্লি-অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌর সংঘাত-সংঘর্ষের স্ফুলকি ছিটকে যেতে লাগলো চারদিকে।

গোয়ালিয়র প্রাসাদ-দুর্গের নিভৃত কক্ষে জয়াজী রাও সিন্ধিয়ার চোখের ঘুম বারবার ভেঙে যেতে লাগলো। তার কানে অহরহ ম্যাক্‌ফারসনের মন্ত্র গুঞ্জরিত হতে

থাকলো: আপনার বোধহয় কোম্পানীর সঙ্গে থাকাই ভাল। আপনার স্বার্থ আর কোম্পানীর স্বার্থ আলাদা নয়।

এ সময় আগ্রায় বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠলো।

কোম্পানী সিন্ধিয়ার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো, আগ্রায় একদল সেনা পাঠিয়ে দিলে কোম্পানী অনুগৃহীত হবে।

জয়াজী রাও তখুনি তার একদল দেহরক্ষীকে পাঠিয়ে দিলেন

কাজটা ভাল হল কি মন্দ হল তা নিয়ে একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধতে লাগলো। কেন না সিপাইদের এখন যা মানসিক অবস্থা তাতে তারা ব্যাপারটা কি ভাবে নেবে কে জানে!

গোয়ালিয়র বাহিনীর উপর মহারাজার নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। মনে মনে তার এমন একটা সন্দেহ ছিল যে, গোয়ালিয়র বাহিনী হয়তো বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না।

তার একমাত্র বিশ্বাস ছিল, সম্প্রতি গড়া কট্টর মারাঠীদের নিয়ে নতুন একটা বাহিনী গড়া। একমাত্র এরাই তার বিপদের সময় পুরবিয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

মেজর ম্যাক্‌ফারসন ছায়ার মত মহারাজ জয়াজী রাও সিন্ধিয়ার পিছনে লেগে আছেন।

সন্দিগ্ধ জয়াজী রাও কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। সব সময় তাঁর মনে হয়, রাজপ্রাসাদে কি সেনাছাউনিতে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে।

একমাত্র মেজর ম্যাক্‌ফারসনের সঙ্গে তার খোলাখুলি কথা হয়। সেই রকম এক আলোচনা অবকাশে মেজর বললেন, ইয়োর ম্যাজেষ্টি, আপনি যদি গোয়ালিয়র বাহিনীকে ছাউনির মধ্যে আটকে রাখতে পারেন তাহলে আমরা সেটাকে আপনার অকৃত্রিম সৌহার্দের নিদর্শন বলে মনে করবো। মাননীয় গভর্ণর জেনারেলও সেই রকম ইচ্ছেই প্রকাশ করেছেন। মেজর গলার স্বর আরেকটু নামিয়ে ফিসফিস করলেন, চারদিকে তো শুনছি, কুঁচগাঁওয়ের যুদ্ধের পর তাঁতিয়া টোপী নাকি গোয়ালিয়র ঘুরে গেছেন। সত্যি-মিথ্যে জানিনে। আমার মনে হয়—, একটু ইতস্তত করেন মেজর ম্যাক্‌ফারসন, আপনাকে বন্ধুভাবেই বলছি, বিদ্রোহীদের জন্যে আপনার তৈরি থাকা দরকার।

সেই সময় সিন্ধিয়া একদিন মন্ত্রী দিনকার রাও ও মেজর ম্যাক্‌ফারসন দুজনকেই ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, আমি ভাবছি পুর্বারিয়াদের বাহিনী থেকে সরিয়ে দেব। হিন্দুস্থানের এখন যা অবস্থা তাতে তাদের আর গোয়ালিয়র বাহিনীতে রাখতে সাহস পাচ্ছি না।

দিনকার রাও ও মেজর ম্যাকৃফারসন দুজনেই এক সঙ্গে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন।

দিনকার রাও বললেন, গোয়ালিয়র বাহিনী থেকে পুরবিয়াদের তাড়াতে পারলে আমরা নিজেদের অনেকখানি নিরাপদ ভাবতে পারবো।

সিন্ধিয়া তার বাহিনী থেকে পুরবিয়াদের ডেকে ছুটি দিয়ে দিলেন। সিপাইরা কোন 'কেন'র উত্তর পেল না। বাকি-বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হল! সুতরাং গাঠরি নিয়ে যে যার নিজের দেশের দিকে রওনা হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে পদস্থ মারাঠা কর্মচারী ও সাধারণ সৈনিক সকলেই বিমূঢ় হয়ে গেল।

সিন্ধিয়ার গূঢ় অভিলাষ সম্পর্কে সান্দগ্ধ হয়ে উঠলো সবাই। এ রকম একটা ধারনা সকলের মুখে ফিরতে লাগলো, এবার তাদেরও সরিয়ে দেওয়া হবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা!

মারাঠীরা মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হল। মহারাজ সিন্ধিয়া মারাঠা বলে তাদের যে আত্মীয়তার দাবী ছিল তা তারা নিঃশব্দে নাকচ করে দিল। তাদের স্মৃতিতে গুনগুন করছিল সেই সব অতীত গৌরব-কাহিনী যা বেশিদিন আগেকার নয়। এই তো অল্প কিছুকাল আগেও তাদের বিজয়বাহিনী সাবাউত্তরভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল—স্বয়ং দিল্লিশ্বরও তাদেব হাতে বন্দী ছাড়া কিছু ছিলেন না। পেশোয়া বংশের সেই সব উৎকীর্ণ গৌরবেব কাহিনী সিন্ধিয়া কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? সিন্ধিয়া আজকের এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিতে ডুবে থেকে নিজের মানুষজনকে যে অবহেলা করছেন এর ফল কখনো ভালো হবে না।

প্রবীনরা গোপনে সিন্ধিয়াকে, আংরেজকা গোলাম বলে বিশেষিত করতে লাগলেন।

আর গোয়ালিয়রের সাধারণ মানুষ, সিন্ধিয়া ও তার মন্ত্রী দিনকার রাওয়ের কোম্পানী সাহেব-সুবোদের সঙ্গে মেলা-মেশা ও হামেশা খানা-পিনার বহর দেখে তাদের খৃষ্টান বলেই মনে করতে লাগলেন।

এর মধ্যে এক ফাঁকে তাঁতিয়া টোপী এসে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন আর সিন্ধিয়া ও তার মন্ত্রীর হাল-চালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকলো।
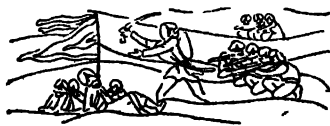
ভোর রাতে ভিজে-ভিজে জোছনায় আবছা অন্ধকারকে আড়াল করে রাও সাহেবের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র দখল নিতে যাত্রা করলেন।

বিদ্রোহীরা জানেন, গোয়ালিয়র দুর্গ দুর্ভেদ্য। গোয়ালিয়র দুর্গ অজেয়। গোয়ালিয়র বাহিনীর সৈন্যরাও চৌকোশ যোদ্ধা। সারা ভারতে তার খ্যাতি।

এই গোয়ালিয়র বাহিনী নিয়ে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়েরও দুর্ভাবনা ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। যদি এই বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে কোম্পানীকে বোধ হয় ভারতের মাটি ছেড়ে জলে জাহাজ ভাসাতে হবে। শোনা যায়, ক্যানিং নাকি তার অন্তরঙ্গদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, ইফ সিন্ধিয়া জয়েনস দি রিবেলস আই উইল প্যাক অফ টুমরো।

সেই সিন্ধিয়া ও গোয়ালিয়র বাহিনীর হাত থেকে গোয়ালিয়র ছিনিয়ে নেবার জন্যে বিদ্রোহীরা এগোলেন

এত দিন মেজর ম্যাক্‌ফারসন প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন, যদি গোয়ালিয়র বাহিনীকে নিরপেক্ষ রাখা যায়। আর সে চেষ্টায় অনেকখানি সফলও হয়েছিলেন। দিল্লি অবরোধ ও লক্ষ্ণৌর যুদ্ধে গোয়ালিয়রে সুশিক্ষিত বাহিনী যদি হাজির থাকতো তবে যুদ্ধের ধারা হয়তো উলটো দিকে বইতো।

ইতিমধ্যে সিন্ধিয়া পুবরিয়াদের দল থেকে তাড়িয়েছেন আর যারা থেকে গেল তাদের প্রতিও তার নজর রইলো না। মহারাজা ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যেটুকু যোগ ছিল কবে যেন তা ছিঁড়ে গেল।

সিন্ধিয়া খবর পেলেন, বিদ্রোহীরা বেশ বড়ো রকমের একটা দল নিয়ে গোয়ালিয়রের দিকে এগোচ্ছে।

সুতরাং জয়াজী রাও সিন্ধিয়া, মন্ত্রী দিনকার রাও ও সেনাপতিদের নিয়ে বাধা দিতে এগোলেন। গোয়ালিয়র থেকে এগিয়ে তিরিশ পাউণ্ডের আটটা কামান সাজিয়ে সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাও সাহেব ও বান্দার নবাবের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের অগ্রগামী ঘোড়সোয়ার বাহিনী সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বার জন্যে এগিয়ে আসতে লাগলো।

কামানের সীমানার মধ্যে বিদ্রোহীরা এসে পড়তে মহারাজা সিন্ধিয়া হাঁকলেন, দাগো, কামান দাগো—

গোলন্দাজরা কামানের ছেঁদায় আগুন দিল আর আটটা শব্দের বাজ হাঁকড়ে ছুটে গেল সামনের দিকে। শব্দ হল। গোলা ফাটলো না। শুধু রাশি রাশি ধোঁয়া বেরিয়ে জায়গাটা আচ্ছন্ন করে ফেললো। বিদ্রোহীরা যখন একেবারে কাছে এসে পড়লো তখন গোয়ালিয়র বাহিনীর কি পদাতিক কি অশ্বারোহী বাহিনী সেনাপতিদের আদেশ অগ্রাহ্য করে অস্ত্র নামিয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যে তা দেখে কারো অসুবিধে রইলো না, যুদ্ধ করবার কোন ইচ্ছেই তাদের নেই।

বিদ্রোহীরা একেবারে যখন কাছে এসে পড়লো তখন দুপক্ষ থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি ও কোলাহল শোনা গেল। দু'পক্ষের 'হর-হর' ও 'দীন-দীন' আওয়াজ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। অস্ত্র নামিয়ে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল সম্ভাষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

যুদ্ধ যে একটুও হয়নি এমন নয়। শুধুমাত্র সিন্ধিয়ার প্রিয় দেহরক্ষীবাহিনী হাতিয়ার বাগিয়ে শত্রুর দিকে ঝাপিয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীদের বিপুল সংখ্যক উদ্যত হাতিয়ারের সামনে তাদের বেশ কিছু খতম হল। বাদ বাকি পালিয়ে বাঁচলো।

দুর্ভাগ্যবশত মহারাজা সিন্ধিয়ার তার পূর্বপুরুষদের মতো সামরিক দক্ষতা ছিল না। তা ছাড়া তার বাহিনীর ওপর নায়কোচিত নিয়ন্ত্রণও ছিল না। সুতরাং সিন্ধিয়া এক লহমায় বুঝে নিলেন, দুধ-কলা দিয়ে এতদিন কালসাপ পুষেছেন।

কাজেই আর ডাইনে-বাঁয়ে তাকানো নয়—সোজা ঢোলপুরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন। অবশ্য একবার তার মনে হয়েছিল, অন্তপুরের মহিলারা অরক্ষিত রয়ে গেলেন। সে ভাবনাটুকুও পেছনে ফেলে গেলেন সিন্ধিয়া। ঢোলপুরে পৌছনোর আগে পিছন ফিরে তাকালেন না।

বেচারা দিনকার রাও, তার যুদ্ধ চলে রাজার কানে মন্ত্রণা দিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে। মহারাজার সাহসে ভর দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। সিন্ধিয়াকে দেখতে না পেয়ে তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। তার ঘোড়ার গতি ছিল দুরন্ত—সুতরাং সিন্ধিয়াকে পিছনে ফেলে তার আগেই নিরাপদ এলাকার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সিন্ধিয়া যখন ব্রিটিশ ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলেন, সতেরো বার তার সম্মানে তোপধ্বনি করা হল। কোম্পানীর সাদর অভ্যর্থনা বন্ধুর মত আলিঙ্গন করে অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে ঘিরে দিল

এদিকে যুদ্ধের খবর যখন কেল্লায় গিয়ে পৌছল জয়াজী রাওয়ের ঠাকুমা বৈজাবাঈ এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। ঘোড়া আর পালকি জোগাড় করে রাজপুরীর মহিলাদের তুলে দিলেন তারপর সম্ভ্রান্ত পুরজনদের নিয়ে গোয়ালিয়র থেকে তিরিশ মাইল দূরে নারোয়ার কেল্লায় গিয়ে ফটক বন্ধ করে দিলেন।

রাও সাহেবের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র ঢুকলেন।

সঙ্গে তিন বিদ্রোহী নেতা বান্দার আলি নবাব সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া টোপী।

রাও সাহেব পেশোয়ার প্রতিনিধি হিসেবে গোয়ালিয়র দুর্গ, ট্রেজারি ও অস্ত্রশালার দখল নিলেন।

এক পরোয়ানা বলে, রাজ্যে লুঠপাট ও প্রজাদের ওপর অত্যাচার নিষিদ্ধ করা হল। গোয়ালিয়র রাজ্য প্রশাসনে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হল না। কোন সরকারী কর্মচারীকে সরানো হল না। শুধু বন্দীশালার দরজা খুলে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হল

বিদ্রোহীদের টাকার বড়ো দরকার—সৈন্যদের মাইনেটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে যেতে হবে তাই দুটি বাড়িতে তল্লাশ চালানো হল। দিনকার রাওয়ের মোহন ঘরের বাড়ি আর সিন্ধিয়ার প্রাসাদ। অবশ্য রাজকোষের অধ্যক্ষ অমরচাঁদ ভাটিয়া এ ব্যাপারে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।

এই লুঠ-করা ধন থেকে সিন্ধিয়ার সৈন্যদের মিটিয়ে দেওয়া হল তিন মাসের বকেয়া বেতন আর দু'মাসের অগ্রিম। এটা দেওয়া হল, তাদের প্রতি সৌহার্দ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে।

গোয়ালিয়র দখল নিতে এসেছিল যে বিদ্রোহী বাহিনী তাদের মাইনে ও বকশিস দেওয়া হল সাড়ে সাত লাখ টাকা।

রাও সাহেব নিজে নিলেন পনেরো হাজার, রাণী লক্ষ্মীবাঈ পেলেন বিশ হাজার আর বান্দার নবাব সাহেবকে দেওয়া হল ষাট হাজার টাকা।

রাও সাহেবকে পেশোয়ার প্রতিনিধি হিসেবে অভিষেকের জন্যে এখানে মহা-উৎসবের আয়োজন করা হল। সেখানে আরব, রোহিলা, পাঠান, রাজপুত, পুরবিয়া সবাই হাজির ছিল

রাও সাহেব অবশ্য একটা দিনও গোয়ালিয়রে নষ্ট করলেন না। সহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের নিজেদের পক্ষে আনবার চেষ্টা করলেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র ধরবার কারণ বুঝিয়ে দিলেন। কোম্পানীর অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে সকলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। বললেন, আজ এক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। কোম্পানির শাসন কোম্পানির পতাকা গোয়ালিয়র থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে, স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু এই মৃত্যুঞ্জয়ী পণ করে আমাদের সকলের এক হওয়া উচিত।

সিন্ধিয়া তো তার মন্ত্রী দিনকার রাওকে নিয়ে আগ্রা পালিয়ে গেলেন। থেকে গেলেন বুড়ি রাজমাতা বৈজাবাঈ। জয়াজী রাওয়ের ঠাকুমা।

বৈজাবাঈ অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন সুতরাং তার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। দাসা

বাওয়া নামে যে রহস্যময় মানুষটি নানা সাহেবকে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে পেশোয়া হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—এই মহিলার সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল।

দাসা বাওয়া উজ্জয়িনী গেলে গোয়ালিয়রের রাজমাতা বৈজাবাঈয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। বৈজাবাঈ তখন ব্রিটিশ বিরোধী শিবিরের লোক। গোয়ালিয়রের বর্তমান শাসনকর্তা জয়াজী রাও সিন্ধিয়ার ঠাকুরদাদা দৌলত রাও সিন্ধিয়া অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজির আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বৈজাবাঈও সেই আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিয়েছেন—স্বামীর মৃত্যুর পরও অন্যান্য ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের শরিক ছিলেন। অত্যন্ত তুখোড় মহিলা তিনি ; এক সময় গোয়ালিয়র রাজ্যের হাল ধরেছিলেন।

সুতরাং দাসা বাওয়া তার সঙ্গে দেখা করে নানা সাহেবের পরিকল্পনার কথা তাকে জানালে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে অবস্থা পালটে গেছিল। গোয়ালিয়র পুরোপুরি ব্রিটিশ সমর্থক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। জয়াজী রাওয়ের সঙ্গে কোম্পানির দহরম-মহরম ক্রমশ বেড়ে গিয়ে অন্তরঙ্গ পর্যায় পৌছেছিল। জয়াজী রাও কোম্পানির স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ অভিন্ন বলে মনে করতেন।

ফলে বৈজাবাঈয়ের মনে যাই থাক, সিন্ধিয়া পরিবারের হাত থেকে গোয়ালিয়র ফসকে না-যায় সেই জন্যেই হয়তো কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণ হতে পারে এমন সব কাজ থেকে নিজেকে সযত্নে নির্লিপ্ত করে রেখেছিলেন।

আর ভারত ইতিহাসের দারুণ দুর্যোগে কোম্পানির প্রতি তার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নারোয়ার দুর্গে পালিয়ে গেলেন।

বিদ্রোহীরা এসে কাউকে ধরতে পারলেন না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়াজী রাও চোঁ-চাঁ করে দৌড়ে এক নিশ্বাসে আগ্রায় গিয়ে হাজির হলেন। বৈজাবাঈও মাইল তিরিশেক দূরে সরে গেলেন।

কাউকে ধরতে না পেয়ে রাও সাহেব নিজের কপাল চাপড়ালেন। শেষে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে ঠিক করলেন, জয়াজী রাওকে আর হাতের মুঠোয় পাবার কোন উপায় নেই। বৈজাবাঈকে পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। কেননা পরামর্শ দেবার মত কোন 'আংরেজ' তার কাছাকাছি নেই। সুতরাং, দাবার একটা চাল চেলে দেখতে ক্ষতি কি !

রাও সাহেব অত্যন্ত বিনীতভাবে একটা চিঠি লিখলেন বৈজাবাঈকে 'আমরা গোয়ালিয়রে এসে হাজির হয়েছি। এখানে এসে আপনার এবং জয়াজী রাওয়ের খোঁজ নিয়েছি। শুনলাম, আমরা আসবার আগেই আপনি নারোয়া'র কেল্লায় গিয়ে

আশ্রয় নিয়েছেন। কাজটা আপনার পক্ষে সমীচীন হয় নি। এমন কোন তো ব্যাপার ঘটেনি যাতে আপনাদের পালিয়ে যেতে হবে। আপনি ফিরে এসে গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রশাসনের দায়িত্ব নিন।'

রাও সাহেব চিঠি দিয়ে দু-একদিন অপেক্ষা করলেন। চিঠির উত্তর এল না।

রাও সাহেব আরেকটা চিঠি লিখলেন বৈজাবাঈকে, 'এখানে তো সব কিছুই ভালোভাবে চলছে। প্রশাসন ও জীবনযাত্রার তেমন হেরফের হয় নি। গোয়ালিয়র থেকে আপনার চলে যাওয়া বোধহয় ঠিক হয় নি।

'এর আগে আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম—চিঠি পেয়েও তার কোন উত্তর দিলেন না। এই চিঠি রামজী চৌথে জমাদারের মারফৎ পাঠানো হল। আপনি এসে সরকারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করুন। গোয়ালিয়র দখল করা আমাদের ইচ্ছে নয়। অন্যত্র যাবার পথে গোয়ালিয়রে দিনকয়েক বিশ্রাম নিয়ে চলে যাব। কাজেই, বিনা ওজরে আপনার এখানে আসা দরকার যাতে প্রশাসনের দায়িত্ব আপনার হাতে বুঝিয়ে চলে যেতে পারি।'

দুটো চিঠিই বৈজাবাঈয়ের হাতে পড়েছিল। উত্তরটা ইচ্ছে করেই তিনি দেন নি। বিদ্রোহী নেতাদের চালাকি বোঝবার মত বয়েস তার হয়েছিল। এটা যে তাকে ধরবার সুচতুর কৌশল—সেটা সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। চিঠি দুটো তিনি সোজা স্যার রবার্ট হ্যামিলটনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রাও সাহেবেরও বুঝে নিতে অসুবিধে হল না, জয়াজী রাও বা বৈজাবাঈকে কখনো হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে না। অথচ এখানে দেরি করলে হিউ রোজের মুখোমুখি পড়তে হবে। তার চেয়ে এগিয়ে সুবিধাজনক কোন জায়গায় গিয়ে মুখোমুখি হওয়া ভালো।

বিদ্রোহীদের গোয়ালিয়র অধিকার সারা ভারতে অসামান্য চাঞ্চল্য এনে দিল। কোম্পানী প্রশাসন হকচকিয়ে গেল। সাহেব-সুবোরা মনে করতে লাগলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। এবার বুঝি পাততাড়ি গুটিয়ে জাহাজে পাল তুলে দিতে হবে।

মধ্যভারতে বিদ্রোহ দমনের মূল নায়ক হিউ রোজ গোলাউলির যুদ্ধের পর ভেবেছিলেন, এবার এখানকার ডেরাডাণ্ডা তুলে অন্যত্র যেতে হবে। সৈন্যদের সেই হিসেবে আদেশও দিয়েছিলেন।

সহসা বিদ্রোহীদের এই মহিমান্বিত আত্মপ্রকাশ তাকে সচকিত করে তুললো। গোয়ালিয়র দুর্গের পতনের ফলে অবস্থার কতখানি গুরুত্ব ঘটেছে তা বুঝে নিতে

তার মতো ঝানু সেনাপতির দেরি হবার কথা নয়। মধ্যভারতে ব্রিটিশ শাসনের মুখে অপমানের কালসিটে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বিহ্বল হয়ে বসে-থাকা সেনানায়কের সাজে না। তাই হিউ রোজ এমন এক ব্যাপক পরিকল্পনা করলেন যাতে গোয়ালিয়র দুর্গ পুনরুদ্ধার করে বিদ্রোহীদের নির্মূল করা যায়।

সুতরাং হিউ রোজ আর দেরি করলেন না। কালপি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে জয়াজী রাও সিন্ধিয়া। সেদিনের তারিখ ৬ জুন। সন ১৮৫৮।

জোর কদমে চললেন হিউ রোজ। মোরার ক্যান্টনমেন্টের ছ'মাইল দূরে থমকে দাঁড়াতে হল। মোরার বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি। মোরারকে পাশ কাটিয়ে গোয়ালিয়র যাবার কোন উপায় নেই।

হিউ রোজ অর্ধচন্দ্রাকারে কামান সাজালেন। তারপর শুরু হল কামান দাগা। মোরার ক্যান্টনমেন্টের ওপর নিদারুণভাবে গোলা পড়তে লাগলো।

বিদ্রোহীরাও কামানের গোলা দিয়ে প্রত্যুত্তর দিলে।

খর রৌদ্রের দুপুর গড়িয়ে যায়!

ইতিমধ্যে হিউ রোজ পদাতিক অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদের সাজিয়ে ব্যাপক আক্রমণ চালালেন।

মোরারের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিদ্রোহীদের কোন ধারণা ছিল না। অগ্রবর্তী ঘাঁটির দৃঢ়তা মূল ঘাঁটির শক্তিকে আরো দৃঢ়তর করে, সামরিক বিধির এই মোটা হিসেবটা বোঝার মত সহজ বুদ্ধি ভারতীয় নায়কদেব মধ্যে তেমন সক্রিয় ছিল না। এ ব্যাপারটা কিছুতেই তাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়লো না, কেন কে জানে! মোরার পড়লে আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত সড়ক একেবারে অনর্গল হয়ে যাবে। গেরস্থ বাড়ির সদর খোলা থাকলে চোর-ডাকাতের ভিতরে ঢুকতে বাধা কোথায়!

তা ছাড়া মোরার ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহীদের এমন কোন নেতা ছিলেন না যিনি হিউ রোজের সুচতুর ও সুশৃঙ্খল আক্রমণ রুখে দেবার মত সামরিক দক্ষতা রাখেন।

সুতরাং হিউ রোজের আক্রমণের দাপটে সেপাইদের প্রতিরোধ ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে গেল!

বিদ্রোহীদের কামান মুখ ফিরিয়ে গোয়ালিয়রের দিকে ঘুরে গেল।

মোরারের পতন হতেই ব্রিগেডিয়ার স্মিথ এগোতে লাগলেন। বিদ্রোহীরা সরে যাওয়ার ফলে আগ্রা পর্যন্ত গোয়ালিয়র শত্রু মুক্ত হল।

ব্রিগেডিয়ার স্মিথ তার বাহিনী নিয়ে গোয়ালিয়র থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পুবে কোটা-কী-সরাইতে ছাউনি ফেললেন। জায়গাটার সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

কেউ জানে না বিদ্রোহীরা এই জায়গাটা অরক্ষিত ফেলে রেখেছিল কেন? পাহাড় ও টিলায় ছাওয়া এই এলাকার একটা স্বাভাবিক নিরাপত্তা ছিল।

যুদ্ধ একেবারে গোয়ালিয়রের সদর দরজায় এসে হাজির হল। বিদ্রোহীরা ধারণা করতে পারে নি স্যার হিউ রোজ এত তাড়াতাড়ি গোয়ালিয়র এসে পৌছতে পারবেন।

'ঐ শুন ঐ শুন ভেরীর আওয়াজ হে ভেরীর আওয়াজ।'

'সাজো সাজো' রব পড়ে গেল বিদ্রোহীদের মধ্যে।

রাও সাহেব আর তাঁতিয়া টোপী দুজনেই লক্ষ্মীবাঈকে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করলেন।

এই শুদ্ধচারিণী তার রমণীয় চরিত্র মাহাত্ম্যে ও মানসিক দার্ঢ্যে সৈন্যদের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

রাণী তার বাহিনী নিয়ে গোয়ালিয়র ও কোটা-কী-সরাইয়ের মাঝখানে পাহাড়-টিলার আড়াল নিয়ে প্রতিরোধ ব্যূহ সাজালেন। কোটা-কী-সরাই এলাকায় স্মিথকে আটকাতে পারলে ভাল হত কিন্তু সে অঞ্চল এর আগেই কোম্পানী-ফৌজের এক্তিয়ারে চলে গেছে। ঘাঁটি আগলাচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার স্মিথ।

সতেরো জুন বিদ্রোহীদের আক্রমণ করলেন স্মিথ। বিদ্রোহীদের হঠাতে না পারলে গোয়ালিয়র দখল করা স্মিথের একার সাধ্যি নয়। হিউ রোজ ও ব্রিগেডিয়ার স্মিথের বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মেলানো দরকার।

প্রচণ্ড লড়াই সুরু হল।

রোদে-পোড়া দিন কামানের আগুনে ঝলসে যেতে লাগলো।

ঘোড়ার উপর পুরুষের বেশে উদ্যত কৃপাণের মত রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের উপস্থিতি সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করে তুললো।

হিন্দু-মুসলমান নয়। রাজপুত-পাঠান নয়। মারাঠা-মোকরানী নয়। এক জাত এক প্রাণ হয়ে তারা দুশমন ইংরেজের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো।

রাজপুত-রোহিলা জাঠ আর পাঠান এক সঙ্গে মিলে শত্রুর অগ্রগতিকে পঙ্গু করে দিতে লাগলো।

পেশোয়া বংশীয় রাজপুত্র রাও সাহেব অসীম বীরত্বে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে লড়ে যেতে লাগলেন।

মাথার ওপর জুন মাসের সূর্য।

দু'পাশে খাড়া গিরিশ্রেণী। আগুনে যেন ঝলসে যাচ্ছে সব!

গোলা-বারুদের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

ব্রিটিশ ফৌজ প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্যে ঘামের সঙ্গে অঢেল রক্তও ঝরিয়ে দিতে লাগলো। তবু তাদের মনে হয় গোয়ালিয়রের পথ দুঃসাধ্য দুর্গম।

ব্রিটিশ গোলন্দাজেরা ভিজে তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে মরিয়া হয়ে এগোতে লাগলো কামান দাগতে-দাগতে।

বিদ্রোহী নায়কেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মূল ঘাঁটি গোয়ালিয়রের দিকে সরে যেতে লাগলেন।

কামানের গর্জনে, বন্দুক-রাইফেলের গুলিতে বাতাস-কাটা সাঁ-সাঁ শব্দে, উদ্যত তরোয়ালের ঝনঝনানিতে বুলেটের হিসিঁয়ে ওঠায়, আহত ঘোড়ার পা-তুলে পিছু হঠে যাত্রা-ছাড়া হ্রেষায় আছড়ে পড়ার শব্দের বিশৃঙ্খলা তখন চরমে উঠেছে।

সেই সময় ঘটনাটা ঘটলো।

সারাদিন দুর্ধর্ষ প্রচেষ্টায় লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধের গতি পালটাতে পারলেন না। যুদ্ধের উত্তেজনায় কিছুই খেয়াল ছিল না। পরাজয় যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো সরে আসা ছাড়া উপায় রইলো না। তখনই যেন দারুন অবসাদ আর ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এক ফোঁটা পিপাসার জলের জন্যে ঘোড়া থেকে নেমে পথের ধারে এক টুকরো পাথরের ওপর বসে বললেন, শরবত লাও—

এদিকে হঠে-আসা বিদ্রোহীদের পিছনে একদল রিসলাদার লেলিয়ে দিয়েছিলেন হিউ রোজ। জোর কদমে এগোচ্ছিল তারা। তাদের মধ্যে জনা চল্লিশেক আবার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছিল।

রাণী বাঁদি হঠাৎ তাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, রিসলাদার হো—

রাণীর সঙ্গে যারা ছিল আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে গেল তারা, কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণেই তারা ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠলো কিংবা পায়ে পাখনা লাগিয়ে উড়ে গেল।

শুধু পনেরোজন দেহরক্ষী পাঠান সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাণীকে আড়াল করে। কোম্পানীর ঘোড়সোয়ার উন্মুক্ত আক্রোশে ছুটে এসে রাণীর পিঠের পর আছড়ে পড়লো বুঝি!

রিসলাদারদের কারো হাতের অব্যর্থ গুলির নিশানায় রাণী যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন। সেই মুহূর্তে উদ্যত এক তরবারির আঘাতও রাণীর মাথায় পড়েছে।

রাণীর ক্লান্ত ঘোড়ার তখন আর দৌড়াবার সাধ্য ছিল না—তবু তাকে ছোটাবার চেষ্টা করেছিলেন লক্ষ্মীবাঈ। সেই প্রথম ঘোড়াটা তার মালিকের আদেশ অমান্য করলো—কিছুতেই লাফ দিয়ে নালাটা পার হতে চাইলো না। হয়ত সেই মুহূর্তে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হতো।

ইতিমধ্যে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

তারপরই ঘোড়াটা আচমকা নালা পেরিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল।

বন্দী হবার হাত থেকে বেঁচে গেলেন লক্ষ্মীবাঈ।

ছুটে-যাওয়া ঘোড়ার ওপর লুটিয়ে পড়লেন রাণী। তখনো তার জ্ঞান ছিল। রক্তে শরীর ভেসে যাচ্ছে।

ঝাঁসির অন্দর মহলে দীর্ঘদিন লালিতা রাণীর এক ঘনিষ্ঠা সহচরী তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে এল।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ বোধহয় তার মৃত্যুকে অনুভব করেছিলেন তাই মুখে দেবার জন্যে একটুখানি গঙ্গাজল চাইলেন।

জল দেবার আগেই তার ঠোঁট দু-একবার কেঁপে চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

পেশোয়ার কর্মচারী মোরো বলবন্ত টম্বের আদরের মেয়ে মণিকর্ণিকা পরবর্তী জীবনে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করলেন।
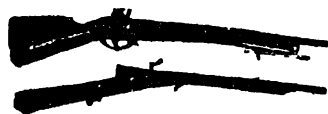
খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

কোম্পানীর সেনাছাউনিতে উত্তাল আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। গোরা ফৌজি সেপাইরা দল-বেঁধে ছাউনির বাইরে বেরিয়ে এল মহা-উল্লাসে। তারা ড্রাম পেটালো—বিউগিল বাজালো, আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়লো। রকেট ওড়ালো।

রকেটের আগুন তাদের উল্লাস হয়ে অন্ধকারের বুক চিঁরে আকাশের নিরুদ্দেশে উড়ে গেল।

কোম্পানী মদের ভাঁড়ার খুলে দিল ছাউনিতে; ক্যাম্পে পান-ভোজনের মাইফেল বসে গেল।

কোম্পানীর সবচেয়ে কট্টর দুশমন নানা সাহেব আর লক্ষ্মীবাঈয়ের মধ্যে একজন আজ খতম হয়েছে।

শুধু ঘুম ছিল না হিউ রোজের চোখে। সদর দপ্তরে বসে তার ভাবনায় বার বার কাঁপুনি ধরছিল।

গোয়ালিয়রের ব্যাপারটা তার চোখ খুলে দিয়েছে। তেমন একজন তৎপর পেশোয়াবংশের রাজপুত্র যদি এখনো ইচ্ছে করে তবে পেশোয়া শাহীর পতাকা-তলে হাজার-হাজার মানুষকে টেনে আনতে পারে। আর তার ফল কি ভয়ানক হতে পারে গোয়ালিয়র দখল তার জলন্ত প্রমাণ।

কয়েকদিন আগে হিউ রোজ সৈন্যদের কাছে তার ছুটি নেবার কথা জানিয়ে-দিয়েছিলেন। এখন নিজেই সেই ছুটি বাতিল করে রাও সাহেবের সঙ্গে একটা ফয়সলা করে ফেলতে গোয়ালিয়র ছুটে চলেছেন। ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

পরদিন হিউ রোজ এগিয়ে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার স্মিথের সঙ্গে যোগ দিলেন। তারপর দুজনের মিলিত শক্তি নিয়ে গোয়ালিয়র চড়াও হলেন।

কাণ্ডটা কি ঘটেছিল কে জানে! বিদ্রোহীদের মূল বাহিনী ১৮ই জুনের আগে যুদ্ধ করবার জন্যে দুর্গ ছেড়ে বাইরে এল না।

যখন বেরুলো, যুদ্ধ তখন ইংরেজরা ফতে করে নিয়েছে। কয়েক জায়গায় তীব্র সংঘর্ষ হল, সে সংঘর্ষের ফলাফল গোয়ালিয়র বাহিনীর মর্যাদার উপযুক্ত নয়।

গোয়ালিয়র ছাড়তে হল।

সেপাইদের অনেকেরই ইচ্ছে ছিল, গোয়ালিয়রে কোম্পানীর সঙ্গে একবার ভালো করে পাল্লা করে দেখা যাক। কিন্তু বিদ্রোহী নায়কেরা তখন গোয়ালিয়র ছেড়ে অন্যত্র দাঁড়িয়ে লড়াই দেবার মতলব ভাঁজছিলেন।

হিউ রোজ জয়াজী রাও সিন্ধিয়াকে নিয়ে গোয়ালিয়র শহরে ঢুকলেন।

দুর্গ তখনো বিদ্রোহীদের দখলে।

হিউ রোজ ভেবেছিলেন, দুর্গ দখল নিতে জোর লড়াই চালাতে হবে। তৈরিও হচ্ছিলেন সেই ভাবে।

শহর দখল হয়ে যাওয়াতে বিদ্রোহীদের মনোবল তেমন দৃঢ় ছিল না হয়তো তাই তারা রাতের অন্ধকারে দুর্গ ছেড়ে গেল। সবাই গেল না।

কয়েকজন আবার মাঝ পথ থেকে নিঃশব্দে ফিরে এল।

সংখ্যায় তারা এগারো-জন। চারজন তাদের মধ্যে সেপাই, চারজন আফগান দুজন নারী আর একটি শিশু!

নেতারা তাদের অনেক করে বুঝিয়ে ছিলেন। তবু ফেরানো গেল না তাদের। সিদ্ধান্তে অনড় রইলো তারা। বারবার দুশমনের সঙ্গে লড়াইতে এই পালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসহ্য—মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুকে তারা জয় করতে চায়। একবার অন্তত আকাশে একটা পতাকা তুলতে চায়—সে-পতাকা দেশকে ভালবাসার, দেশের মাটিকে ভালবাসার। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের বুকের রক্তে রঙীন হবে তার রঙ!

ইতিমধ্যে হিউ রোজের কাছে খবর পৌছেছিল, বিদ্রোহীরা দুর্গ ছেড়ে সরে পড়েছে! তবু সাবধানের মার নেই রাতের অন্ধকারে হিংস্র নেকড়ের ঝাঁকের মত কয়েক হাজার পল্টন নিঃশব্দে এগোতে লাগলো। কামানে-বন্দুকে ঘোড়সোয়ারে-পদাতিকে ধারালো এক হিংস্রতা যেন বরফের মত জমাট বেঁধে চলেছে।

হঠাৎ কেল্লার বুরুজের চত্বর থেকে কামান গর্জে উঠলো।

রাত্রির অন্ধকার ছিঁড়ে-খুঁড়ে আগুনে গোলা এসে আছড়ে পড়ল হিউ রোজের বাহিনীর ওপর। এ আবার কিসের চিন্‌গারী!

সন্ধিগ্ধ হয়ে উঠলেন হিউ রোজ। পুরো বাহিনী থমকে গেল। তবে কি গুপ্তচর ভুল খবর এনেছে। মুহূর্তের জন্যে নিরুপায় উদ্বেগে অস্থির হয়ে ওঠেন হিউ রোজ; কিন্তু এই অবস্থায় তো পিছু হঠা চলবে না।

হিউ রোজ আদেশ দিলেন, ফায়ার—

দু-পক্ষের কামানের আগুনে গোয়ালিয়র দেওয়ালির রাত হয়ে গেল বুঝি!

কতক্ষণ পরে দুর্গের দিক থেকে আর সাড়া পাওয়া গেল না।

কেল্লার সিংহদ্বারে দর্পিত কোম্পানী-ফৌজের বুটের শব্দ শোনা গেল। ড্রাম-বিউগিল তেড়ে-ফুঁড়ে বেজে উঠলো। ব্যাগ পাইপের বিচিত্র স্বর-সম্মেলক শূন্য দুর্গের বিষণ্ণ নির্জনতাকে কবর দিয়ে থর পায় এগিয়ে গেল।

ভয়-তরণ মৃত্যু-হরণ মন্ত্রে সঞ্জীবিত দুর্গের সেই মানুষ কটি ততক্ষণে ইতিহাস হয়ে গেছে!

গোয়ালিয়র দখল করে বিদ্রোহীরা যে ধীরোদাত্ত কাহিনীর ভূমিকা রচনা করেছিল অসমীচীন এক দীর্ঘসূত্রতার ফলে কাহিনী শুরু হবার আগেই যবনিকা পড়ে গেল।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন বর্ণাঢ্য সূর্যোদয় আর দেখা যায় নি!

এদিকে বিদ্রোহী শিবিরে হতাশা আর হাহাকার।

রাও সাহেবের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ঘোড়ার পিঠে যেতে-যেতে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে ওঠেন।

বিদ্রোহী নায়কের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নিবার তাঁতিয়া টোপীর মুখে কোন বিকার নেই। ভাবলেশহীন মুখের পরিলিখনে দৃঢ়তর এক সংকল্পের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে হিংস্র হয়ে ওঠে তার অভিলাষ। বুকের মধ্যে দুরন্ত এক সাহস ঝড়ের বাতাসে পালের মত ফুলে ফুলে ওঠে।

তবে সময় চাই। সুযোগ চাই।

হিউ রোজ সে সুযোগ দিতে রাজি নয়।

২৮শে জুন জোরা-আলিপুরে হিউ রোজের দুরন্ত ঘোড়সোয়ার বাহিনীর সঙ্গে দারুণ এক সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে!

তবু ঠেকানো গেল না হিউ রোজকে।

রাও সাহেব আর তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেলেন। আহত

ভেতুয়ার মত গজরাতে-গজরাতে চম্বল পেরিয়ে রাজপুতানার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তারা। ফেলে যেতে হল প্রচুর গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুক আর রসদ-পত্তর।

আচমকা সংঘর্ষে সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয়েছে। হয়তো তাদের সামর্থে চিড় ধরেছে তবু পরাজয়ের নৈরাশ্য তাদের স্পর্শ করতে পারে নি। অপরাজেয় এক সত্তা তাদের বুকের মধ্যে স্পন্দিত হয়েছে।

রাজপুতানার দিকে যেতে-যেতে তাঁতিয়া টোপী রাও সাহেবকে বললেন, ফৌজ নেই, হাতিয়ার নেই, গোলা-বারুদ নেই, এবার লড়াই হবে কি দিয়ে?

তাই তো ভাবছি। চিন্তিত রাও সাহেব সাড়া দেন।

চম্বলের বন্ধ্যা উপত্যকার যুগ-যুগান্তরের নির্জনতা ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

অসংখ্য গিরিখাত, পাহাড়-টিলা অরণ্যের মাঝ দিয়ে চলেছেন রাও সাহেব আর তাঁতিয়া টোপী। কোম্পানীর ক্রোধ আর হুঁশিয়ার জিঘাংসা থেকে নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্যে পথ ছেড়ে বি-পথে চলেছেন তারা।

—আমার মনে হয় গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে আমাদের সমঝে চলতে হবে। ওরাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে, আশ্রয় দিতে পারে—

—আমাদের হয়ে লড়াই করতে পারে। যোগ করেন তাঁতিয়া টোপী।

রাও সাহেব সৈন্যদের কাছে এক ইস্তাহার জারি করলেন, গাঁ-গেরামের অধিবাসী-দের উৎপীড়ন করা চলবে না, এবং তাদের সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হল। গ্রামবাসীর সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করতে হবে। গ্রামবাসী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নেওয়া খাদ্যদ্রব্যের উপযুক্ত দাম দিতে হবে।

এই ভাবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে রাও সাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর সেনাবাহিনীর সহৃদয় সহানুভূতির যোগাযোগ স্থাপিত হল।

চারদিকে সক্রিয় ইংরেজ গুপ্তচর ছদ্মবেশে তাদের পথের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অনবরত তাদের খবরাখবর ফৌজী দপ্তরে পাঠিয়ে যাচ্ছিল, আবার গ্রামবাসীরা অযাচিতভাবে সতর্ক করেও ইংরেজ সৈন্যের হাল-ফিল হাল-চাল জানিয়ে বিদ্রোহী-দেরও নিরাপত্তায় সহায়তা করতে লাগলো।

তবু শিকারের যুদ্ধে রাও সাহেব, ফিরুজ শাহ ও তাঁতিয়া টোপীর মিলিত বাহিনীর যখন বিপর্যয় ঘটলো তখন আর আশা করবার কিছুই রইলো না।

অনেক যুদ্ধে পোড়-খাওয়া সঙ্গী তিনজন রাও সাহেব, ফিরুজ শাহ ও তাঁতিয়া টোপী হিসেব করে দেখলেন, ইংরেজদের চোখ এড়িয়ে গা-ঢাকা দিতে গেলে একসঙ্গে থাকা চলবে না। আলাদা হয়ে আত্মগোপন করতে হবে। যদি আবার কখনো সুযোগ আসে তখন দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে আঠারোশ' আঠান্ন সাল এসে গেল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করলেন, ১৮৫৯ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের অপরাধ মার্জনা করা হবে। পরে এই সার্বজনীন ক্ষমা প্রদর্শনের মেয়াদ আরো ছ'মাস বাড়ানো হয়।

মহারাণীর এই ঘোষণাপত্রের খবর বিদ্রোহী নায়কদের কাছেও এসে পৌচেছে। নিরীহ ইংরেজ নরনারী ও শিশুর রক্তে যাদের হাত কলঙ্কিত নয় এমন সবাইকে মার্জনা করা হবে।

ক্লান্ত নায়কদের অনেকেই মার্জনার সুযোগ নিতে চাইলেন। অনেকে ইতিমধ্যে নিয়েও ফেলেছেন।

এ ব্যাপারে রাও সাহেব একজন ভালো উকিল পেলেন। তিনি বাবা সাহেব আপ্তে। বাজী রাওয়ের জামাই। আপ্তে ছিলেন মালওয়ার সাব-সুবাদার। যদিও তার দুই ভাই ইংরেজশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু আপ্তে সাহেব সিন্ধিয়ার অনুগত ছিলেন। ফলে ইংরেজদের গুড বুকে তার নাম ছিল।

তাকে লেখা স্যার রবার্ট হ্যামিলটনের চিঠি থেকে জানা যায়, বাবা সাহেব শুধু রাও সাহেবের নয়, নানা সাহেব ও বালা সাহেবের পক্ষেও চিঠি চালাচালি করেছিলেন।

হ্যামিল্টন সাহেব, নানা সাহেব ও বালা সাহেবের আবেদন সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন। রাও সাহেব সম্পর্কে লিখলেন, রাও সাহেব যদি আত্মসমর্পণ করেন তবে তার জীবন ভিক্ষা দেওয়া হবে। হাত-কড়া পরার লাঞ্ছনা তাকে সইতে হবে না অথবা কোন রকম অসম্মান বা উৎপীড়ন করা হবে না। তবে সরকার নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে তাকে বাস করতে হবে। অবশ্য এই সব সর্ত পালন করা হবে যদি দেখা যায় নিরীহ ইংরাজ নরনারী হত্যার রক্তে তার হাত রাঙানো নয়।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর রাও সাহেব সার্বজনীন ক্ষমা প্রদর্শনের এই সুযোগ গ্রহণ করলেন না। কেন না প্রতিহিংসাপরায়ন ইংরেজদের নারকীয় কার্যকলাপ তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল।

কানপুর আর লক্ষ্ণৌর মাঝে রাস্তার কাছাকাছি যে-সব গ্রাম পড়েছিল হ্যাভেলকের সেনারা তার অধিবাসীদের নির্বিচারে গুলি করে মারে, গাঁয়ের সব ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সব স্তূপীকৃত মৃতদেহ পথের পাশে রোদ-বিষ্টিতে পচে-গলে এক দুঃসহ নরকের সৃষ্টি করেছিল। শেয়াল-কুকুর তো বটেই, এ ছাড়া কুৎসিত শুয়োরগুলো ছানা-পোনা নিয়ে মানুষের পচা মাংসে তাদের পেট ভরাতে লাগলো।

ফতেপুর সহরে ইংরেজ প্রতিহিংসাও রোমহর্ষক!

ইংরেজদের আসার খবর পেয়ে সহরের অধিবাসীরা আগেই সরে গেছিল। তবু যে সব গৃহস্থ বাড়ির মায়া ত্যাগ করতে পারে নি বর্বর ইংরেজ ও শিখ সেনাদের তাদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হল আর সারাদিন তারা গুলি করে, বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, আগুন দিয়ে নির্বিচারে সহরের অধিবাসীদের পুড়িয়ে মারলো।

পরদিন ইংরেজ সেনারা সরে গেল, রেখে গেল শিখদের। তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া রইলো, পুরো সহরটা তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে।

এছাড়া ১৮৫৭-র ৯ জুন ভারত সরকারের লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল বারানসী ও এলাহাবাদ ডিভিসনে এক সামরিক আইন জারি করেছিলেন। এই আইনে সামরিক-অসামরিক কর্মচারী তো বটেই, এমন কি সাধারণ সৈন্য দলের হাতে লোক-দেখানো বিচার অথবা বিনা বিচারে শত্রুর সহায়তাকারী বলে সন্দেহভাজন নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সকলকে হত্যা করবার ক্ষমতা এসে গেল।

তার ফল হল এই, ঘৃণিত নিগারদের দেখো আর গুলি করে মারো।

—গোরারা যেন পাখি শিকারের মজায় মেতে উঠল।

তিনমাস ধরে আটটা মড়া বইবার গাড়ি—ডেড্‌কার্ট, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চারদিকে চক্কর দিয়ে মড়া বোঝাই করতো। হাটে-বাজারে, চৌমাথায় মানুষকে অনবরত ফাঁসিতে ঝোলান হতে লাগলো।

শেষে গোরারা বলাবলি করতে লাগল, ফালতু কার্টিজ খরচা করে লাভ কি—একটা মোটাসোটা গাছের ডালই যথেষ্ট। গলায় দাঁড় বেঁধে ঝুলিয়ে দাও ব্যস কেল্লা ফতে!

কোম্পানির বর্বরতার এসব নৃশংস ঘটনা ভারত-ময় বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। রাও সাহেবের কানেও এসে পৌঁচেছে। সুতরাং ভাবতে হল রাও সাহেবকে। নিষাদের হাতে পাখি পড়লে তার অবস্থা কি হয়! জহ্লাদ ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তার ভাগ্যে কি ঘটবে তা ভবিষ্যতই জানে। তার মনে হল, এই আত্মসমর্পণের অসম্মানের চেয়ে অজ্ঞাতবাসই তার কাছে শ্রেয়তর। এতবড়ো ভারতবর্ষে তার জন্যে কি এতটুকু জায়গা জুটবে না।

সিরোঞ্জের জঙ্গল থেকে অলৌকিকভাবে অন্তর্ধানের পর রাও সাহেব কিছুদিন উত্তর ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কোম্পানী বিদ্রোহের ধকল সামলে উঠে তার প্রশাসনকে যে ভাবে মজবুত করছে তাতে গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া উপায় রইলো না রাও সাহেবের।

বাহিনীকে ভেঙে দিয়ে ছা-পোষা মানুষের ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে গিয়ে হাজির হলেন রাও সাহেব।

কোথায় যাবেন—চারদিকে শত্রুর গুপ্তচর। তারা রাও সাহেবের খোঁজে নগর গ্রাম তোলপাড় করে তুলেছে। এ-সময় বন্ধুরাও আশ্রয় দিতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারে। সুতরাং রাও সাহেব উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দির চত্বরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কারো সন্দেহ করবার কিছু নেই। আশ্রয়হীন, গৃহত্যাগী, পথ চলতি রাহী আসা-যাওয়ার পথে মন্দিরে এসে আশ্রয় নেয়। কেউ হয়তো দু'চার দিন থাকে তারপর কোন নিরুদ্দেশের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথা থেকে তারা আসে কোথায় যায় কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। কারো, রাখবার দরকারও হয় না।

রায় সাহেবও একদিন মহাকালের মন্দিরে এসে উঠলেন। গায়ে গৈরিক উত্তরীয়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কম্বল বিছিয়ে সাধু-সন্তদের ভিড়ের মধ্যে বসে গেলেন।

খোলা আকাশের নিচে দিন কাটে। রাত পোহায়।

কেউ যাতে তাকে চিনতে না-পারে সেজন্যে রাত থাকতে স্নান সেরে সাধুদের ধুনীর ভস্ম মেখে রাজপুত্রের অস্তিত্ব মুছে ফেলেন। তারপর মহাকালের দরজায় গিয়ে প্রার্থনা জানান :

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মাম নাথং
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।

কখনো মন্দির থেকে নদীতীরে চলে যান রাও সাহেব।

পাশ দিয়ে প্রবহমান সিপ্রা নদীর বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসেন। বহমান জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে তার সময় কেটে যায়। কালস্রোতে ভেসে যাওয়া জীবনের সঙ্গে বয়ে-যাওয়া নদীস্রোতে-সাদৃশ্য খুঁজে পেতে তার দেরি হয় না। ফেলে আসা জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো জলের ঢেউয়ের মতো মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। দীর্ঘনিঃশ্বাসে বুক ভরে যায়। বিধুর বেদনায় আনমনা হয়ে যান।

হয়তো কোন অপরাহ্নে মেঘ করে আসে। এলোমেলো বাতাসে বটের পাতা মর্মরিত হয়ে ওঠে। জলের খরস্রোত পাথরে লেগে আশ্চর্য এক নূপুরের শব্দ বোনে। সেই অশ্রান্ত জলকলধ্বনির সঙ্গে মহাকালমন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ মিলে-মিশে প্রদোষ-অন্ধকারের প্রহরে শব্দাবলীর মায়াবী রূপকথা রচনা করে।

প্রহরের পল-বিপল গড়িয়ে যায়।

হুঁশ থাকে না রাও সাহেবের। জীবনের বর্তমান শূন্যতা থেকে মনে-মনে মুক্তি নিয়ে অতীতের সেই সব দিনে ফেরার হয়ে যান। কত স্মৃতি, কত সুখ-দুঃখ তাকে অস্থির করে তোলে। বিশেষ করে গোয়ালিয়র দখলের পর অমার্জনীয় দীর্ঘসূত্রতা

তার কাছে এখন অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে হয়। আজ তার মনে হয়, নানা সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে গোয়ালিয়রে তার অভিষেকের আয়োজন করার প্রয়োজন ছিল না। হিউ রোজ যখন খ্যাপা নেকড়ের মত ছুটে আসছে তখন চারপাশের ঘাঁটিগুলো অরক্ষিত রেখে গোয়ালিয়রে গুলতানি করবার কি দরকার ছিল?

এসব ভুল শুধরে নেবার সুযোগ কেউ আর তাকে দেবে না। তবু ইচ্ছে করে, তাঁতিয়া টোপী আর ফিরুজ শাহের সঙ্গে আরেকবার দুর্বার হয়ে কোম্পানি শাহীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ইচ্ছে করে, সারা ভারতের মানুষদের ডেকে বলেন, আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ!

চারদিকের নিবিড় অন্ধকারে মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন রাও সাহেব। কোথাও আলোর রেখা চোখে পড়ে না।

সিপ্রার কালো জল অস্ফুট কথা বলে যায়।

তার সবটুকুই রাও সাহেবের কাছে দুর্বোধ্য।

নিভৃত দুপুরে রোদের ঝাঁঝ বাঁচিয়ে মন্দিরের এককোণে গিয়ে বসেন রাও সাহেব।

বনফুলের গন্ধ আসে।

সঞ্চরমান বাতাসে অশ্বত্থের পত্র-পল্লব মর্মরিত হয়ে ওঠে।

মন্দিরের খিলানে-খাঁজে কপোত-কাকলি শীতল নির্জনতার গায় শব্দের নূপুর বাজায়।

বিঠুরের কথা মনে পড়ে যায় রাও সাহেবের। বিঠুরের নানা রঙের সজীব দিনগুলো বন্ধুর মতো গলা জড়িয়ে ধরে যেন!

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন রাও সাহেব।

আঃ, স্বপ্নেরা কি মধুর! ফিসফিস করেন রাও সাহেব।

যাদুকরের ভোজবাজির মত সব কিছু উল্টে-পাল্টে গেছে আজ।

কত তীর্থযাত্রী আসে। সাধু-সন্ন্যেসী আসে। ধুনী জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারী হয়। তাদের মধ্যে ভিড়ে যান রাও সাহেব।

কেউ কৌতুহলী হয়। কারো চোখে সন্দেহ চিক-চিক করে।

পুষ্পধন্বার মতো লাবণ্যময় সুঠাম যার অবয়ব কিসের দুঃখে সে ঘর-সংসার ছেড়ে পথে নেমেছে!

দু'একজন আবার সন্দেহবশে বার বার ঘুরে ফিরে আসে।

মানুষের সন্দেহ ঘনায়, তাকে ঘিরে নানা গুজব চলাফেরা করে।

সুতরাং রাও সাহেবকে ডেরাডাণ্ডা তুলে পথে বেরিয়ে পড়তে হল।

উজ্জয়িনী থেকে দক্ষিণে যাওয়া যাবে না। চেনা-শোনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তাই উত্তরের দিকে এগোতে থাকলেন রাও সাহেব।

গায়ের গেরুয়া মাথার পাগড়ি হয়েছে।

রাজপুতানার পথ ধরলেন রাও সাহেব। তার মনে হল, ওদিকে ইংরেজ গুপ্তচরদের দাপট বোধহয় কম হবে। রাজপুতানার বড়ো-বড়ো রাজাদের কেউই সিপাইদের যুদ্ধে সামিল হয়নি; পরন্তু গোরাদের রসদ-পত্তর জুগিয়ে কোম্পানীর অকৃত্রিম দোস্ত বনে গেছে। কোম্পানী একথা ভাল করেই জানে, রাজপুতানার রাজা-মহারাজারা কোন বিদ্রোহীকে স্থান দিয়ে সেই দোস্তিতে ফাটল ধরাবে না।

একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে উদয়পুরে গিয়ে হাজির হলেন রাও সাহেব। দু'চার দিন উদয়পুরে ঘোরাঘুরি করে পথে-ঘাটে এখানে-সেখানে ডেরা নিয়ে দেখা গেল, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার জায়গা উদয়পুর নয়।

ছোট শহর। লোকবসতি কম। অপরিচিত লোকের পক্ষে বেশিদিন অপরিচিত থাকা সম্ভব নয়। অপরিচিত কাউকে দেখলেই রাজস্থানীরা প্রশ্ন করে।

সুতরাং উদয়পুর থেকে সরে আসতে হল তাকে। কোথায় যাবেন? পথে বেরিয়ে মনে হল, দিল্লি যাওয়াই ভালো। ঘনবসতি এলাকায় আত্মগোপন করাই সবচেয়ে সুবিধের—মানুষের ভিড়ে মিশে থাকা যাবে।

সেখানে এক ভাঙা-চোরা বাড়িতে রাতের আস্তানায় নিঃস্ব এক জহরত ব্যবসায়ী কথা-প্রসঙ্গে রাও সাহেবকে বললেন, বাহাদুর শা পাক্কা বদমাস থা—উনহোনে সব আদমিকো ধোকা দিয়া—

১২ সেপ্টেবর সম্রাট দিল্লি শহরে ঢোল সহরত করে এক ঘোষণায় শহরের লোকদের জানিয়ে দিলেন, আজ রাতে ফিরিঙ্গিদের ওপর এক আক্রমণ চালানো হবে—এই আক্রমণের নেতৃত্ব করবেন শাহানশাহ নিজে।

এই ঘোষণায় হিন্দু-মুসলমান দু-পক্ষকেই অস্ত্র নিয়ে কাশ্মিরী গেটের কাছে হাজির হতে অনুরোধ জানানো হল।

দিল্লি শহরে সেদিন তুমুল উত্তেজনা। ফৌজী মানুষ তো বটেই, সাধারণ গৃহস্থ মানুষজনও অস্ত্র নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ভয়কে জয় করার সাহসে তারা বুক চিতিয়ে তুলেছে।

সেপাইরা অস্ত্র আকাশের দিকে তুলে শাহানশার নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো। তারা চিৎকার করতে লাগলো, আমাদের যা হবার তাই হবে—কাশ্মিরী গেট থেকে ফিরিঙ্গিদের কোতল করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো। ফিরি না ফিরি কুচ পরোয়া নেই।

হাজার-হাজার অস্ত্রধারী সন্ধ্যে থেকে কাশ্মিরী গেটের কাছে গিয়ে জমতে লাগলো। পাঁচিলের পর কামান বসানো হল।

তুমুল উত্তেজনায়, অধীর প্রতীক্ষায় মানুষ প্রহর গুণতে লাগলো, কখন শাহানশা আসেন।

সময় গড়িয়ে যায়।

মানুষের হাতের অস্ত্র শত্রুর বুকে বিদ্ধ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ ভিড় বাড়ে, উত্তেজনায় টগবগ করে যোদ্ধারা।

দিল্লি বিনিদ্র চোখে বসে থাকে।

মাথার ওপর শরতের অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারার কৌতূহলী মুখ।

রাজপ্রাসাদ থেকে মধ্যরাতের প্রহর ঘোষণা হল।

তবু কেল্লার দরজা উন্মুক্ত হল না। শাহানশাও বাইরে এলেন না।

অধৈর্য মানুষ বাদশাকে ধিক্কার জানালো, বুড্ডা ধোকা দিয়া—বুড্ডা বদমাশ ধোকা দিয়া—।

দারুন এক উত্তেজনার ঘোড়ায রাতের সোয়ার হয়েছিল দিল্লি। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

ঘরের মানুষ ঘরে ফিরলো সেনারা ফিরলো ছাউনিতে।

সারা রাত ধরে হাউয়ের আগুন দিল্লির অন্ধকারকে ছায়খার করে দিতে লাগলো। দিল্লি থেকে বেপরোয়া যোদ্ধার দল আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে এল না বাইরে।

ব্যবসায়ীটি শেষ কালে বললেন, ইংরেজরা জানে, যুদ্ধ কি করে করতে হয়। অবরোধের প্রথম দিনগুলো—আমাদের সেপাইরা শুধু লুটপাট করে ফিরেছে—শাহাজাদা ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতেছে—একলা বকত খান যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিছুতেই কিছু হল না। এত দলাদলি এত স্বার্থবোধও কোন দেশকে দেশের মানুষকে এক করতে পারে না। গোয়ালিয়রেও শুনেছি হার হয়েছে এই কারণেই।

চোখের সামনে গোয়ালিয়র দখলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে রাও সাহেবের। না, অস্বীকার করে লাভ নেই, গোয়ালিয়রে জাত-পাতের ব্যাপারটা সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বেশ একটা বিভ্রান্তি এনে দিয়েছিল।

দিল্লিতে কাশ্মিরী গেটের কাছে ভবঘুরেদের আস্তানায়, লালকেল্লার বাইরে আনাচে-কানাচে, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের পরিত্যক্ত বসতির পথ ধরে সন্তর্পণে ঘুরে বেড়ালেন রাও সাহেব।

পথে গোরা সেপাইদের এত ভিড় যে গা বাঁচিয়ে চলা ভার। গোরা সোয়াররা পথ দিয়ে যেতে-যেতে আচমকা যে-কোন লোককে লাথি মারে, বেওনেটের খোঁচা

মারে, ঘাড়ের উপর ঘোড়া তুলে দেয়। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ তাদের হিংস্র করে তোলে।

রাও সাহেবের পক্ষে এসব সহ্য করা মুশকিল। তার রক্তে জ্বালা ধরে। শূন্য হাত তরবারির জন্যে নিশপিশ করে। এক এক সময় ইচ্ছে হয়, কাপড়ের ভেতর থেকে লুকনো ছুরিটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। কোন রকমে দুর্দমনীয় ইচ্ছেটাকে সংযমের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেন।

চারদিকে গোরাদের অত্যাচারের অবর্ণনীয় ছবি। অনাচার আর অবিচারের অভিযোগ ভাষাহীন প্রতিবাদে কাঁদে।

দিল্লিতে সুবিধে হল না রাও সাহেবের।

দেহলি ছাড়তে হল তাকে। পথে নামলেন।

পথ কোথায়—বিপথকেই পথ করে নিতে হল।

সাধু-সন্ন্যেসীদের পথ গেছে হিমালয়ের তীর্থে-তীর্থে। সেই পথ ধরে সাধু-সন্তরা চলেছেন। তাদের পায়ে-পায়ে পাথর ছড়ানো।

সুরেলা গলায় এক সাধু গান ধরেছে। সহজ সরল ভজন গান। পথ চলতে-চলতে কান পেতে সেই গান শোনেন রাও সাহেব। মনে-মনে আশ্চর্য এক অনুভব পান।

> য়া ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর,
> য়াহী মেঁ নদ্দী (নদ্দী) নারা।
> য়া ঘট্ ভীতর্ কাশী-দ্বারকা,
> য়াহী মেঁ ঠাকুরদ্বারা ॥
> যা ঘট্ ভীতর্ চন্দসুর হৈ,
> য়াহী মেঁ নৌলখ তারা,
> কহৈ কবীর শুনো ভাই সাধো—
> য়াহী মেঁ সত্ করতারা।

সাধুর সঙ্গ নিলেন রাও সাহেব। সাধু চলেছেন কেদারনাথ।

প্রশ্ন করে রাও সাহেব। সাধু উত্তর দেন না। শুধু হাসেন। কখনো বলেন, পেছনের বাঁধন রেখো না। সব ত্যাগ করে, সর্বস্ব ত্যাগ করে তীর্থে যেতে হয়। মনে যদি দুঃখ থাকে, খেদ থাকে, অতৃপ্তি থাকে তাহলে যার জন্তে বেরিয়েছ তাকে পাবে কি করে!

এ কথার উত্তর দিতে পারেন না রাও সাহেব। বাঁধন তো তাকে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রেখেছে।

চটিতে-চটিতে ঠাঁই নিতে-নিতে একদিন জ্বালামুখী গিয়ে হাজির হলেন! চারদিকে হিমালয় নামে নগাধিরাজ।

এখানে কোম্পানি শাহীর কোন চিহ্ন মাত্র নেই। একটু স্বচ্ছন্দ্য হলেন রাও সাহেব। পুরনো শান্তি যেন ফিরে পাচ্ছিলেন। যুদ্ধের উত্তেজনা আর উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা দূরে শান্তির তপোবনে বসে আনন্দের অনুভব যেন ক্রমশ ধরা পড়ছিল। সঙ্গী সাধু নিজের মনে ডুবে আছেন। রাও সাহেব থই পান না। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখেন সাধু নেই। তাকে ফেলে ফেরার হয়ে গেছেন। পথের সাথী পথে রেখে গেছেন।

এতদিন তবু একটা অবলম্বন ছিল। সাধুকে হারিয়ে আবার যেন অস্থির হয়ে ওঠেন রাও সাহেব। হিমালয়ের এই গভীর গহনে একলা কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। আবার সেই পুরনো এলাকায় ফিরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

ইংরেজ গুপ্তচর নেকড়ের মত তার গন্ধ শুঁকে ফিরছে। সারাক্ষণ অস্থির এক দুশ্চিন্তায় পালিয়ে ফেরা সে-যেন এক দুর্বিসহ জীবন। এই জীবন থেকে মুক্তি চাই!

চটির সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন রাও সাহেব।

সেই সময় তার মনে পড়লো মহাপন্থার কথা।

সামনের পথটা পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে অদৃশ্য হয়ে কেদারনাথে গিয়ে পৌঁচেছে—আর কেদারনাথের পিছনে মহাপন্থা।

সাধুই তাকে মহাপন্থার কথা বলেছিলেন।

সংসারবিরাগী সাধু-সন্ন্যাসী মোহবন্ধন ও পার্থিব মায়া ত্যাগ করে চিরমুক্তির আশায় কেদারনাথের পিছনে কোন দুর্গম পাহাড়ের চূড়োয় উঠে সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়েন—আর নিচে ছুঁচের মুখের মতো মরণ শিলায় তার শরীর আছড়ে পড়ে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটায়। পাহাড়ে-পাহাড়ে কঁকিয়ে ওঠে তার মরণ আর্তনাদ।

অবশ্য ঝাঁপ দেবার আগে টিহরির রাজার কাছে গিয়ে আবেদন করতে হয়।

রাজামশাই, আবেদনকারী প্রকৃতই বিগতস্পৃহ কিনা তা পরখ করবার জন্যে সুন্দরী নারী এবং ভোগ্য-বিলাসদ্রব্য দিয়ে দীর্ঘ দু'মাস কাল নজরবন্দী করে রাখেন। যদি দেখা যায়, প্রকৃতই সুন্দরী নারীসঙ্গের লিপ্সা নেই, বিলাস সুখে আসক্তি নেই, ভোজনে বীতরাগ তা হলেই তাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

রাও সাহেবের মনে হয়, মহাপন্থায় ঝাঁপ দিয়ে জীবনের যতি টেনে দেওয়াই ভালো। এই নির্বাসিত অসুখী জীবন সমস্ত জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে।

তবু অসুবিধে থেকে যায়, টিহরির রাজা কোম্পানীর দোস্ত। কোন রকমে একবার পরিচয় জেনে ফেললে ইংরেজদের ফাঁসি কাঠ ছাড়া অন্যপথ থাকবে না।

ছলছল করে ওঠে রাও সাহেবের মন। ছবির মত প্রিয় পরিচিত একটি মুখ—প্রোষিতভর্তৃক হৃদয় নিয়ে কালো আঁখি-পল্লব মেলে অপেক্ষা করছে। হয়তো তার মনের গভীরে এখনো একটি সুখের খেলাঘরের স্বপ্ন দিনের আকাশে রাতের তারার মতো অস্পষ্ট!

সারা দিন এক আসনে বসে ভাবনায় ডুবে থাকেন রাও সাহেব। সেই বিধুরা-নারীর দুহাতের মধ্যে নিজেকে সঁপে দেবার আকর্ষণ উত্তাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, জীবন কী মধুর! ভাঙা ঘর জোড়াদেবার স্বপ্ন তার চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

না, আর যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, ধন নয় মান নয় এখন বাসনা শুধু ভালবাসা আর ভালবাসার নীড়।

পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলেন রাও সাহেব। জ্বালামুখী থেকে পাহাড়ি-পথে বসতি বিরল এলাকাব ভিতর দিয়ে জম্মুর দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখনো বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহীদের গোপন ঘাঁটি ছিল—সেই ঘাঁটিতে বসে বিশ্বস্ত লোক দিয়ে স্ত্রীর কাছে খবব পাঠালেন রাও সাহেব।

তারপর একদিন আবার জম্মু রাজ্যের চিনানিতে ছেলে-বৌ নিয়ে সংসার পাতলেন রাও সাহেব।

দেশ থেকে দূর বিদেশে অপরিচিত মানুষজনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে বসেও সুখ ছিল না রাও সাহেবেব। দেশের জন্যে দেশেব মানুষের জন্যে তার মনে বেদনার অন্ত ছিল না।

পাহাড়ি পথে, উপত্যকায়, মন্দিরে, আপেলের বনে যখনই ঘুরতেন চারদিকে তাকিয়ে দেখতেন চলমান মানুষের ভিড়ে কোন মারাঠীর মুখ দেখা যায় কিনা।

হঠাৎই একদিন একজন মারাঠীর দেখা পেলেন রাও সাহেব। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রাও সাহেব দেশের মানুষ পেয়ে। আদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। আপ্যায়নের ত্রুটি রইলো না।

দুজনের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে উঠলো কিছুদিনের মধ্যে।

অপরিচিত মারাঠীকে এখন আত্মীয় বলে মনে করেন রাও সাহেব।

লোকটিও বিদেশ-বিভূঁইতে একজন দেশের মানুষ খেয়ে প্রাণ-ঢালা ভালবাসা দিয়ে আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রতিদান দেয়।

কতদিন বিশ্রামের অবকাশ দুজনের উচ্চকিত হাসিতে, আলাপ-সংলাপে ও স্মৃতিচারণে মুখর হয়ে ওঠে।

এমনি এক প্রগলভ অবকাশে রাও সাহেব নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে ফেলেন।

আপনি রাও সাহেব! লোকটি তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, আমার এত

সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছি না। তারপর রাও সাহেবের পায়ের কাছে বসে বলে, এতদিন আপনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করেছি সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করুন।

দু-হাত ধরে লোকটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে রাও সাহেব বলেন, এই বিদেশে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। তোমাকে মার্জনার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

রাও সাহেবের স্ত্রী সব শুনে বললেন, তুমি ভাল করো নি।

কেন? অবাক হলেন রাও সাহেব।

মানুষের মন। আমার বড্ড ভয় করে।

লোকটি আগের মতো আসে যায়। ব্যবহারে কোন পার্থক্য নেই। তেমনি সহৃদয় ও স্মিত তার ব্যবহার।

রাও সাহেবও বেশ কিছু দিন ভয়ে-ভয়ে রইলেন। কাজটা ভাল হয় নি।

তার মাথার জন্যে সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। জীবিত অথবা মৃত রাও সাহেবের খবর যে দিতে পারবে মোটা টাকা তার ভাগ্যে জুটবে।

কোম্পানী বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহীদের মধ্যে বাহাদুর শাহ কারাগারে। কুনোয়ার সিং—লক্ষ্মীবাঈ মৃত। নানা সাহেব ও হজরত মহল বেগম তেরাইয়ের জঙ্গলে ফেরার। ফিরুজ শাহ সীমান্তের ওপারে আফগানিস্তানে কি কনস্ট্যানস্টানিপোলে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। দুই মারাঠী সহযোগী; তাঁতিয়া টোপী ও রাও সাহেবের মধ্যে একজনের ফাঁসি হয়ে গেছে, বাকি শুধু রাও সাহেব। এই রাজপুত্রকে মারাঠীরা এখনো দেবতার মতো মানে। তেমন-তেমন সুযোগ এলে আবার নতুন করে আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

তা ছাড়া ছোট-খাটো বিদ্রোহী নেতারা এখনো বহু এলাকায় সক্রিয়।

সারা ভারতময় দেশীয় রাজ্যে যে-সব পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিল ইংরেজদের তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যে নির্দেশ পাঠানো হল।

রাজ্যের সর্বত্র এই সব এজেন্ট স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে মিশে গিয়ে সারা এলাকায় নবাগত মানুষজনের আসা-যাওয়ার হিসেব-নিকেশ রাখে, কোতয়ালীতে খোঁজ-খবর পৌছে দেয়। সেখান থেকে পলিটিক্যাল এজেন্টের অফিসে পৌছে যায়।

জম্মু রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট মিষ্টার ম্যাক্‌নারের অফিসে একদিন একজন লোক এসে হাজির হয়ে বললো, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। জরুরী খবর আছে।

লোকটিকে ভাল করে সার্চ করে মিষ্টার ম্যাক্‌নারের ঘরে হাজির করা হল।

লোকটি ভিতরে ঢুকতে মিষ্টার ম্যাক্‌নার ফাইল থেকে মাথা না-তুলেই বললেন, কি চাই ?

লোকটি উত্তর দিল, হুজুর আমি রাও সাহেবের খবর এনেছি।

রাও সাহেব ! চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন মিষ্টার ম্যাক্‌নার।

হ্যাঁ হুজুর, চিনানিতে বৌ আর ছেলে নিয়ে বসবাস করছেন।

কতদিন আগেকার খবর ?

আজ সকালেও তাকে দেখে এসেছি।

এ খবর আর কে জানে ?

আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

আজ রাত্রে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে ?

—যাবে হুজুর। তবে এখুনি রওনা দিতে হবে।

আমি আজ রাতেই রওনা দেব।

নিঝুম পাহাড়ি এলাকা চিনানি। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে ফেলেছে। রাও সাহেবের বাড়িটাও সেই কুয়াশায় বুঝি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রাও সাহেবের স্ত্রী মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বললেন, কুকুরটা সারা রাত ডাকছে—এক একবার তাড়া করে ছুটে যাচ্ছে বাইরে। কি ব্যাপার বল তো !

কি জানি। ঘুমের ঘোরেই উত্তর দিলেন রাও সাহেব।

আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে !

পাশ ফিরে রাও সাহেব জড়ানো গলায় জবাব দিলেন, কোন জানোয়ার-টানোয়ার দেখেছে বোধহয়। তুমি ঘুমোও—

রাও সাহেবের স্ত্রী ঘুমোতে পারেন না। অজানা এক আশঙ্কায় তার বুক কাঁপতে থাকে। স্বামী আর ছেলের মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থেকে তার ভয়ের প্রহর কাটে।

সকালে দরজা খুলতেই কুয়াশার ভিতর থেকে গোরা সেপাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দী করলো তাঁকে।

বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রাও সাহেব বললেন, আমি নিরপরাধ। কোন

অসামরিক ইংরেজ হত্যার রক্তে আমার হাত কলঙ্কিত নয়। আমি যোদ্ধা। শত্রুর মুখোমুখি অস্ত্র হাতে লড়াই করেছি। নিরীহ নরনারীর ওপর অস্ত্রাঘাত আমার ধর্ম নয়।

কর্নেল উইলিয়মস রাও সাহেবের বিরুদ্ধে একষট্টি জন সাক্ষী দাঁড় করালেন।

তাদের জেরা করলেন বাঘা-বাঘা সামরিক অফিসারেরা। সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই কানপুর ইংরেজ নর-নারী হত্যার ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের কারো কথাতেই রাও সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। উপরন্তু সাক্ষীদের সবাই বললেন, কানপুরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাও সাহেবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন যোগ ছিল না।

সাক্ষীদের কথায় আরো প্রকাশ পেল, মধ্যভারতে কোন ইংরেজ নারী-পুরুষ অথবা শিশু হত্যার সঙ্গেও রাও সাহেবের যোগ ছিল না। বরং এ জাতীয় হত্যা তার সৈন্যদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল।

ব্রিটিশ প্রশাসন এতে দমে গেল না। ইংরেজরা যাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে বলে ঠিক করেছে তাকে ফাঁসি দেবার অছিলা বা বাহানার অভাব তাদের হয় না।

সতী চৌরাঘাটের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। নানা সাহেবকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় নি—তার ভাইপোকে পাওয়া গেছে। দোষী হোক আর নির্দোষ হোক তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রশাসন একই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে।

সতী চৌরাঘাটের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা এইরকম :

কানপুরের সেপাইরা বিদ্রোহ করলে স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসন সরেজমিনে ঘটনার পূর্বাপর দেখে-শুনে তখুনি বুঝতে পারলেন, সেপাইদের আর ঠেকানো যাবে না কাজেই সামরিক-অসামরিক বাসিন্দা নির্বিশেষে সুরক্ষিত কোন আশ্রয়ে গিয়ে কামান-বন্দুক সাজিয়ে সেপাইদের ঠেকাতে লাগলো।

সেপাইরা অবরুদ্ধ ইংরেজদের ঘিরে দিনরাত কামানের গোলা দাগতে লাগলো। আর বৃষ্টির ধারার মত বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে লাগলো।

১২ জুন সেপাইরা অবরুদ্ধ ইংরেজদের ওপর ব্যাপক এক আক্রমণ চালালো ; সুবিধে হল না তাতে। মরিয়া ইংরেজরা অবরোধের ভেতর থেকে তেড়ে-ফুঁড়ে সেই আক্রমণকে কামান আর বন্দুক দিয়ে ভোঁতা করে দিল। ইংরেজদের গুলির আঘাতে বেশ কিছু সেপাইও মারা পড়লো।

২৩ জুন সেপাইরা আরেকবার আক্রমণ চালালো—সেবারও তারা ইংরেজদের গুলি বর্ষণের তোড়ের সামনে লজ্জাজনক ভাবে পিছন সরে এল।

অবরুদ্ধ ইংরেজরা কিন্তু ইতিমধ্যে বুঝে নিতে পেরেছিল এবার সেপাইদের কাছে জল ও খাবারের অভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তারা সেপাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার কথা ভাবছিল।

এমন সময় নানা সাহেবের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে একজন ইউরেশিয়ান মহিলা অবরোধের ভিতর এসে হাজির হলেন। চিঠিতে নানা জানিয়েছেন, ডালহৌসির 'রাজ হড়প্ কী নীতি'র সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন ইংরেজদের এলাহাবাদ যাবার সুযোগ দেওয়া হবে। নিরাপদে যাতে যেতে পারেন সে ব্যবস্থাও করা হবে।

ইংরেজরা হাতে স্বর্গ পেল। দু-পক্ষে যথাবিধি চুক্তির সই-সাবুদ হল। ঠিক হল, ইংরেজরা তাদের এলাকা খালি করে দেবে আর নানাসাহেব তাদের খাবার-দাবার ও চল্লিশটা নৌকো দেবেন এলাহাবাদ যাবার জন্যে।

চুক্তির পরদিন ২৭ জুন।

ইংরেজরা নারী ও শিশুসহ সতী চৌরাঘাটে তাদের জন্যে অপেক্ষমান নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। শেষ ইংরেজটি নৌকোয় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর মাঝিরা একসঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাঙার দিকে এগোতে লাগলো।

এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইংরেজদের কেউ-কেউ মাঝিদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

সেপাইদের যে-দলটা বন্দীদের পাহারা দিয়ে নদীতে এনেছিল তারা ইংরেজদের মাঝিদের ওপর গুলি চালাতে দেখে বন্দুক তুলে ফিরিঙ্গিদের ওপর গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো।

ইংরেজদের এনফিল্ড রাইফেলের সামনে দাঁড়াতে না-পেরে পাহারাদার সেপাইদের দল নদীর পাড় থেকে সরে এল।

তারপরই কামান-বন্দুক নিয়ে আরেক দল সেপাই গিয়ে হাজির হয়ে নৌকোর ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ শুরু করে দিল।

গোলা-গুলির ফুলকি পড়ে খড়ে-ছাওয়া একটা নৌকোয় আগুন ধরে গেল সেই আগুন পাশের আর সব নৌকোয়ও ছড়িয়ে গেল। ফলে যারা পারলো জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর বেশির ভাগ আহত, রুগ্ন ও শিশু আগুনে পুড়ে মরলো।

যারা বাঁচবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের অনেকেই মরলো সেপাইদের গুলিতে। বন্দী হল কেউ কেউ। শুধু একটা মাত্র নৌকো কোন রকমে আগুনের হাত থেকে বেঁচে আরোহীদের নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

আবার নতুন করে তালিম দেওয়া সাক্ষীদের আমদানী করা হল। তারা হলফ করে সত্যি কথা বলার অঙ্গীকার নিয়ে নির্জলা মিথ্যে বলে গেল। আর তাদের

বিবৃত প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে রাও সাহেব দোষী সাব্যস্ত হলেন। অসংলগ্ন মিথ্যের কলঙ্কে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

সামরিক আদালতের ন্যায়বিচাব দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করলো : *To bt hanged by the neek tıll dcath*

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মাভব এক'শ পঁচিশ বছর পরে মাতৃভূমিব মুক্তি যোদ্ধা রাও সাহেবকে আমরা কি মনে বাখতে পেরেছি।

প্রাচীরে-প্রাচীরে পড়েছে প্রাচীরপত্র।

আঠারো শ' সাতান্ন সাল।

হিন্দুস্থানীতে লেখা এই প্রাচীরপত্র মাদ্রাজের সর্বত্র লটকে দেওয়া হয়েছে।

পথ চলতি রাহী পথে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

ভাষা তো নয় আগুন!

অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরবার আহ্বান করা হয়েছে এই সব প্রাচীরপত্রে।

ন্যায়-নীতিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে যারা শোষণ ও শাসনকে কায়েম করেছে—তাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আর দেরি নয়—। দেশের মানুষ জেগে ওঠো—হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে এসো—লড়াইতে সামিল হও। ইংরেজ শাসনের বুকের ওপর আগুন জেলে দাও!

সবার মুখে এক প্রশ্ন: কে লিখেছে—কারা লিখেছে!

দু-চার জন ফিসফাস করে বলাবলি করতে লাগলো, এ বোধহয় মৌলভী আহমদ আলি শাহ ও দলবলের কাজ।

তারপর সব চুপ হয়ে গেল। মৌলভীরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সবাই ভাবলো, লোকটা গেল কোথায়!

মৌলভী ততোদিনে মাদ্রাজের আর্কট ছেড়ে উত্তর ভারতের দিকে পা বাড়িয়েছেন। সঙ্গে শিষ্য আর সাঙ্গোপাঙ্গের দল।

পথ-চলতি মৌলভী এক-এক জায়গায় তাঁবু ফেলেন আর মানুষজনদের ডেকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৎপর হওয়ার মন্ত্র দেন। মানুষেরা অবাক হয়ে তার কথা শোনে। আর মনে-মনে ভাবে, এ কেমন ফকির! খোদাতাল্লা—কোরান-হাদিশ-নামাজের কথা মুখে নেই! তবু যারা শোনে তারা মুগ্ধ হয়। তার দলে নাম লেখায়।

তাঁবুর সামনে মশালের আগুন জ্বলে।

হু-হু করে শীতের বাতাস বয়।

তবু রাত-ভোর লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই।

ভোর রাতে তাঁবু ভেঙে আহমদ আলি শাহ গ্রামান্তরে যাত্রা করেন।

গাঁয়ের লোক দেখে তাদের কিছু ভাই-বেরাদর প্রতিবেশীও সেই সঙ্গে ফেরার হয়ে গেছে।

দক্ষিণ ভারত থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে আহমদ আলি শাহ দিল্লির কাছাকাছি আগ্রায় এসে উঠলেন।

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তখন ভারি গরম হয়ে উঠেছে।

অযোধ্যার নবাবকে তার রাজ্যপাট থেকে সরিয়ে নিয়ে কলকাতায় বন্দী করে রাখা হয়েছে।

কোম্পানির শক্তি আর দম্ভ সারা উত্তর ভারত জুড়ে দাপাদাপি করে ফিরছে। ইংরেজরা মুখে ন্যায়-বিচারের কথা বলছে আর নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে পান থেকে চুনটুকু খসতে দেখলে ন্যায়-বিচারকে গলা ধরে জাহান্নামে পাঠিয়ে স্বমূর্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে।

আহমদ আলি শাহ আগ্রা এসে ডেরা-ডাণ্ডা গাড়লেন। তখনো স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্জয় এই পথিকের পথরেখা ব্রিটিশ সরকার হয়তো চিনতে পারেন নি হয়তো বা চিনতে হেলফেলা করেছেন। ফকিরের আলখাল্লার নিচে যে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে কোম্পানী প্রশাসনের কাছে তা অকল্পনীয়!

আগ্রায় তাঁবু ফেলে বসলেন আহমদ আলি শাহ। তাঁবুর পাশে হাতি বাঁধা। ঘোড়া বাঁধা। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে উটের পাল। পতপত করে উড়ছে চাঁদ-তারা আঁকা নিশান!

আগ্রার কমিশনারের কাছে খবর গেল, মস্ত বড়ো এক ফকির আগ্রা শহরের বুকের ওপর ডেরা বেঁধেছে।

না, এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। প্রশাসন নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য ব্যাপারে মন দিল।

এদিকে তাঁবুর মৃদু অন্ধকারে আসন বিছিয়ে বসেছেন আহমদ আলি শাহ। চেরাগের উজ্জ্বল আলোতে রহস্যময় সেই পুরুষ। দুর্বোধ্য তার ব্যক্তিত্ব। এক-হারা দীর্ঘ পুরুষালি অবয়ব। দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা দেয় এমন পাতলা চোয়াল। আর খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল!' মুখের মধ্যে সব চেয়ে বৈশিষ্ট্য তার চোখে—সে চোখের দৃষ্টি যেন সমসাময়িক কাল ছাড়িয়ে দূর ভবিষ্যতের কোথায় গিয়ে পড়েছে! দাড়ির সঙ্গে চুলের রাশও নেমেছে নিচের দিকে—কাঁধের উপর এলিয়ে পড়েছে সেই কালো চুলের বাহার!

মৌলভীর কাছে যারা খোদার মেহেরবানি পেতে এসেছিল—যারা এসে বুজরুগির খোঁজে এসেছিল ব্যর্থ হতে হল তাদের। আহমদ আলি শাহের কাছে কোন তামাসার

সুযোগ নেই। তার চোখে আগুন। তার কথায় আগুন। যারা কিছু পেতে আসতো তাদের তিনি একমুঠো আগুন দিয়ে বলতেন, এ আগুন বাইরে নিয়ে ছড়িয়ে দাও—ভারতবর্ষ জ্বলে উঠুক—ছারখার হয়ে যাক ইংরেজ!

একটু-একটু করে হুঁশ হতে থাকলো ইংরেজ সরকারের। তারা খোঁজ করতে লোক পাঠালেন।

ফকিরের তাঁবুর সামনে যেন মেলা বসে গেছে। মানুষজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। গিসগিস করছে দর্শনার্থী। অবারিত দ্বার। যে-কেউ আসে। বসে। ফকিরের কথা শোনে। অনুচ্চ অথচ দৃঢ় তার কণ্ঠস্বর। তাতে সম্মোহনী মেশানো।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খবর পেলেন, ফকিরের হালচাল ভালো নয়। হুঁশ হল তাদের। মৌলভীকে ধরে আনবার জন্যে লোক পাঠানো হল।

আগ্রা থেকে বেশ কিছু লোকজন জুটিয়ে মৌলভী লক্ষ্ণৌ সরে পড়েছেন।

১৮৫৭র ফেব্রুয়ারী মৌলভী লক্ষ্ণৌ গিয়ে হাজির হলেন। এবার তার সঙ্গীদের হাতে অস্ত্র। এবার মৌলভীর চলাফেরা নির্ভীক। এতদিন তার কাজে কর্মে একটু গোপনতা ছিল। এবার কোন আড়াল নেই। লক্ষ্ণৌ পৌঁছে আহমদ আলি শাহ এক ইস্তাহার দিলেন। তাতে দেশের মানুষকে, সাগরপারের এই অত্যাচারীদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই হল উপযুক্ত সময় তাদের আঘাত করবার—জীবন পণ করে এগিয়ে এসো। সবাই একজোট হয়ে আঘাত করলে ইংরেজ শাসন ভেঙে পড়বে। আমাদের দেশে আমরা রাজা হব। অন্য কেউ নয়।

মাসখানেক লক্ষ্ণৌ থেকে আহমদ আলি শাহ ১৮৫৭র ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার অন্ধকারে ফৈজাবাদে হাজির হলেন। রাজকীয় এক মিছিলের সামনে হাতির পিঠে চড়ে মহাসমারোহে ফৈজাবাদের শহরে পা দিলেন। সঙ্গে অসংখ্য অনুচরের দল। সবাই সশস্ত্র। একদল চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। তাদের আগে পায়ে-হাটা জঙ্গী অনুচর। উঠে চড়া অনুগামীর সংখ্যাও কিছু কম নয়। মাথায় তাদের পাগড়ির বাহার। খাপে ঝোলা তরবারি বাজছে ঝনঝন করে।

ফৈজাবাদে খোলা এক মাঠ দেখে মৌলভী তাঁবু ফেললেন। লোক-লস্কর হাতি-ঘোড়া-উট গিসগিস করছে। মেলা বসে গেল শহরে। পরব নেই তবু যেন পরবের আবহাওয়া। লোকজনের ভিড় দেখে দোকানিরা পসরা সাজিয়ে বসলো।

মৌলভী একদিন হাজির হওয়া মানুষদের লক্ষ্য করে, বলছিলেন, আমরা কি বেওকুব—আমাদের দৌলত লুঠ হয়ে যাচ্ছে—অবিচার পিঠের ওপর চেপে বসছে-ধর্ম বিপন্ন হচ্ছে তবু আমাদের হুঁশ নেই। যারা আমাদের জাহান্নামে ঠেলে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কি কিছু করবার নেই।

মুখ বুজে মৌলভীর কথা শুনছে সবাই।

বাজ পড়ার মতো হেঁকে উঠলেন আহমদ আলি শাহ, কী জবাব দিচ্ছ না যে —আমরা কি আওরত। মুখ বুজে এই অত্যাচার সহ্য করে যাবো—অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার মরদ আমাদের মধ্যে নেই। হাজার-হাজার পাঠানো তলোয়ার তুলে বললো আমরা আছি। ফৈজাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের চাপড়াসি যাচ্ছিল পথ দিয়ে—সে বেচারা তামাসা দেখার জন্যে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে থ মেরে গেল। মৌলভী বলে কি !

মৌলভীর হালচাল বেতরো ঠেকছে। এই ডামাডোলের বাজারে কানাঘুষোয় কতো রকম কথা বাতাসে ভেসে আসছে। কী যেন একটা ঘটতে চলেছে। কানে যা আসে সব কথা তো সাহেবদের বলা যায় না কিন্তু মৌলভীর কথা তো না বললে নয়। চেপে গেলে কেউ জেনে গিয়ে সাহেবকে লাগাতে পারে। কি জানি তখন হয়তো বিপাকে পড়তে হতে পারে।

চাপরাসি তড়িঘড়ি সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটলো।

চাপড়াসির কথা শুনে ভুরু কুচকে গেল ম্যাজিস্ট্রেটের। সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেপ্তারী পয়োয়ানা জারি করে ধরে আনবার জন্যে লোক পাঠালেন। এ কথাও সাহেব বলে দিলেন, সঙ্গের লোকজনদের বলবে, ফৈজাবাদে থাকতে গেলে অস্ত্র-শস্ত্র সব জমা দিতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে লোকেরা হাজির হলে মৌলভী গর্জে উঠলেন, কে গ্রেপ্তার করবে—আল্লা ছাড়া কারো এক্তিয়ার নেই আমাকে গ্রেপ্তার করবার !

যারা মৌলভীকে গ্রেপ্তার করতে গেছিল তারা থতোমতো খেয়ে গেল। বলে কী লোকটা !

ইতিমধ্যে শ'য়ে—শ'য়ে পাঠান খোলা তরবারি হাতে মৌলভীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। ,দুর্ভেদ্য ব্যূহ। ভেতরে ঢুকতে গেলে মুণ্ড বাইরে রেখে যেতে হবে।

যারা গ্রেপ্তার করতে গেছিল ধরে নিতে হবে তাদের বুদ্ধিতে ঘাটতি ছিল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারা ব্যাপারটা বুঝে নিল 'তারপর শনৈঃ শনৈঃ পিছু হঠে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে গিয়ে হাজির হল।

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, আসামী ?

ফিরে-আসা দলটির মুখপাত্র বলল, ফৌজ না পাঠালে মৌলভীকে ধরে আনা সম্ভব নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তথাস্তু।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে একদল ফৌজ হাতিয়ার বাগিয়ে ছুটলো।

মৌলভী আহমদ আলি শাহ ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন। তার দলবল তৈরি হয়েছিল।

কোম্পানীর ফৌজ হানা দিতেই মৌলভী তার জঙ্গী বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধ ঠিক নয় তবে খোলা তরবারির সাংঘাতিক সংঘর্ষ।

দুপক্ষের আহত মানুষজনের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় রক্তপাতের কারো পরোয়া ছিল না।

মৌলভী ধরা পড়লেন। দুজন অনুচর নিহত হল।

সহরে এমন একটা ব্যাপার ঘটলো অথচ সহরবাসীর চেতনায় তেমন সাড়া মিললো না। দূর থেকে দাঁড়িয়ে যেন মজা দেখতে লাগলো।

শুধু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, কেমন মানুষ এরা গোরাদের সঙ্গে টক্কর দেবার হিম্মত রাখে!

ম্যাজিস্ট্রেট আহমদ আলি শাহকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

যারা মৌলভীকে ধরে আনতে গেছিল তারা বললো, সর্বনাশ-সাধারণ জেল একে আটকাতে পারবে না। মৌলভীর চেলা-চামুণ্ডরা যে-কোনদিন তাকে হামলা করে জেল ভেঙে বের করে নিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং মৌলভীকে ক্যান্টনমেন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। সেখানে সশস্ত্র পাহারা বসলো তার ঘরের চারপাশে।

বন্দী বাঘ নিঃশব্দে ওৎ পেতে রইলো কখন গরাদ-ভাঙা সংগ্রামীরা এসে তার বন্দী-দশা ঘোচাবে!

ফৈজাবাদের কোন হুঁশ নেই। তার চিরাচরিত জীবনযাত্রায় কোন বিরতি নেই। এতবড়ো একটা ব্যাপার যে ঘটে গেল সে-সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কৌতূহলেও কোন ঢেউ উঠলো না। মৌলভী আটকা পড়ে রইলেন কড়া পাহারায়। যেমন-তেমন শত্রু তো নয়—একেবারে আগুনের ফুলকি।

অযোধ্যার একেবারে পূর্ব প্রান্তে ফৈজাবাদ প্রদেশ। সুলতানপুর, সালোনি আর ফৈজাবাদ জেলা নিয়ে ফৈজাবাদ প্রদেশ। এখানে বেশ কিছু কাল ধরে কড়া শাসন চলছে কোম্পানীর। ফৈজাবাদ জেলায় ফৈজাবাদ সহর। সেখানে কর্ণেল লেনক্সের অধীনে ঘাঁটি আগলাচ্ছে ২২তম ইনফ্যান্ট্রি, ৬তম ইররেগুলার ইনফ্যানট্রি। এছাড়া কিছু অশ্বারোহী আর গোলন্দাজ।

সেনা ব্যারাকে চলছিল বিনিদ্র প্রহর যাপন।

ওয়াজেদ আলি শাহকে অন্যায় ভাবে রাজ্যচ্যুত করে কলকাতায় নিয়ে বন্দী করে রাখার জন্যে সারা রাজ্য জুড়ে তুমুল কোলাহল উঠেছে। রাজ্যের মানুষ অবাক হয়ে ভাবতে বসলো, এই তাহলে কোম্পানীর ন্যায় বিচারের নমুনা! কী অন্যায় করেছিলেন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ! তার রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ছিল না। রাজ্যের শাসনকার্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সমানভাবে নিয়োগ করা হত। রাজ্যের বিচারশালা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে সর্বদাই তৎপর ছিল। সুখে-শান্তিতে কাল কাটাচ্ছিল অধিবাসীরা।

এ কথা ঠিক, নবাব নিজে শাসনকার্য পরিচালনার সময় পেতেন না! সঙ্গীত-চিত্রকলা-নৃত্যগীত নিয়েই তার সময়-অসময় ব্যস্ত—। ইরান থেকে আসা এই অভিজাত বংশ মুঘল দরবারের কুৎসিৎ রাজনীতির শিকার হয়ে মানে-মানে দরবার ছেড়ে অযোধ্যায় নিজেদের রাজ্য-পাট বসান। অসন-বসন-সংলাপে সৌকুমার্যে অভিলাসী এই পরিবার চিরকালই মানসিক চিৎ প্রকর্ষের অনুরাগী। এই অনুরাগ ওয়াজেদ আলির জীবনে পুষ্পিত সমারোহ হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অভিযোগ তো তার বিরুদ্ধে আনা হয় নি। প্রজাদের অত্যাচার-নিপীড়নের অভিযোগ ও ইংরেজদের ঝুলিতে ছিল না। তুচ্ছ, সামান্য ও ভাসা ভাসা অভিযোগ এনে নির্বাসনের নাম করে কলকাতায় নিয়ে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

নির্দোষ যদি বিনা কারণে শাস্তি পায় তবে মানুষ কোন সুবিচারের আশায় এই জুলুমবাজ কোম্পানীর দিক মুখ তুলে তাকাবে।

রাজ্যের সাধারণ মানুষ ঘরে-বাইরে মাঠে-ময়দানে খেতিতে নিজেদের মধ্যে চুপি সাড়ে এসব বিষয় আলোচনা করতো। মেহেরবান আল্লার কাছে অসহায় মানুষ-গুলোর প্রার্থনা পৌঁছচ্ছিল কি না কে জানে তবে কালের অনড় চাকা হঠাৎ বুঝি নড়ে-চড়ে উঠলো।

এ ছাড়া আরেকটা ব্যাপারও ঘটেছিল যা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশে রাজা মান সিংহ অত্যন্ত মানী ব্যক্তি ছিলেন। নবাবের রাজ্যসীমার মধ্যে বিশাল এলাকা জুড়ে তার জমিদারী। হিন্দু-ধর্ম রক্ষার জন্যে তার তলোয়ার সর্বদাই প্রস্তুত। রাজা মানসিংয়ের সঙ্গে তার জমিদারীর দেয় রাজস্বের হিসেব-নিকেশ নিয়ে কোম্পানীর গোলমাল হয়। আর এই গোলমালের ছুতো ধরে ইংরেজরা তাকে বন্দী করে জেলে নিয়ে ফেলে রাখে।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এলো মীরাঠের সৈন্যরা সেনা-ছাউনি উড়িয়ে-পুড়িয়ে, জেল ভেঙে, ট্রেজারি লুঠ করে, ইংরেজদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল্লির রাস্তায় নেমে পড়েছে।

খবর বোধহয় চিতাবাঘের থেকেও জোরে ছোটে আর এরকম খবর হলে তো কথা নেই। তার দৌড়ের পাল্লা বাতাসের মতো। খবর এসে আছড়ে পড়লো ক্যান্টেনমেন্টের দরজায়।

কোম্পানী বাহাদুরের সামরিক কর্মচারীদের ঘুম গেল উড়ে। তারা ভাবলো আমরা মরি ক্ষতি নেই। বৌ-ছেলে-মেয়ে এদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। লক্ষ্ণৌ পাঠাবে সে ভরসাও তারা পেল না। পথ-ঘাটের অবস্থা ভালো নয়। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। তখন মানসিংয়ের কথা মনে পড়লো। তাকে সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হল। বিনয়ের অবতার হয়ে সাদা-চামড়ার মানুষগুলো স্বীকার করলো, তাদের ভারি ভুল হয়ে গেছে।, মহারাজ যেন নিজ গুণে তাদের গোস্তাকি মাপ করেন।

খাতির বেড়ে গেল মানসিংয়ের। ইংরেজরা তাকে পাকে-চক্রে জানিয়েছিল, বাজারের যা হাল-চাল তাতে মানসিং যেন তাদের একটু নজরে রাখেন আর ছেলে-মেয়ে-বৌদের তার জিম্মায় রাখার ইচ্ছে তাদের।

উদার মানসিং বললেন, এ আর এমন কি ব্যাপার। মেহমানের কোন ক্ষতি আমি বরদাস্ত করবো না। বিবি আর ছেলেপুলেরা আমার আশ্রয়ে নিরাপদে থাকতে পারবেন। এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।

'সাহেবলোগ' নিশ্চিন্ত হল।

জেলে বসে দিন কাটছিল না আহমদ আলি সাহেবের। একটা হুঁকো আর কিছু তামাক পেলে তবু একটা অবলম্বন হয়!

পাহারাদার গোরা সাহেবকে সে-কথা বলতে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, জেলে বসে নেশা-ভাঙ চলবে না মৌলভী।

ব্যাজার হলেন আহমদ আলি শাহ। করবার কিছু নেই। পড়েছি মোঘলের হাতে…। দেশের বাদশা এখন কোম্পানী। তাদের জেলে বসে তাদের কথা শোনা ছাড়া উপায় কি! তবু মাঝে-মাঝে আহমদ আলি শাহর ইচ্ছে করে, দেখি না একবার চেষ্টা করে কোম্পানীর এই বন্দী শালা ভেঙে ফেলা যায় কি না!

খবরটা যে করেই হোক, ক্যান্টনমেন্টের কমাণ্ডার লেনক্সের কাছে পৌঁছল। মৌলভীর এই নির্দোষ অভিলাষের মধ্যে দোষের কিছু খুঁজে পেলেন না। তিনি এসে চমৎকার একটা বাঁধানো হুঁকো আর তামাক তাকে উপহার দিয়ে গেলেন।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে আহমদ আলি শাহ বললেন মনে থাকবে ' সাহেব।

লেনক্স সাহেব মুচকি হাসলেন।

ইতিমধ্যে মীরাটে বিদ্রোহের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।

পদাতিক-অশ্বারোহী আর গোলন্দাজ বাহিনী এক সঙ্গে কাঁধ দাঁড়িয়ে কোম্পানী শাসনের টুটি চেপে ধরেছে।

হাট-বাজার গ্রাম-গঞ্জের লোক যে-যেখানে ছিল হাতিয়ার তুলে, 'ফিরিঙ্গিয়ো কো মারো—ফিরিঙ্গিয়ো কো মারো' বলতে-বলতে ফিরিঙ্গি নিবাসের দিকে ছুটতে লাগলো।

আগুন হয়ে জ্বলতে লাগলো মীরাট।

বাজার-বাংলো-অফিস-হোটেল-টাঁকশাল-গুদোম আগুন হয়ে জ্বলতে লাগলো। ভয়ঙ্কর এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী মীরাটের আকাশ ঢেকে ফেললো। অন্ধকার নেমে এলো মধ্য দিনের প্রহরে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আগুন জ্বললো মীরাটে।

দিল্লি-মীরাটের টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হলো। রেললাইনের ধারে কড়া পাহারা বসলো বিদ্রোহীদের।

ব্রিটিশ প্রশাসন মুছে গেল মীরাটের বুক থেকে।

সারাদিন ধরে ইংরেজ ও ইংরেজ-শাসন নিকেশ করে রাত নামতে বিদ্রোহীরা দিল্লির দিকে পা বাড়ালো।

সম্ভবত সেই বিদ্রোহীদের একটা দল ফৈজাবাদে গিয়ে হাজির হল। খবর জানা ছিল তাদের, মৌলভী সাহেব ফৈজাবাদের জেলে বন্দী হয়ে আছেন।

বিদ্রোহীরা এসে হানা দিল ফৈজাবাদে। ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো ফৈজাবাদ। যে-সহর এতদিন বুকের ভিতর ভয় পুষে জবু-থবু হয়ে বসেছিল—হঠাৎ ঝড়ের বাতাস লাগতে কোথায় উড়ে গেল সেই ভয়! বুক চিতিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো হাতিয়ার নিয়ে—তারপর বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশে ছুটলো ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে আছেন মৌলভী সাহেব। তাকে বের করে আনতে হবে।

একদল গেল ইংরেজ শাসন ভাঙ-চুর করতে, ভিত উপড়ে ফেলতে, অন্যদল ছুটলো ক্যান্টনমেন্টে।

মৌলভী আহমদ আলি শাহ মুক্ত হলেন।

ফৈজাবাদের সেপাইরা তখন ফিরিঙ্গি হত্যায় মেতেছে।

নিরস্ত্র নরনারীকে হত্যা করায় মৌলভীর ঘোর আপত্তি। সৈনিককে বীরধর্ম

সৈনিকধর্ম রক্ষা করতেই হবে। নিরস্ত্র নরনারীর রক্তে তরবারি কলুষিত করা অধর্ম।

আহম্মদ আলি শাহ ছুটে গেলেন অবাধ হত্যালীলা থামাতে। আশ্রয় দিলেন অভয় দিলেন যারা বেঁচে ছিল তাদের।

ক্যান্টনমেন্টের ভেতব থেকে কর্ণেল লেনক্সকে খুঁজে বের করে তাকে বিদ্রোহীদের হাত থেকেবাঁচালেন।

কর্ণেল সাহেব বিশ্বাস কবতে পারেন না তিনি বেঁচে আছেন। বেঁচে যাবেন।

কর্ণেল সাহেবের •মতো মুচকি হেসে বললেন, হুকো উপহার দেবার কথা আমি ভুলিনি কর্ণেল সাহেব!

এবার মৌলভী সাহেব তার দলবল নিয়ে লক্ষ্ণৌর দিকে এগোলেন।

সে মাসের প্রথমদিকে লক্ষ্ণৌ শান্ত। জনজীবন শান্ত। স্তিমিত স্রোতে প্রবহমান।

একমাসেব মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী সেপাইরা মারদাঙ্গা করে ইংরেজ শাসন ঘোচাতে তৎপর হযে উঠলো আর দশ-বারো দিনের মধ্যে সে চেষ্টায় তারা সফলও হল। বলতে গেলে অযোধ্যায় ইংরেজ প্রশাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে এগিযে এলেন বেগম হজরত মহল বেগম। বেগমের একমাত্র ছেলে ব্রিজিস কাদেরকে মুহুর্মুহু কামান গর্জনের মধ্যে তার বাবার পরিত্যক্ত সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল।

অযোধ্যা থেকে ইউনিয়ন জ্যাক টেনে নামিয়ে সেখানে আবার অযোধ্যার নবাবেব পতাকা ওড়ানো হলো।

সরফ-উদ-দৌলা হলেন প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু-মুসলমান উভয়কে রাজ্যপ্রশাসনে সমান অংশীদার করা হল। সমস্ত ক্ষমতায লাগাম রইলো হজরত মহল বেগমের হাতে।

ব্রিজিস কাদেরকে নবাব করা হয়েছে এবং একটা স্থিতিশীল প্রশাসন সেখানে চালু হয়েছে। সুতরাং বিদ্রোহী সেপাইরা সেখানে গিয়ে সেই দেশীয় রাজশক্তির পতাকার তলে সমবেত হয়ে লড়াই করার জন্যে তৈরী হতে লাগলো।

অযোধ্যার বেগম ছিলেন রূপসী। শোনা যায়, আগে নাচ-গান ছিল তার পেশা। তাকে দেখে নবাব ওয়াজেদ আলি মুগ্ধ হলেন। ডেকে পাঠালেন তাকে। বললেন, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। নাচ-গান ছেড়ে অন্দরে থাকো। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।

হজরত মহল অন্দরে রয়ে গেলেন।

যাযাবর জীবনের পেশায় তার ক্লান্তি এসে গেছিল। ভালোবাসার পুষ্পসজ্জায় নারীত্ব বিকশিত হয়ে উঠলো। এই অনাস্বাদিত পূর্ব জীবনের স্বাদ-গন্ধ আলুলায়িত পল্লবে তার মনের 'ফোয়াফুলের মেলা' এনে দিল।

ওয়াজেদ আলির ভালোবাসা তাকে পৃথিবীর গর্বিতা রমণীদের একজন করে তুললেন। সময় লাগলো না তার এই প্রাচীন অভিজাত পরিবারের অনুশীলিত জীবনচর্চাকে আয়ত্ত করতে।

ভালোবাসার ফুল একদিন ফল হয়ে উঠলো।

একদিন ভালোবাসার বুকের তলায় শুয়ে হজরত মহল বললেন, হজরত, আমাকে ছেড়ে দিন —।

কেন? অবাক হলেন নবাব। একথা বলছো কেন পিয়ারি?

কেন! বিষণ্ণ হাসলেন হরজতমহল বেগম।

সত্যি বলছি কেন বলো তো? আমাকে কি তোমার আর ভালো লাগছে না?

চোখদুটো বন্ধ করে গভীর অনুরাগে নবাবকে জড়িয়ে হজরত মহল বললেন, আপনাকে ছেড়ে বেহেস্তে গিয়েও সুখ পাবো না হজরত!

তবে? এবার হাসলেন নবাব বাহাদুর।

আপনার ছেলের চোখের সামনে আপনার রক্ষিতা থাকবো সে আমার সহ্য হবে না। সে অপমানের চেয়ে মৃত্যুও ভালো। তার চেয়ে দূরে গিয়ে থাকবো।

ওয়াজেদ আলি শাহ তখন হজরত মহলের প্রেমে মৌমাছির মতো বাঁধা পড়ে গেছেন, তাহলে তুমি কি করতে বলো?

আমাকে বিবাহিতা নারীর মর্যাদা দিন।

তাই হবে। আর্জি মঞ্জুর করলেন ওয়াজেদ আলি শাহ। বিয়ে হল হজরত মহলের। বেগমের মর্যাদা পেলেন। নিজের মহলে গিয়ে উঠলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল. এ বড়ো সামান্য নারী নয়। একটু-একটু করে নবাবের অনেক ক্ষমতা নিজের মুঠোয় টেনে নিলেন।

তারপর একদিন কোম্পানী-বাহাদুরের গোঁসার ফলে রাজ্যপাট হারালেন নবাব। কোম্পানী শুধু রাজ্যপাট কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল না। নবাবকে রাজ্য-সীমার বাইরে সুদূর বাংলাদেশে পাঠালেন। জায়গাটা হল কলকাতা। কোম্পানী-ভারতের রাজধানী। নবাবকে সব সময় চোখের ওপর রাখা যাবে। বেচাল দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে কোতল।

যাবার জন্যে তৈরি হলেন নবাব। বেগমরা সঙ্গে যাবার জন্যে পোষাক-আষাক আর মঞ্জুষা ভর্তি সোনা-পান্না-হীরে-জহরত সাজিয়ে তৈরি হলেন।

তুমি যাচ্ছ না! হজরত মহলকে প্রশ্ন করেন নবাব।

না। স্থির উত্তর বেগমের।

তুমি এখানে থাকবে কি করে?

কেন, আমি আর আমার ছেলে ব্রিজিস কাদের থাকবো।

তাতে লাভ?

খোদাবন্দ আপনি যতো সহজে অযোধ্যা ছেড়ে দিলেন আমি পারতাম না। আমাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে যদি কোনদিন সুযোগ আসে ইংরেজের হাত থেকে অযোধ্যা ছিনিয়ে নেব।

বিমূঢ় ও সন্ত্রস্ত চোখে তাকালেন নবাব।

ওয়াজেদ আলি শাহ অন্যান্য বেগম ও নবাবজাদাদের নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিলেন, আর সেখানে পাখি উড়িয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে ও চিড়িয়াখানা বানিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। রাত কাটে মাইফেল বসিয়ে হুরি-পরিদের নাচ দেখে আর গান শুনে।

অযোধ্যার প্রাসাদে তখন সুযোগ-সন্ধানে হজরত মহল বেগম ইংরেজের চোখের আড়ালে কোম্পানীকে ঘায়েল করবার নিত্য-নূতন ফিকির বুনে চলেছেন। গোপনে প্রাক্তন তালুকদার-ফৌজদার-জমিদারদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলছেন তার একমাত্র লক্ষ্য অযোধ্যা থেকে ইংরেজ শাসন ছুঁড়ে ফেলে ছেলে ব্রিজিশ কাদেরকে তখ্‌তে বসানো।

হাওয়া একটু করে ঘুরতে লাগলো। মে মাসের শেষের দিকে বিদ্রোহের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

আর মাস খানেকের মধ্যে চারদিক গুছিয়ে ১৮৫৭র ৭ জুলাই ব্রিজিস কাদেরকে তখতে অভিষিক্ত করা হল।

অযোধ্যার আর সব জায়গা থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত হয়ে গেলেও প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের পায়ের তলায় চাপা পড়ে রইলো!

লক্ষ্ণৌয়ে ব্রিটিশ-শাসনের প্রধান হেনরি লরেন্স ২৯ জুন নাগাদ খবর পেলেন বিদ্রোহীদের বিশাল এক বাহিনী লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হচ্ছে! এত তাড়াতাড়ি তারা

এগোচ্ছিল যে লরেন্স রাত-ভোর জোগাড়-যন্তর করে ভোর-রাতে বেরিয়ে পড়লেন !

বেশি দূর তাকে যেতে হল না মাত্তর মাইল দশেক দূরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেখা হল। জায়গাটার নাম চিনাটা, লক্ষ্ণৌ শহরের উত্তর-পুবে।

মুখোমুখি হতেই লরেন্স কামান পাতলেন। দারুণ গোলাবর্ষণ সুরু হল। বিদ্রোহীরাও কম পাত্তর নয়। তারাও কামানের গোলা দিয়েই উত্তর দিল।

শুধু গোলা বর্ষণ করেই বিদ্রোহীরা শান্ত রইলো না দৃঢ় পদ-ক্ষেপে শত্রুপক্ষের গোলা গুলি অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে এগোতে লাগলো।

ব্রিটিশ অশ্বারোহী বাহিনী ইতিমধ্যে শত্রুর ব্যূহের মধ্যে ঢুকে যখন তাদের একপাশ প্রায় তচনচ করে দিতে সুরু করেছে। সেই সময় ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় গোলন্দাজরা কামান ছেড়ে সরে গেল আর ভারতীয় অশ্বারোহীরা দল ছেড়ে পালাতে লাগলো তখন বোঝা গেল যুদ্ধে জয় পরাজয় নিশ্চিত হয়ে আসছে।

উপায়ান্তর না দেখে লরেন্স যুদ্ধ থামিয়ে পিছনে হঠে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিদ্রোহীদের সংখ্যা এত বেশি যে তারা গোরা মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং পলায়নপর ব্রিটিশ সেনাদের শৃঙ্খলা আর রইলো না। যে আগে পালিয়ে জান বাঁচাতে পারে সেই চেষ্টাই করতে লাগলো।

এই সব ডামাডোলের মধ্যে বিদ্রোহীরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে লক্ষ্ণৌতে ঢোকার সেতুটা দখল করে নিল। ছোট নদী। ছোট সেতু। পারাপারের পরিসর সঙ্কীর্ণ। সুতরাং আগে থেকে দখল নিলে যেই-লোক তারপক্ষে এক পার থেকে অন্য পারে যাওয়া কঠিন। হলও তাই।

পড়ি-মরি করে ইংরেজ সোয়ার আর পদাতিক সেতুর সামনে এসে দেখে বিদ্রোহীরা সেতু মুখ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

পালিয়ে-আসা ইংরেজ সৈন্যরা বুঝতে পারছিল দাঁড়াবার সময় নেই। যা করবার এখুনি করা দরকার। যারা তাড়া করে আসছে এখুনি এসে পড়বে। সামনে পেছনে দুদিকের আক্রমণে কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল মরিয়া হয়ে ঝাপিয়ে পড়া যাক—যারা বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ভেঙে বের হতে পারবে তারা বাঁচবে।

একদল মরিয়া ইংরেজ খোলা তরবারি পাগলের মতো ঘোরাতে-ঘোরাতে বিদ্রোহীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। মৃত্যু যারা নিশ্চিত জানে মৃত্যুতে তাদের আর ভয় থাকে না। সেই মৃত্যুভয়হীন সাহসের সামনে বিদ্রোহীদের সামর্থ্য যেন

উবে গেল। আর হেনরি লরেন্স তার দলবলের কিছু অংশ নিয়ে দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এলেন।

যারা বেরুতে পারলো তারা ধুকতে-ধুকতে রেসিডেন্সীতে এসে হাজির হল।

এ ব্যাপারটা ঘটলো সকালে আর বিদ্রোহীরা সেই দিন দুপুরের পর-পরই রেসি-ডেন্সী অবরোধ করে বসলো।

সুরু হল ভারতবিখ্যাত লক্ষ্ণৌ অবরোধ।

রেসিডেন্সীতে যারা আশ্রয় নিল, ব্রিটিশ সৈন্য, সিভিলিয়ান, অনুগত ভারতীয় সৈন্য নারী-শিশু সব মিলিয়ে সতেরোশ'র বেশি কিছুতেই হবে না।

সুরু হল এক ভয়ঙ্কর অসম অবরোধ।

একদিকে ক্রম বর্ধমান সৈন্যের হানাদারি অন্যদিকে মাটির দেয়ালে ঘেরা বাড়ির মধ্যে নারী-শিশু সহ সৈন্য যাদের সংখ্যা হাজার খানেকের বেশি হবে।

কী অসমসাহসে তারা প্রথম দিকে ছ'হাজার শিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যের হানাদারি ঠেকিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললো। ছ'হাজার ষাট হাজার হতে বেশি সময় লাগে নি কিন্তু লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে আটকে-পড়া মানুষগুলো এক সঙ্গে ক্ষুধা-অনটন ও শত্রুর সঙ্গে সমান ভাবে লড়ে গেল সাতাশি দিন ধরে।

এযেন সুন্দরবনের ম্যান-ইটাবের সঙ্গে যেনি বেড়ালের লড়াই।

অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ অবরোধ সুরু হতে বেগম হজরত লক্ষ্ণৌ এসে উঠলেন। রোহিলাখণ্ড থেকে এলেন মৌলভী আহমদ আলি শাহ।

বেগম সাহেবা ছিলেন অবরোধকারীদের প্রেরণা।

লক্ষ্ণৌ ছিল কানপুর ও দিল্লির মতো বিদ্রোহীদের অগ্নিপরীক্ষা।

আহমদ আলি শাহ এসে বেগম সাহেবার সমস্ত প্রচেষ্টাকে আরো নিবিড় ঐক্যে বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বহুদল বহু নায়ক এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ঐক্যবদ্ধ হতে না-পারলে সিদ্ধি আসে না। সেই ঐক্যের ভিতে তিনি পাথর জোগাতে লাগলেন।

কিন্তু নানা জায়গা থেকে আসা নানা শ্রেণীর সেপাইরা লড়াই করতে এসে লক্ষ্ণৌতে জমায়েত হওয়ার ফলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হল।

অযোধ্যার নব নির্বাচিত ওয়ালি ব্রিজিস কাদেরের বিরোধীরা অত্যন্ত গোপনে সংঘবদ্ধ একটা ষড়যন্ত্রের ঘোট পাকাচ্ছিল। সম্ভবত ব্রিজিস কাদেরের চেয়ে অযোধ্যার নবাব বংশে অন্যতম যোগ্য দাবীদার ছিল। যার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সক্রিয় ছিলেন।

বেগম হজরত মহলের সতর্ক নজর এড়াতে পারে নি ব্যাপারটা। যাতে আর বেশি দূর গড়াতে না-পারে সেজন্যে প্রথম চোটেই তিনি চিনাট যুদ্ধের বিজয়ী নায়ক বরহত আহমেদকে সেনাপতির পদ থেকে টেনে নামিয়ে আনলেন।

সম্ভবত এই ব্যাপারে মৌলভী আহমদ আলি শাহ কোন ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এবং বেশ কয়েকদিন ধরে বেগমের ঘরে তার রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়।

অযোধ্যায় বসে কারো বিরুদ্ধতা সহ্য করবার মতো নারী হজরত মহল বেগম নন।

অন্যপক্ষে কারো অন্যায় সহ্য করবার বান্দা আহমদ আলি শাহ নন।

সুতরাং কথার যুদ্ধ সশস্ত্র সংঘর্ষের আকার নিল। বেগমও ছাড়বার পাত্র নন তিনি তার সৈন্যদের আহমদ আলি শাহ ও তার অনুচরদের উপর লেলিয়ে দিলেন। বেগম সাহেবার এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য মৌলভী প্রস্তুত ছিলেন না। তবু তীব্র প্রতিরোধ যে তার পক্ষ থেকে করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধের ফলাফল দেখে। এই সংঘর্ষে দুপক্ষের একশ' জন অনুচর নিহত হয়। স্বয়ং মৌলভীকে বন্দী করা হল।

অবস্থার হের-ফেরে মৌলভীকে বন্দীদশা মেনে নিতে হল। অবাক হয়ে ভাবলেন, দেশ ও জাতি যখন দারুণ সঙ্কটে—সবাই শত্রুর মুখোমুখি হাতিয়ার হাতে দাঁড়িয়ে সেই সময় তাকে বন্দী হতে হল দেশের মানুষের হাতে!

মৌলভীর শুভানুধ্যায়ী যারা ছিল তারা বেগমের কাছে গিয়ে আবেদন করলেন, বেগম সাহেবা কাজটা তো ভালো হল না। এই সময় মৌলভী সাহেবকে আটকে রাখলে আমরা 'কম-জোরি' হয়ে যাব। মৌলভী সাহেব আমাদের সঙ্গে থাকলেও আমরা তাগৎ পাই। হয়তো কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ব্যক্তি গত স্বার্থের জন্যে তো তিনি পথে নামেন নি। তাকে ছেড়ে দিলে হিন্দুস্থানের মানুষ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

হয়তো বেগমের রাগ পড়ে এসেছিল হয়তো তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন তাই দেরি না করে মৌলভী সাহেবকে সসম্মানে মুক্ত করে দিলেন।

আহমদ আলি শাহ আবার গৌরবের সঙ্গে অধিনায়কত্বে বৃত হলেন।

দেশের মঙ্গলকে যিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন মানুষের দেওয়া দুঃখ-বেদনা-লাঞ্ছনা সহ্য করবার ক্ষমতা খোদাতালাই তাকে দেন!

মুক্ত হয়ে আহমদ আলি শাহ আবার নিজের কাজে লেগে গেলেন।

এতদিনে লক্ষ্ণৌর যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক চেহারা নিয়েছে।

লক্ষ্ণৌর যুদ্ধ ইতিমধ্যে ভীষণ আকার ধারণ করেছে।

লক্ষ্ণৌ দখল করবার জন্যে ইংরেজদের—জেনারেল, মেজর জেনারেল, কর্ণেল ক্যাপ্টেন তাদের দলবল নিয়ে লক্ষ্ণৌ এসে হাজির হচ্ছেন। তাদের মাথায় আছেন কলিন ক্যাম্বেল। তার সঙ্গে আছেন হ্যাভেলক—আউট্রাম—নীলের মতো বাঘা-বাঘা সব সেনাপতি। কামান বন্দুক কত যে এলো তার তো লেখা জোকা নেই!

অন্যদিকে অযোধ্যার বেগমের আবেদনে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বড়ো-বড়ো রাজা জমিদারের দল তাদের সৈন্য সাজিয়ে লক্ষ্ণৌ এসে উঠেছেন।

দেবী বক্স সিং এসেছেন ধুরুয়া থেকে, গোরখপুর থেকে নাজিম মুহাম্মদ হাসান, উদিতনারায়ণ ও মধুপ্রসাদ এলেন বীরপুর থেকে সুলতানপুরের মেহেন্দি হাসান, শঙ্করপুরের বেনীমাধো বক্স। আরো ছোটখাটো রাজপুত জমিদার তাদের সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে লক্ষ্ণৌ এসে হাজির হয়েছেন কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

এছাড়া ফিরুজ শাহ, মীর আতিশ মহম্মদ বখ্‌ত খান ও ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ আলি শাহ তো আছেন।

লক্ষ্ণৌর যুদ্ধ জোর কদমে চলেছে।

বিদ্রোহীদের কামানের গোলা রেসিডেন্সীর মধ্যে আটকে পড়া মানুষদের ভেঙে-চুরে ফেলতে চাইছে।

পারছে না। সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষের অদম্য শক্তি-সাহস ও অনমনীয় মানসিক শক্তির কাছে কামানের গোলা হার মানছে।

বিদ্রোহীরা রেসিডেন্সীর আশপাশের বাড়ি-ঘর-জানালা ও ছাদের ওপর থেকে রেসিডেন্সীর ভিতরে মানুষের মাথা দেখা গেলেই বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্যে ধরাশায়ী করবার ফিকিরে আছে। দিনে-রাতে তাদের এ চেষ্টার বিরতি নেই। তাদের এই চেষ্টায় প্রথম সপ্তাহের সাফল্য পনেরো থেকে বিশ জনের মৃত্যু।

এমন কি হেনরি লরেন্সও কামানের গোলায় আহত হয়ে দুদিন পরে মারা গেলেন।

বিদ্রোহীরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে বার দুই-তিন রেসিডেন্সীর দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেছিল। কিন্তু অবরোধে অন্তরীণ মানুষদের নির্মম পালটা আক্রমণ তাদের ফিরিয়ে দিল।

লক্ষ্ণৌ অবরোধ চললো।

শাহগঞ্জের রাজা মানসিংহ মানী ব্যক্তি। তার এলাকায় ধনে-জনে-মানে তার শ্রেষ্ঠত্ব অসংবাদিত। বিদ্রোহের প্রথম দিকে হেনরি লরেন্সের আবেদনে তিনি ব্রিটিশ

আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন এলাকা থেকে পলাতক ইংরেজ নারী-শিশু ও অন্যান্যদের আশ্রয় দিয়ে বিদ্রোহীদের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

চারদিকে সেপাইদের হালচাল দেখে তার মনে হল, এবার সত্যি বুঝি কোম্পানী শাহীর ভিত নড়লো। ছোটভাইকে তার ব্যক্তিগত দূত করে নানা সাহেবের কাছে পাঠালেন সলা-পরামর্শের জন্যে আর নিজের এলাকায় লোকজন জোগাড় করে বাহিনীকে মজবুত করতে লেগে গেলেন।

তবু তার মনের ভয় যায় না। কী জানি যদি কোম্পানী জিতে যায়! তাহলে যারা কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করবে কোম্পানী তাদের ছেড়ে কথা কইবে না। রাজ্যপাট যা আছে সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে, চাই-কি ফাঁসিতেও ঝোলাতে পারে।

মান সিং তাই নিজের মনের ইচ্ছে সম্পূর্ণ গোপন রেখে ইংরেজদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

জুন-জুলাই-আগষ্ট তিনমাস ধরে লক্ষ্ণৌ অবরোধ চলেছে। এরমধ্যে মানসিংহ যেমন বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিলেন না অন্যদিকে তেমনি কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললেন।

তবে তার কড়া নজর রইলো লক্ষ্ণৌর ঘটনা প্রবাহের দিকে। জয়-পরাজয় দুপক্ষেই তখনো অনিশ্চিত।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মানসিংহ তার বিশাল বাহিনী নিয়ে লক্ষ্ণৌর উপকণ্ঠে এসে তাঁবু ফেললেন।

রেসিডেন্সীর ভিতরে-বাইরে কোম্পানীর সবাই আশা নিরাশায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন। কী জানি যদি মানসিংহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন তবে রেসিডেন্সীতে অবরুদ্ধ মানুষগুলো কোন হিম্মতের জোরে নিজেদের আর বাঁচাতে পারবে না। অন্যদিকে মানসিংহ যদি কোম্পানীর দিকে এসে দাঁড়ান তাহলে লক্ষ্ণৌ থেকে অবাধ্য বিদ্রোহীদের মেরে হটিয়ে দেওয়া কঠিন হবে না।

মানসিংহ কিন্তু কোন দিকেই ঝুকলেন না। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বসলেন। তবে দুপক্ষের সঙ্গে তার সৌহার্দ সমান ভাবে বজায় রাখলেন।

আসলে মানসিংহ অপেক্ষা করছিলেন, জয় পরাজয় কোন দিকে যায় সেটুকু দেখার জন্যে।

ইতিমধ্যে হ্যাভেলক ছুটে এলেন লক্ষ্ণৌকে উদ্ধার করার জন্যে কামান-বন্দুক-ঘোড়সোয়ার সাজিয়ে। তার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন মানসিংহ ধরে নিলেন, এতোবড় জাঁদরেল সেনাপতি যদি বিদ্রোহীদের কাবু করতে না-পারে তবে

বোধ হয় বিদ্রোহীরা টিকে যাবে। যদি পস্তাতে না হয় তবে দেরি না করে আগেভাগে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াই ভালো। তবে তার আখেরে ভালো ইনাম জুটতে পাবে।

সেপ্টেম্বর মাসে মানসিংহ তার দলবল নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

বিদ্রোহীরা ইংরেজদের মোকাবিলার জন্যে লক্ষ্ণৌয়ের এক-একটা অংশের দায়িত্ব বিভিন্ন নেতার ওপর দিয়েছিল।

আহমদ আলি শাহের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল আলমবাস থেকে ব্রিগেডিয়ার আউট্রামের ওপর আক্রমণ পরিচালনার। বারবার চেষ্টা করেও মৌলভী যখন আউট্রামকে হঠাতে ব্যর্থ হলেন তখন তার ওপর বিদ্রূপ ও কটূক্তি বর্ষিত হতে লাগলো।

অথচ সব দোষ যে তার তাতো নয়। তার পক্ষে যতোখানি নিখুঁত পরিকল্পনা সম্ভব তিনি করে ছিলেন। দুর্ভাগ্য তার পক্ষে, তিনিও তার বাহিনী সাহস ও বীরত্ব দিয়ে সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অন্য যারা সংশ্লিষ্ট ছিল তারা কেউ যথোচিত গুরুত্ব দেয় নি ফলে তার সব চেষ্টা ভেস্তে গেছিল।

এই সময় মানসিংহ তার দলবল নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এসে মিশলেন। বিদ্রোহীদের শিবিরে-শিবিরে সাড়া পড়ে গেল। সিপাইদের উল্লাসধ্বনি নবাবের পতাকা ছুঁয়ে ঝাকে-ঝাকে পায়রার মতো আকাশে উড়ে গেল।

রোহিলাখণ্ডের সেনাদের নায়কত্ব থেকে আহমদ আলি শাহকে সরিয়ে মানসিংহকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল।

মৌলভী আহমদ আলি শাহ একটি কথা না-বলে দায়িত্ব ছেড়ে সরে এলেন। আসলে তার লড়াই তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থেকে জাত হয় নি। এ সত্যিকারের দেশ প্রেমিকের মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই। তার প্রত্যাশা, শুধু স্বাধীনতা। ধন নয় মান নয়।'

ইতিমধ্যে কলিন ক্যাম্বেল বিশাল এক বাহিনী নিয়ে লক্ষ্ণৌ অবরোধকারীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। সে আক্রমণের চোট বিদ্রোহীরা সামলাতে না-পেরে বিদ্রোহীরা ছত্রোভঙ্গ হয়ে গেল।

রেসিডেন্সী মুক্ত হল। অযোধ্যায় বিদ্রোহ তচনচ হয়ে গেল। বিদ্রোহী নায়কেরা নিজের সুবিধে মতো এক-একদিকে সরে গেলেন।

সহজে সরতে পারলেন না মৌলভী। এই লক্ষ্ণৌকে ঘিরে তার আকাঙ্খার কতো ফুল ধরেছিল। ফল ধরতে পারলো না। ইংরেজের পতাকা নামিয়ে নবাবের পতাকা তোলা হয়েছিল। চোখের সামনে সেই পতাকা নামিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা হল।

তখনো বেপরোয়া সাহসে বুক বেঁধে আহমদ আলি শাহ একাই সেই মৃত ও বিধ্বস্ত লক্ষ্ণৌর বুকের ওপর ঘুরে-ঘুরে দলছুট সেনাদের জুটিয়ে নিতে লাগলেন নিজের দলে।

তারপর একদিন মৌলভী তার দলবল নিয়ে রোহিলাখণ্ডের দিকে সরে এলেন।

মৌলভীর চোখ পড়লো শাজাহানপুরের দিকে। সামরিক দক্ষতা তার ছিল না বটে তবে চোখ দুটো ছিল বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ। সেই চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে নজর ফেলে তার মনে হল শাজাহানপুর কোম্পানীর সব চেয়ে দুর্বল এলাকা। সামান্য কিছু সৈন্য সেখানে মোতায়েন আছে। একটা ধাক্কা দিলেই ব্রিটিশ শাসন উলটে যাবে।

তবু আরেকটু সময় নিয়ে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে লাগলেন আহমদ আলি শাহ।

ইতিমধ্যে স্যার কলিন ক্যাম্বেল বেরেলি উদ্ধারের জন্যে যাত্রা করেছেন। বাধা পেলেন বেরেলির শাসনকর্তা খান বাহাদুর খানের বাহিনীর কাছে। তুমুল যুদ্ধ হল। প্রথমবারে খান বাহাদুর খানের বাহিনী কলিন ক্যাম্বেলকে হটিয়ে দিল। আবার তোড়জোড় করে আক্রমণ চালালেন কলিন ক্যাম্বেল এবার হঠাৎ হল খান বাহাদুর খানের বাহিনীকে—কলিন ক্যাম্বেল তাদের ঠেলে নিয়ে গিয়ে কোনঠাসা করে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলেন।
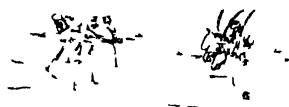
১৮৫৮র ০ মে পরাজিত খান বাহাদুর খান তার দলবল নিয়ে রোহিলাখণ্ডের রাজধানী ছেড়ে গেলেন। আর ব্রিটিশ বাহিনী এসে বেরেলির দখল নিল। কোম্পানীর শিবিরে ধুম পড়ে গেল আনন্দের। খান বাহাদুর খান বিদ্রোহীদের জবরদস্ত খুঁটি ছিলেন। এলাকার মধ্যে তার সেনাদলে সৈন্যের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি সেই সেনাদলকে বিধ্বস্ত করায় ভারি খুশী মেজাজে ছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। জয় যখন মুঠোর মধ্যে তখন একটু ঢিলে দিলে ক্ষতি কি! জয় তো অনেক হয়েছে—দিল্লি আর লক্ষ্ণৌ আবার দখল করার কথা তো আগে ভাবাই যায় নি।

মৌলভী এবার দ্রুত পায়ে এগোলেন শাজাহানপুরের দিকে। নিশুত রাতের অন্ধকারে তারা একেবারে শাজাহানপুরের গায়ে এসে থামলেন। জায়গাটা শাজাহানপুর থেকে মাত্র চার মাইল দূরে।

কোম্পানীর গুপ্তচর মোতায়েন ছিল। সে রাত দুপুরে এত লোকজনের আনাগোনা দেখে ভড়কে গেল। গাছপালার আড়াল থেকে সরেজমিনে ব্যাপারটা দেখে-শুনে বুঝে

নিল, এ কোনও বাগী সেপাইদের দল। কোম্পানীর ওপর হামলা করতে এসেছে। দেরি না-করে সে ছুটলো কোম্পানী বাহাদুরের মিলিটারি দপ্তরে খবর পৌছে দিতে।

মৌলভী যদি চার মাইল দূরে না-থেমে সোজাসুজি এসে শাজাহানপুরের ওপর হামলে পড়তেন তা হলে যা ঘটতো ব্যাপারটা তার প্রায় উলটো হল।

সৈন্যরা রাত্রে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে তাঁবু ফেলে শুয়েছিল খবর পাওয়া মাত্র তাঁবু গুটিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ঢুকে গেল! তারপর তারা ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষিত অভ্যন্তরে বসে কামান সাজিয়ে শত্রুকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মৌলভী এসে পুরনো শহর দুর্গ এবং শহরতলি দখল করে নিলেন। তারপর শহরের ধনীদের ওপর মোটা হারে কর ধার্য করলেন।

ইতিমধ্যে আটটা কামান এসে হাজির হল আর কামানের মুখগুলো ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষিত এলাকার দিক ফিরিয়ে গোলাবর্ষণ করে চললেন।

শাজাহানপুরে স্যার কলিন ক্যাম্বেলের কাছে খবর পৌছল—সেই খবর শুনে তিনি তো থ মেরে গেলেন। তার মনে হল, আউট অব্ ইভিল অফেন্ কামেথ গুড্। মৌলভী একবার হাত ফসকে সরে গেছেন। তাকে যে এতো শিগ্‌গির কাছে পাওয়া যাবে তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি।

স্যার কলিন ক্যাম্বেল তার শিকারের ওপর ঝাপিয়ে পড়বার তোড়জোড় করতে লেগে গেলেন।

প্রথমে সবগুলো পথ আটকালেন। পালাবার ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে কলিন ক্যাম্বেল মৌলভীকে জালে ফেলবার জন্যে এগোলেন।

এদিকে আহমদ আলি শাজাহানপুর অবরোধ করে সমানে কামান দেগে চলেছেন। নিরুপায় ব্রিটিশ সৈন্য সেনাছাউনীর মধ্যে জবুথবু হয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগলো। অবশ্য এর মধ্যে ক্যান্টনমেন্টের সেনাদের সাহায্য করবার জন্যে ব্রিগেডিয়ার জোনস্ রুড়কী থেকে শাজাহানপুরে এসে হাজির হলেন। মৌলভী আহমদ আলি শাহ এমন ভাবে বূ্যহ রচনা করেছিলেন যে ব্রিগেডিয়ার জোনস্ বিনা আয়েসে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে গেলেন। যেই ব্রিগেডিয়ার সাহেব ভিতরে ঢুকলেন আহমদ আলি শাহ অমনি বূ্যহের মুখ বন্ধ করে দিলেন।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব পড়ে গেলেন মুশকিলে—বেরিয়ে যে মৌলভীর মহড়া নেবেন তার উপায় রইলো না। মৌলভীর কামানগুলো অনবরত গোলা দেগে ক্যান্টনমেন্টের সেনাদের পংগু করে রাখলো।

কলিন ক্যাম্বেল শত্রুর পথ আটকে তড়িঘড়ি এগোলেন।

জাঁতাকলে পড়ে গেলেন মৌলভী। কলিন ক্যাম্বেলকে এগোতে দেখে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে গিয়ে দেখেন চারদিকে কোম্পানী ফৌজের কঠিন পাহারা। মাছি গলবার উপায় নেই। ভারি মুশকিলে পড়ে গেলেন আহমদ আলি শাহ।

এ খবর বিদ্রোহী মহলে ছড়িয়ে গেল—এবার বোধ হয় মৌলভী ধরা পড়ে গেলেন। তাকে আর বাঁচানো গেল না।

এই অবস্থায় এগিয়ে এলেন দিল্লির রাজপুত্র ফিরুজশাহ, অযোধ্যার হজরত মহল বেগম আর মোহাম্মদির রাজা মৈন সাহিব।

তিনটি বাহিনীর মিলিত শক্তি ইংরেজ পাহারাদারি উড়িয়ে দিয়ে কলিন ক্যাম্বেলের বেড়া-জালের ভেতর থেকে আহমদ আলি শাহকে বার করে নিয়ে এলো।

শাজাহানপুর থেকে বেরিয়ে আহমদ আলি শাহ সরে গেলেন অযোধ্যার দিকে-তার মানে অযোধ্যায় তার পুনঃপ্রবেশ ঘটলো। এই সেই-অযোধ্যা যা ইংরেজকে প্রচুর রক্ত ঝরিয়ে তবে দখল নিতে হয়েছিল।

আর এর চেয়ে মজার ব্যাপার হল, কলিন ক্যাম্বেল অযোধ্যা দখল করলেন। মৌলভী সরে গিয়ে রোহিলাখণ্ডে দখলদারী কায়েম করলেন, আবার কলিন ক্যাম্বেল যেই মৌলভীর কাছ থেকে রোহিলাখণ্ড ছিনিয়ে নিলেন মৌলভী নিজের অধিকার কায়েম করে অযোধ্যার ঘাড়ের ওপর চেপে বসলেন। শুধু তাই নয় এবার মৌলভী শীলমোহরে, নিজেকে খালিফুল-উল্লাহ বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও প্রচার করলেন, যে তিনি হিন্দুস্থানের বাদশা। ইংরেজ নয়।

মৌলভী আহমদ আলি শাহ ঝড় তুলতে চাইলেন অযোধ্যায়। তার আগুন-ঝরানো সর্বনাশা বাণী অযোধ্যাবাসীর মনে নতুন প্রেরণা এনে দিল। নতুন এক সংগ্রামের, জন্যে তারা বুঝি উৎসুক হয়ে উঠলো।

মৌলভী যে-ভাবে ইংরেজ প্রশাসনের বুকের ওপর বসে তার দাড়ি ওপড়াতে লাগলেন তাতে কর্তৃপক্ষের আর চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তারা আর স্থির থাকতে না পেরে মৌলভী সাহেবের মাথার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন।

তাকে বন্দী করবার সমস্ত রকম সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। মৌলভী সাহেব যথাপূর্ব রাজ্য জুড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন। সরকারের পাহারা প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে পিছলে সরে গিয়ে তারা কাজ করে যেতে লাগলেন।

এই সময় মৌলভীর মনে হল পাওয়েনের রাজাবাহাদুরের সাহায্য পেলে হয়তো এ কাজে অনেকখানি সাফল্য পাওয়া যাবে।

সুতরাং হজরত মহল বেগমের সীলমোহর দিয়ে পাওয়েনের রাজাকে একটা চিঠি লিখলেন, বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনি যদি আপনার সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন তামাম মুলুকের আদমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। দেশের এই দারুন দুঃখময় দিনে আপনাদের মতো প্রধান-পুরুষেরা যদি সহায় হয় তবে অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতার নতুন এক সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করবো।

পাওয়েন জায়গাটা অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের সীমানায় ছোট্ট একটা দুর্গ। শাজাহানপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে।

মৌলভীর চিঠি পেয়ে রাজামশাই তাকে দেখা করবার জন্যে নেমন্তন্ন করলেন।

চিঠির বয়ান পড়ে মনে হল, রাজামশাই তাকে সাহায্য করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন। মৌলভীর সঙ্গে দেখা হলে প্রাথমিক আলোচনাটুকু সেরে নিয়ে তাকে যথাযথ সাহায্য করবেন।

সুতরাং আর দেরি না করে মৌলভী আহমদ আলি শাহ রাজকীয় সমারোহে হাতিতে চড়ে পাওয়েন যাত্রা করলেন। মৌলভী মোহামদি রোড ধরে যাবার সময় মোহামদি দুর্গ ধ্বংস করে দিলেন। তারপর পালিতে গিয়ে হানা দিলেন। পালি তচনচ করে ঝড়ের বেগে পাওয়েনের দিকে এগোলেন।

মৌলভী আশা করেছিলেন, পাওয়েনে তাদের জন্যে সাদর সম্বর্ধনা অপেক্ষা করছে।

পাওয়েন উপস্থিত হয়ে মৌলভী আশ্চর্য হয়ে গেলেন দুর্গ শহরের সমস্ত দরজা বন্ধ। পাঁচিলের ওপর সশস্ত্র প্রহরী হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। আরো আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সেই সব সশস্ত্র প্রহরীদের মধ্যে পাওয়েনের রাজা জগন্নাথ সিং দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে তার ভাই। দুজনের হাতেই অস্ত্র।

এ যে কি ধরনের অভ্যর্থনা মৌলভীর বুঝে নিতে দেরি হল না। এই ভীরু ও বিশ্বাসঘাতক রাজা তাকে কৌশলে বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে।

তবু মৌলভী দেশের নামে দেশের মানুষের নামে রাজার কাছে বারবার আবেদন করতে লাগলেন, কেল্লার দরজা খুলুন। আমি আপনার দেশের মানুষ শত্রু নই বন্ধু।

মৌলভীর কথায় কান দেবার মতো কেউ সেই কেল্লার ধারে হাজির ছিল না।

এবার মৌলভী তার মাহুতকে নির্দেশ দিলেন, হাতি দিয়ে দরজা ভেঙে ফেল।

শিক্ষিত হাতি মাহুতের নির্দেশে পিছিয়ে এসে মাথা দিয়ে দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করলো।

একবার। দুবার। কয়েকবার আঘাতের পর দুর্গের দরজা ভেঙে পড়ার মতো হল।

রাজা বুঝতে পারলেন, দরজা ভেঙে যদি মৌলভী ঢুকতে পারেন তবে আর রক্ষে নেই।

সেই মুহূর্তে রাজা জগন্নাথ সিংয়ের সশস্ত্র অনুচরেরা দুর্গের পাঁচিলের ওপর থেকে বেপরোয়া এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগলো।

আর এমনি একটা গুলিতে মৌলভী নিহত হলেন।

গুলির তোড়ে মৌলভীর অনুচরেরা সরে যেতে বাধ্য হল।

হাতির হাওদা থেকে মৌলভী গড়িয়ে পড়লেন নিচে।

মৌলভীর মৃতদেহকে রক্ষা করে এমন কেউ কাছাকাছি ছিল না। সুতরাং এই তো সুযোগ।

রাজার ভাই পাঁচিল থেকে নেমে পড়ে তরবারির এককোপে মৌলভীর মুণ্ড কেটে নিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে গেল।

মৌলভী নিহত হওয়ায় তার অনুচরদের মধ্যে ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সুরু হল। তারা পালাতে আরম্ভ করলো।

মৌলভীর মৃত্যুতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের আকাশ থেকে ইন্দ্রপতন হল।

এত বড়ো একজন মহৎ দেশপ্রেমিকের মৃত্যু হল ভীরু নীচ বিশ্বাসঘাতক এক সামান্য রাজার হাতে।

এমনই ভারতের দুর্ভাগ্য।

যার জ্বালাময়ী বাণী মৃত্যুহীন এক সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অপঘাত মৃত্যু তার জীবনের ওপর সহসা পর্দা টেনে দিল।

মৌলভীর বাহিনী নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে হতচকিত হয়ে পাওয়েন ছেড়ে গেলে রাজা মশাই আর তার অনুচর নিয়ে দড়বড়ি ঘোড়া হাঁকিয়ে তেরো মাইল দূরে সবচেয়ে কাছাকাছি যে ইংরেজ শিবির তার দিকে যাত্রা করলেন। মৌলভীর মাথার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকার পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে হবে তো।

শাজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট খেতে বসেছিলেন। কোয়ার্টারের সামনে রাজামশাই হাজির হয়ে খবর পাঠালেন। বাবুর্চি গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দিল, মৌলভী আহমদ আলি শাহকে নিয়ে এসেছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নিজেকে সামলাতে না-পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, What nonsense you are talking!

সান্ত্রীরা তো তাই খবর পাঠালো। সঙ্গে পাওয়েনের রাজাবাহাদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট বুঝে উঠতে পারলেন না সেটা কি করে সম্ভব।

কালও পাওয়েনের রাজার দূত এসে খবর দিয়ে গেছে। রাজাবাহাদুর কোন প্রলোভন ও ভয়ে ইংরেজানুগত্য ত্যাগ করবেন না। একরাতের মধ্যে এমন কি ঘটে

গেল যাতে মৌলভী আর পাওয়েনের রাজাবাহাদুর দুজন এক সঙ্গে এসে হাজির।
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মনে হল, শেষেব সেই ভয়ঙ্কর দিন এসে হাজির হয়েছে!

খাওয়া ঘুচে গেল তার। ন্যাপকিনে হাত মুছে বন্দুকটা টেনে মা মেরীকে স্মরণ করে ঘরের বাইরে পা দিলেন।

রাজাবাহাদুরের এক গাল হাসি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো।

উত্তেজিত ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, মৌলভী কোথায়?

রাজাবাহাদুর তার হাতের কাপড়ের পুটুলি আলগা করে দিলেন আর মৌলভীর কাটামুণ্ড কাপড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে গেল।

চমকে উঠলেন ম্যাজিস্ট্রেট, এই সেই ভয়ঙ্কর মৌলভী। যার জন্যে ব্রিটিশ প্রশাসনের উদ্বেগের অন্ত নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভীর কাটামুণ্ডু কোতোয়ালীতে ঝুলিয়ে দিলেন যাতে সাধারণ মানুষ দেখতে পায়। আর মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাই করে নদীতে ফেলে দেবার নির্দেশ দিলেন।

বোধহয় ভালোই করেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মৌলভী সাহেবের ছাই নদীতে ফেলে দেবার নির্দেশ দিয়ে।

কেননা, দেশকে যে-মানুষ ভালোবাসতেন তার দেহের অণুপরমাণু নদীর জলের সঙ্গে ভেসে গিয়ে দেশের প্রান্তর-জনপদের মাটির সঙ্গে মিশে রইলো।

স্বর্গ আছে কিনা জানি না। স্বর্গ থাকলে মৌলভী আহমদ আলি শাহ-সেখানেই যাবেন। দেহহীন-মৃত্যুহীন আত্মা হয়তো এই ভেবে শান্তি পাবে, দেশের জল-মাটি থেকে গড়া তার নশ্বর দেহ দেশের মাটিতেই মিশে রইলো।

সেদিন থেকে অজ্ঞাত কোন ভবিষ্যতে যেদিন স্বাধীনতার স্বর্ণ-সূর্যোদয় হবে সেদিন মৌলভীর মাটিতে মিশে-থাকা অণু-পরমাণুর আকাঙ্ক্ষায় কিশলয় সবুজ প্রলাপে উচ্ছ্বসিত হবে—অশরীরী সৌরভে ছড়িয়ে যাবে তার প্রাণের আনন্দ!

গ্রন্থপঞ্জী

1 Eighteen Fifty-Seven — Surendra Nath Sen

2 Sepoy Mutiny — R C Mazumdar

3 The Seize of Delhi 1857 Col Young Keith

4 The mutinies and the people —by a Hindu

5 The Great Mutiny India 1857 - Christopher Hibbert

6 Biography of Kunwar Singh & Amar Singh —K K Dutta

7 A History of the Indian Mutiny —T Rice Holmes

8 Civil Disturbances during the British Rule in India (1765 1857) S B Chaudhury

9 The Indian War of Independence 1857 —V D Savarkar

10 বিদ্রোহে বাঙালী —দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়